নায়িকা প্রধান পাঁচটি উপন্যাসের সংকলন

পাঁচ কন্যার পাঁচালি

বিমল মিত্র

It is't cover

বিমল মিত্র

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা : শরৎচন্দ্র পাল

প্রকাশক : কিরীটি কুমার পাল * উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতল) *
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রাকর : বি. এন. দে * কল্পতরু প্রেস *
৩০-বি জয়মিত্র স্ট্রীট * কলিকাতা-৭০০০০৫

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অজিত গুপ্ত

ব্লক : রণজিৎ দত্ত * বি, ডি, কর্নসান * কলিকাতা-৭০০০০৫

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : নিউ গয়া আর্ট প্রেস * কলিকাতা-৭০০০০৯

পরিচালক : হীরালাল সাহা

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৬৫ * জুলাই, ১৯৫৮

পরিবেশক : কবিতা সাহিত্য প্রকাশন
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট * কলিকাতা-৭০০০০৭

উৎসর্গ

শ্রীহীরালাল সাহা

বন্ধুবরেষু—

বিমল মিত্রের নিবেদন

সেদিন হঠাৎ রামায়ণের সেই রত্নাকর দস্যুর গল্পটা মনে পড়ে গেল সংসারে তোমার পাপের ভাগ নেবার কেউ নেই, কিন্তু তোমার পুণ্য যদি কিছু থাকে তো তার ভাগ নেবার দাবিদার আমরা সবাই।

লেখক-জীবনের চারভাগের তিনভাগ বললে কম বলা হয়, বোধহয় সবটাই শুধু যন্ত্রণার ইতিহাস। তোমার নাম ভাঙিয়ে সম্পাদক, প্রকাশক এমন কি আত্মীয়-স্বজনরাও তোমার গৌরবের অংশ ভোগ করবার বা খ্যাতির হক্‌দার হবার জন্যে তৈরি, কিন্তু যন্ত্রণা? ওটা তোমার একলা ভোগ করবার জিনিস।

মনে আছে, সেদিন তোমার কেউ-ই ছিল না, যেদিন তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে তুমি রাত জেগেছ, রক্তপাত করেছ, বোধকরি বা একটা গল্পের জন্যে মাথা খুঁড়েছই শুধু নয়, অতি গোপনে কেঁদেছও। সেদিন কোথায় ছিলেন তাঁরা, যাঁরা আজকে তোমার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছেন? সেদিন এঁদের অনেকে তোমাকে সযত্নে নিরুৎসাহ করেছিলেন, সেটা কি তোমার মনে নেই?

দুটো ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করি, তাহলেই বিড়ম্বনার কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, বিড়ম্বনাই বটে।

লালগোলার মহারাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় একদিন টেলিফোন করলেন।

জানালেন—তাঁর পুত্রের বিয়ে, আমাকে সেই তারিখে তাঁর বাড়িতে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে।

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেই হলো। যথাসময়ে ছাপানো চিঠিও ডাকে এসে পৌঁছোল আমার নামে। যথানির্দিষ্ট তারিখে গিয়ে পৌঁছোলাম বিবাহ-বাসরে। মহারাজা দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনা করতে। বললেন—তোমাকে একটা মজা দেখাবো বিমল—

বললাম—কী রকম?

মহারাজা বললেন—তোমার টেলিফোন নম্বরটা জানতাম না তাই ভুল করে প্রথমে অন্য এক বিমল মিত্রের নম্বরে টেলিফোন করেছিলাম। এক মহিলা ধরলেন। জিজ্ঞেস করলাম—এটা কি বিমল মিত্রের বাড়ি? মহিলাটি বললেন—হ্যাঁ—

—সাহিত্যিক বিমল মিত্র?

—হ্যাঁ, আমার শ্বশুর লেখক।

বললাম—ঠিক আছে, আমার ছেলের বিয়ে অমুক তারিখে, সেদিন তাঁকে আসতে বলবেন, আমি চিঠি পাঠাচ্ছি—

চিঠি তো পাঠানো হলো। কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হলো যে বিমলের কি এতবড় ছেলে যে তার আবার পুত্রবধূ হয়ে গেছে! চিঠি পাঠাবার পর আবার টেলিফোন গাইড খুলে আবার ফোন করলাম তোমার নম্বরে। তখন তোমাকে পেলাম। কিন্তু তখন আগের বিমল মিত্রের চিঠিটা আর ক্যানসেল করলাম না। শুধু নতুন করে তোমাকেও আবার নেমতন্নর চিঠি পাঠালাম। তার মানে দাঁড়ালো দু'জন বিমল মিত্তিরকে নেমতন্নর চিঠি পাঠানো হলো।

বললাম—তা তিনি কি এসেছেন?

মহারাজা বললেন—হ্যাঁ—

—কোথায়?

—পরে দেখতে পাবে।

ইতিমধ্যে একজন তদারককারী আমাকে খাবার টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল। আমি অন্যান্যদের সঙ্গে খেতে বসেছি। অসংখ্য লোক। বিরাট প্যাণ্ডেল ভর্তি অভ্যাগতদের সমারোহ। রাজবাড়ির খাওয়া, সুতরাং এলাহি কাণ্ড।

ইতিমধ্যে হঠাৎ ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁর পুত্রবধূকে নিয়ে এসে আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন—এই হলেন আসল বিমল মিত্র, আর এই হলেন নকল বিমল মিত্র—

বলে আমার পাশে বসা ভদ্রলোকের দিকে দেখিয়ে দিলেন। আমিও সেদিকে চেয়ে দেখলাম। প্রায় আমারই বয়েসী লোক। আমার লজ্জা হতে লাগলো তাঁর লজ্জাকর অবস্থা দেখে। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর কোন লজ্জা নেই। তিনি মহারাজের নিষ্ঠুর মন্তব্যটাকে হজম করবার

চেষ্টায় হো-হো করে হেসে উঠলেন। যেন এক হাসির ঘটনা ঘটেছে এমনি ভাব।

এই হলো প্রথমবার। এটা কয়েক বছর আগেকার ঘটনা।

এরপর গত বছরে ১৯৭০ সালে আবার একটা ঘটনা ঘটলো। রাইটার্স বিল্ডিং থেকে জনৈক অফিসার টেলিফোন করলেন—আমি কি সাহিত্যিক বিমল মিত্রের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

কী আর বলবো। বললাম—সাহিত্যিক নয়, আমি লেখক বিমল মিত্র।

—আমি স্টেট লটারি ডিপার্টমেণ্ট থেকে মুখার্জী বলছি। এ-বছরে লটারির বিচারকের মধ্যে আপনাকে পেতে চাই। আপনি যদি রাজী হন্ তো খুশী হবো—

প্রথমতঃ আমি নিঃসঙ্গ মানুষ, তারপরে আমি লটারির টিকিট বেচা-কেনার বিরোধী। জীবনে কখনও নিজে লটারির টিকিট কিনিনি। যাহোক, শেষ পর্যন্ত অনেক টালবাহানার পর রাজি হলাম। যথা দিনে নিমন্ত্রণ পত্র এল। আমি নির্দিষ্ট দিনে কলামন্দিরে গিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির হলাম। আমার সঙ্গে সেখানে হাজির ছিলেন একজন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, একজন বিখ্যাত কলেজের অধ্যক্ষ, আর একজন সুবিখ্যাত স্পোর্টসম্যান।

কর্মকর্তা মিস্টার মুখার্জি আমাকে বললেন, আপনাকে নিয়েই বড় মুস্কিলে পড়েছিলাম মিস্টার মিত্র, আর কাউকে নিয়ে কিছু হয়নি—

আমি তো অবাক। জিজ্ঞেস করলাম—কেন?

মিঃ মুখার্জি বললেন—টেলিফোন-গাইড্ দেখে একজন বিমল মিত্রকে টেলিফোন করে আমার আর্জি জানাতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন। মনে কেমন সন্দেহ হলো। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হওয়া তো অস্বাভাবিক ঘটনা। আর একটা নম্বরে টেলিফোন করতে তখন

অর্ঘ্যাকে গেলাম। আপনি প্রথমে আপত্তি করতেই আমার মনে হলো এবার আসল লোককে পেয়েছি—

এ তো গেল। এবার তৃতীয় ঘটনার কথা বলি :

মাদ্রাজে ভেনাস-পিক্চার্স স্টুডিওতে আছি একটি সিনেমা সংক্রান্ত ব্যাপারে। একদিন ওখানকার নান্নু চন্দ্র একটা অদ্ভুত কথা বললেন। বললেন—আপনি সিনেমা করবার জন্য যে-বই আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন তা আমাদের পছন্দ হয়নি মশাই, ওটা রাবিশ গল্প—

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম—আমি আপনাদের সিনেমা করবার জন্যে আমার বই পাঠিয়েছি! এ-রকম ঘটনা আমি যে কল্পনাও করতে পারি না—

নান্নু চন্দ্র বললেন—কিন্তু আপনি যে লিখেছিলেন 'আমি সাহেব বিবি গোলামে'র লেখক, আমার নতুন বই 'কড়ির চেয়ে দামী' সিনেমা করবার জন্যে পাঠাচ্ছি—'

এর পরে আমার আর কিছু বলার রইল না। সিনেমা করার দরখাস্ত করা দূরের কথা, জীবনে কোনও কিছুর জন্যেই আমি কখনও দরখাস্ত করেছি এমন ঘটনা আমার মনে পড়ে না। বই ছাপাবার জন্যে কখনও কোনও প্রকাশকের দ্বারস্থ হয়েছি এমন ঘটনাও কোনও প্রকাশক বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না। আমি কিনা করবো সিনেমার জন্য দরবার!

আমার এক বন্ধু ফিলাডেলফিয়াতে আছেন। তাঁর নাম দিলীপ ঘোষ। তিনি সেখানকার ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে আমার কী-কী বই আছে তার তালিকা পাঠিয়ে লিখলেন তিনি আমার সব বই পড়েছেন, কিন্তু কয়েকটা বই তাঁর কাছে অপাঠ্য লেগেছে বলে সেই অপাঠ্য বইএর

তালিকাও পাঠালেন। যেমন 'কড়ির চেয়ে দামী', 'মানস সুন্দরী', 'বসন্ত-মালতী' প্রভৃতি। সে-সব যে আমার নামে প্রকাশিত জাল বই, দুঃখের সঙ্গে সে-কথা তাঁকে জানাতেও আমার ঘৃণা হলো।

এমনি আরো অনেক ঘটনা আছে। সব বলবার জায়গা নেই এখানে। কিন্তু মোটামুটি এই হচ্ছে আমার লেখক-জীবনের ট্র্যাজেডি। এখন পর্যন্ত বাজারে আমার নাম যুক্ত হয়ে প্রায় দু'শোটি জাল বই প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষের সর্বত্র, সব শহরে গ্রামে গঞ্জে বাজারে হাটে আর কলকাতার ছোট বড় সব দোকানে, এমন কি পান বিড়ির দোকানে পর্যন্ত যেখানেই বাঙলা বই বিক্রি হয় সেখানেই 'বিমল মিত্র' নাম যুক্ত হয়ে গাদা-গাদা বই সাজানো থাকতে দেখেছি। কিন্তু সব পাঠকদের কেমন করে বোঝাই যে ওর একটাও আমার লেখা নয়। আমার সব চেয়ে বড় অপরাধ আমি ভাল লেখক কি মন্দ লেখক তা নয়, বড় অপরাধ আমার এই যে আমার বই লোকের পড়তে ভাল লাগে এবং তা বিক্রি হয়। সেই অপরাধেই অত জাল বই এর প্রাদুর্ভাব। ওগুলো বিক্রি করে পুস্তক বিক্রেতারা শতকরা ৭৫ ভাগ কমিশন পান বলে তাঁরা ও'গুলোকে আসল বিমল মিত্রের রচনা বলে চালাবার চেষ্টা করেন, আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সফলকামও হন। মনে আছে একবার রাসবিহারী এ্যাভিনিউএর এক বিখ্যাত দোকানদার আমাকেই ওই জাল বই আসল বিমল মিত্রের বই বলে গছাবার চেষ্টা করেছিলেন। বিয়ে উপলক্ষ্যে উপহার দেবার জন্যে যাঁরা বই কেনেন তাঁদের কথা আলাদা। কারণ তাঁরা নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে সস্তা দামের বই উপহার দিয়ে চক্ষু লজ্জাকে বাঁচাতে চান। সে-সব ক্রেতাদের কাছে সব বই-ই বই— তা সে রবীন্দ্রনাথের লেখাই হোক, আর কোনও ডিটেক্‌টিভ গল্পই হোক।

তাঁদের বোঝবার দায় নেই কোন্‌টা সাহিত্য আর কোন্‌টা অসাহিত্য। সুন্দর ছাপা, দামী কাগজ আর সুদৃশ্য মলাট থাকলেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। লেখা কেমন সেটা তাঁদের কাছে গৌণ। কিন্তু এমন পাঠক-ক্রেতাও তো আছেন যাঁর কাছে তাঁর প্রিয় লেখকের বই একটি সম্পদ বিশেষ। সেই জাতীয় পাঠকদের জন্যেই আমাদের এত যত্ন, এত কষ্ট-স্বীকার। তাঁদের অবগতির জন্যেই জানাচ্ছি যে 'বিমল মিত্র' নামে অনেক ব্যক্তি আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় কোনও লেখক নেই। ওই নামের আড়ালে নাকি একজন পুরোনো দাগী আসামী ফুটপাথ থেকে পুরোনো বই কিনে নিয়ে তাই-ই সামান্য অদল বদল করে সুদৃশ্য মলাট দিয়ে বাজারে প্রকাশ করে এবং শতকরা ৭৫ ভাগ কমিশন দেবার লোভ দেখিয়ে পুস্তক বিক্রেতাদের তা বিক্রি করতে প্ররোচিত করে। তাতে সেই সব তথাকথিত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের লাভ হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু যাঁদের জন্যে আসলে বই লেখা হয় তাঁদের লোকসান হয় পুরোপুরি। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরণের জালিয়াতি এই-ই প্রথম। অন্য কোনও দিক দিয়ে না হোক এদিক দিয়ে অন্ততঃ আমি একটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছি—

তাই বলছিলাম আমার পাপের ভাগীদার নগণ্য, কিন্তু পুণ্য যদি এক কণাও থাকে তো তার দাবীদার অসংখ্য। রামায়ণের রত্নাকর তবু একদিন বাল্মীকি হতে পেরেছিলেন, আমার বেলায় এত চেষ্টার পরও আমার রত্নাকরত্ব কিছুতেই ঘুচলো না। এই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

বর্তমান ক্ষেত্রে আমার পাঁচটি সম্পূর্ণ উপন্যাস নিয়ে এই 'পাঁচ কন্যার

পাঁচালি' প্রকাশিত হলো। এটির পরিকল্পনা, প্রযোজনা আর পরিচালনা সমস্ত কিছুই বন্ধুবর প্রকাশক কিরীটিকুমার পালের। তিনিই প্রথমে এই প্রস্তাবটির উপস্থাপনা করেন। উপন্যাস ক'টির মধ্যে 'প্রথমা' ও 'তৃতীয়া' আগে কোনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি, একেবারে আনকোরা নতুন। আর প্রত্যেকটিই কোন না কোন পত্রিকার পূজো সংখ্যা বা বিশেষ সংখ্যায় আগে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পাঠকদের তরফ থেকে তা প্রশংসা অর্জন করেছিল। এখন একত্রে গ্রথিত হয়ে নতুন নামকরণে ভূষিত হলো। এ উপন্যাসগুলি প্রত্যেকটিই নায়িকা প্রধান বলে এই গ্রন্থের নামকরণ করেছেন কিরীটি কুমার পাল। তিনিই এ গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'পাঁচ কন্যার পাঁচালি'।

প্রথমা

একবার একটা ফিল্‌ম-স্টুডিওতে গিয়েছিলাম। জীবনে যে-সব জায়গায় খুব কম গিয়েছি তার মধ্যে ফিল্‌ম-স্টুডিও একটা। ফিল্‌ম দেখতে যেমন, ফিল্‌ম যেখানে তৈরী হয় সে-জায়গাটা দেখতে কিন্তু তেমন নয়। অর্থাৎ বাড়ি-ঘর-ড্রয়িংরুম কিছুই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। সব নোংরা, ধূলো-ময়লায় ভর্তি। শুধু যে-জায়গাটার ছবি তোলা হবে সেই জায়গাটুকু সাজানো-গোছানো থাকে।

তা আমার পক্ষে স্টুডিও-জিনিসটা নেহাৎই খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা নয়।

স্বাস্থ্যকর নয় তার কারণ সেখানে বড় গোলমাল চারদিকে। মাথার ওপর থেকে ঘরের মেঝে পর্যন্ত সবাই হৈ-চৈ করছে সব সময়। ছবি তোলার সময়টুকু ছাড়া সেখানে চুপ করে বসে থাকাও এক পাপ। অবশ্য আর্টিস্টদের কথা জানি নে। তাঁদের জন্যে নিশ্চয়ই নানারকম আরামদায়ক বন্দোবস্ত থাকে। তাঁরা সেখানে যাবেন, অবসরের সময়ে তাঁরা যাতে বিশ্রাম নিতে পারেন তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই থাকে। নইলে তাঁরা কাজই বা করবেন কেমন করে?

এমনি অবস্থার মধ্যে একবার যখন কাউকে পড়তে হয়, তখন হাসিমুখে সব সহ্য করাটাই নিয়ম। অর্থাৎ আপনার ভাল লাগছে না, এ-কথাটা চেপে রেখে আপনার যে ভাল লাগছে সেইটেই প্রকাশ করার নামই আধুনিক সভ্যতা। মুখে-চোখে একটা মিহি ঝাপ্‌সা হাসি নিয়ে সকলের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করতে হয়। ঘাড় নাড়তে হয়। ভাঙা

চেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে বসতেও হয়। এবং তেতো চা খেয়েও ঠোঁটে পরিতৃপ্তির ছাপ মাখিয়ে রাখতে হয়।

আমিও সেই অভিনয় করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটলো।

একজন অভিনেত্রী মেক্-আপ্ করা অবস্থায় আমাকে এসে নমস্কার করলে। অভিনেত্রীটির বয়েস কম। আমি প্রথমে চিনতে পারিনি। মেক্-আপ্ অবস্থায় যদি চিনতেই পারবো তো মেক্-আপ্-এর সার্থকতা কী?

অভিনেত্রীটি বললে—আমায় চিনতে পারছেন না, আমি নীতা—

নীতাকে মনে পড়লো। বহুদিন আগে 'রংমহলে' আমার একটা উপন্যাসের নাটক হয়েছিল, তাতে সে একটা ছোট ভূমিকায় অভিনয় করেছিল মনে আছে।

বললাম—কেমন আছো?

নীতা বললে—ভালো—আপনি কেমন আছেন? অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হলো। আপনার কথা কালই হচ্ছিল—

—আমার কথা? হঠাৎ?

—আপনার একটা গল্প বেরিয়েছে। সেইটে পড়েছে মা।

বললাম—কোন্ গল্প?

—আপনার গল্পটার নাম 'স্ত্রী'। গল্পটার ওই যে ফড়েপুকুর ষ্ট্রীটে মাধব দত্তর কথা লিখেছেন? মাধব দত্ত, তার মোসায়েবদের দল-বল, তারপর সীতানাথবাবু! মা বলছিল আপনি নাকি আমাদের কথা নিয়েই লিখেছেন।

বললাম—কিন্তু তোমার মা'কে তো আমি চিনলাম না ঠিক। তোমার মা'ও কি এই লাইনে আছেন নাকি?

নীতা বললে—না।

—তাহলে? আমার মনে হয় বোধহয় কিছু ভুল করেছেন তোমার মা। আমি বানিয়ে-বানিয়ে গল্প লিখি, অনেকে মনে করে সত্যি-ঘটনা।

খানিক পরেই শুটিং-এ নীতার ডাক পড়লো।

নীতা বললে—একদিন আমাদের বাড়িতে দয়া করে পায়ের ধুলো দেবেন?

বললাম—তোমাদের বাড়িতে?

নীতা বললে—আমার মা বলছিল আপনি আমার মা'কে চেনেন। চেনেন বলেই আপনি আমাদের নিয়ে লিখেছেন।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। কোনও অভিনেত্রীর মা'কে আমি চিনি, এটা আমার নিজের কাছেই একটা সংবাদ-বিশেষ। তা ছাড়া কোনও মহিলার সঙ্গে কখনও কোথাও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে এমন ঘটনাও কই, আমার তো মনে পড়ে না। তাই নীতার কথায় একটু অবাকই হয়ে গেলাম। ভাবলাম—তা হবে। কেউ যদি আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করে তো তাতে আমি কেন বাদ সাধি!

ভেবেছিলাম অনুরোধটা কথার কথা। এমন অনুরোধ বহুবার শুনতে হয়, এবং এ-অনুরোধ পালন করার সম্বন্ধে অনবধানতা অপরাধ হিসেবেও গণ্য হয় না। এমন তো কতই হচ্ছে। ভদ্রতা আর আন্তরিকতার ব্যবধান ঘুচিয়ে কে আর রোজরোজ এক-কথাতেই মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে!

সেদিন আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। ছবির কারিগর থেকে শিল্পী সবাই তখন থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। তাদের কাজ তখনও শেষ হয়নি, আরো অনেকক্ষণ ব্যস্ত থাকবে তারা। আমি এক ফাঁকে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিলাম।

এ হলো আদিকথা।

কিন্তু আদিকথার আগেও যে অনাদি-অতীত-কথা আছে তা জানতে পারলাম ওদের ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে। তাও ওই ঘটনার অনেক পরে। তখন ছবি-টবি শেষ হয়ে গেছে। হাউস থেকে উঠেও গেছে সে-ছবি। প্রথম-প্রথম নীতা কয়েকটা ছবিতে নেমেছিল, তাতে নাম-টাম না হওয়াতে সিনেমাতে নামাও ছেড়ে দিয়েছিল সে।

মোটমাট পৃথিবীর আর দশটা ঘটনার চাপে তখন অন্য সব ছোট খাটো ঘটনা চাপা পড়ে গিয়েছিল; যেমন চীনের যুদ্ধ, কাশ্মীরের হাঙ্গামা, কংগ্রেসের পতন! পৃথিবীর ঘটনার কি শেষ আছে?

মনে আছে মাধব দত্তর কথা।

মাধব দত্ত বলতেন—চাটুজ্জে, কারোর বিপদের কথা শুনলে আমি আর স্থির থাকতে পারি না, জানো তো—এও আমার একটা রোগ!

চাটুজ্জে বলতো—আজ্ঞে রোগ কেন বলছেন, এ আপনার মহানুভবতা!

মাধব দত্ত বলতেন—দূর, তোমাদের ওই খোশামুদে কথা আমার ভাল্লাগে না। খোশামোদ আমি ছ'চক্ষে দেখতে পারি নে। যে খোশামোদ করে তাকেও দেখতে পারি নে—

চাটুজ্জে বলতো—আজ্ঞে সে কি আর আমি জানি নে কর্তামশাই, জানি বলেই তো খোশামোদ-টোদ্ করি নে।

চাটুজ্জের পাশে নন্দকিশোরও বসে থাকতো।

নন্দকিশোর বলতো—খোশামোদে আর যে-কেউই ভুলুক আমাদের কর্তামশাইকে কখনও খোশামোদে ভোলানো যাবে না—

মাধব দত্তর কথা সে-গল্পে খুঁটি-নাটি দিয়ে লিখেছিলাম। মাধব দত্ত সে-কালের বর্ধিষ্ণু লোক। এলাহি খানদানি মেজাজের বাবু সমাজের প্রতিনিধি করেছিলাম তাঁকে। সেকালের বাবু সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি দেখানোর জন্যে তাঁর যেমন দান-ধ্যান দেখিয়েছি, মহানুভবতাও দেখিয়েছি, তেমনি তাঁর নৈশ-কীর্তি-কলাপও দেখিয়ে-

ছিলাম। শুধু যে তিনি মেয়েমানুষ পুষতেন তা নয়, তার সঙ্গে তাঁর উদারতার উদাহরণও দিয়েছিলাম।

আসলে সে-গল্প লেখার পেছনে আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের ক্রম-বিবর্তন দেখানো। আজকে কলকাতা শহরে যে-সমাজ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এর পেছনে যে ইতিহাসটা আছে সেইটে বলাই ছিল আমার সে-গল্পের প্রধান বক্তব্য।

কিন্তু আসলে সে-গল্পটা ছিল আমাব সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

কল্পনাটাও বাস্তবধর্মী করে লেখা যায়। এমন গল্প লেখা যায় যা পড়ে পাঠকের মনে হবে এ ঘটনা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ধৃত। তেমন ধারণা করাবার জন্যে অনেক মার-প্যাঁচ আছে। আসলে মার-প্যাঁচটাই সব। পড়তে পড়তে যেন মনে না হয় যে এ গল্প লেখকের মাথা ঘামিয়ে বানিয়ে বানিয়ে লেখা।

কিন্তু সেই বানানো গল্পই যে একদিন নীতাদের বংশের গল্প হয়ে যাবে, সেই গল্পকে সত্যি মনে করে যে কেউ তা নিয়ে আলোচনা করবে তা কল্পনা করতে পারিনি।

আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, নীতা, যাকে আমি বলতে গেলে ভালো করে চিনি না, যার মা'কে জীবনে কখনও দেখিনি, তাদের ধন-মান-কুল-শীল সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তারাই কিনা বললে—সে-গল্প তাদের নিয়েই লেখা?

মাধব দত্ত বড়লোক।

তা কলকাতায় মাধব দত্তর মত বড়লোক কি আর দশটা নেই?

আরো একটা কথা। বড়লোকদের সঙ্গে বড়লোকদের কোনও তফাৎই নেই। আসলে তো সব বড়লোকরাই এক। বড়লোকদের মধ্যে কোনও রকমফের নেই বলেই কোনও বৈচিত্র্যও নেই। বড়লোক হলেই যেমন বাবুয়ানি করতে হয়, বাবুয়ানি না করলে যেমন বড়লোক হওয়া যায় না, তেমনি গরীব হলে কিন্তু ঠিক উল্টো। গরীব হলেও বড়লোকিপনা করতে কোনও বাধা নেই। গরীবলোকদের দেখে সব-

সময় বোঝবারও উপায় নেই যে লোকটা গরীব কি বড়লোক। আসলে এক-কথায় গরীবরা একজাতীয় হলেও কোনও জাতই নেই তাদের।

বহুদিন আগের লেখা সে-গল্পটা! সবটা মনেও নেই আমার। আর হাতের কাছে তার কোনও কপিও নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে তিনি সকালবেলা ঘুমোতে যেতেন আর বিকেল তিনটে-চারটের সময় ঘুম থেকে উঠতেন।

আশ্রিত-অনাশ্রিত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, মোসাহেব, উকীল-অ্যাটর্নী সবাই-ই জানতো সে কথা। তাই অন্য সবাইও জানতো সে-কথা। তাই সবাই-ই প্রয়োজন হলে কিংবা বিনা-প্রয়োজনেও সেই সময়েই এসে হাজির হতো তাঁর নাচ-দরবারে। এসে নাচদরবারে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্না দিত।

তারা জানতো যে দত্ত-মশাই ওই সময়ে ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া খেতেন। সারা রাত জাগরণের পর বেলা করে ঘুম থেকে ওঠাই স্বাভাবিক। চাটুজ্জেও তার নিজের বাড়িতে গিয়ে ঘুমোত, নন্দ-কিশোরও তাই। আর ছিল সীতানাথ। সীতানাথ রায়—ফটো-গ্রাফার।

বলতে গেলে মাধব দত্ত সে-গল্পের প্রধান নায়ক হলেও সীতানাথ-বাবুই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। গল্পটা সীতানাথবাবুকে নিয়েই ঘটে-ছিল।

অ্যাটর্নী হরনাথবাবুও কাগজ-পত্র নিয়ে হাজির থাকতো সেই নাচ-দরবারে।

হরনাথবাবুর দায়িত্বটাই ছিল সবচেয়ে বেশি।

কারণ মাধব দত্তর এস্টেটের ভাল-মন্দ লাভ-লোকসান দেখার পুরোপুরি দায়িত্ব হরনাথবাবুর ওপরে হস্তান্তরিত করে মাধব দত্ত নিশ্চিন্ত থাকতেন। কোন্ নিলামে কোন্ বাড়িটা কিনলে কত পার্সেণ্ট প্রফিট হবে তা হিসেব করবার সময় বা বুদ্ধি কিছুই মাধব দত্তর ছিল না।

মাধব দত্ত বলতেন—খুব বুঝে শুনে চলবে হরনাথ, তুমি যেখানে

বলছো আমি সেখানেই সই দিয়ে দিচ্ছি, লোকসান হলে কিন্তু তোমার দায়িত্ব—বুঝলে তো ?

হরনাথ কাগজ-পত্রগুলো ভয়ে ভয়ে সামনে এগিয়ে দিত, আর মাধব দত্ত চোখ বুঁজে তাতে একটার পর একটা সই দিয়ে দিতেন।

হরনাথ বলতো—আজকে হাইকোর্টে একটা মামলার দিন পড়েছে দত্ত-মশাই।

কথাটা শুনে আঁতকে উঠতেন মাধব দত্ত।

বলতেন—সব্বোনাশ, আমাকে কোর্টে যেতে হবে নাকি ?

অ্যাটর্নী হরনাথ সান্ত্বনা দিত। বলতো—না না, কী যে বলেন, আপনাকে কেন হাইকোর্টে যেতে হবে ? আমি শুধু কথাটা বলে রাখলুম আপনাকে—

—তাই বলো, বলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তেন মাধব দত্ত!

মোসাহেব চাটুজ্জে পাশ থেকে ফুট্ কাটতো। বলতো—কোর্টে যাওয়ার মত পাপ আর নেই দত্ত মশাই—

নন্দকিশোর বলতো—কোর্টে যাওয়ার চেয়ে নরকে যাওয়া ঢের ভালো—

মাধব দত্ত বলতেন—তোমরা কিছ্ছু জানো না—

আশ-পাশের সবাই জানতো মাধব দত্ত-মশাই যে-কথা বলবেন সে তো শুধু কথা নয়, বাণী। মহাপুরুষের বাণীও অত মন দিয়ে কেউ শোনে না।

মাধব দত্ত তখন জমিয়ে বসতেন।

আদালত আলি ছিল মাধব দত্তর খাস-খানসামা। সে আলবোলাটা এগিয়ে দিত মাধব দত্তর দিকে। মাধব দত্ত সেটা নিয়ে মুখে পুরতেন। তারপর ভালো করে ধোঁয়া টেনে সেটা আবার সামনের দিকে ছাড়তেন।

প্রথম টানেই যদি গল্-গল্ করে ধোঁয়া না বেরোত তো তিনি রেগে-মেগে নলটা টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন।

বলতেন—বেরো তুই বেরো এখান থেকে—অকম্মার ধাড়ি, এতদিন ধরে তামাক সাজছিস এখনো ধোঁয়া বার করতে শিখলি না—

কিন্তু সে ওই একদিনই। একদিনই ওইরকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল আদালত আলির জীবনে। একদিনই আদালত আলি বরখাস্ত হয়ে গিয়েছিল মাধব দত্তর দফতর থেকে। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল ফড়েপুকুর স্ট্রীটের বাড়িতে!

ফড়েপুকুর স্ট্রীটের বাড়িটাই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ধনীদের প্রতিনিধি-স্থানীয়। ওটা নিছক কল্পনা। ও বাড়িখানাই আমি কল্পনা করে নিয়েছিলাম অতীত ইতিহাসের বই পড়ার পর। সমাজ-ব্যবস্থা কেমন করে যুগে-যুগে কী রূপ গ্রহণ করে তারই প্রতীক ছিল ওই মাধব দত্ত।

কিন্তু মাধব দত্তরা তো শুধু একলা ওঠে না!

একলা যেমন ওঠে না তেমনি আবার একলা পড়েও না। যখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখন তাদের সঙ্গে চাটুজ্জে-নন্দকিশোর হরনাথ সীতানাথ সব্বাই-ই ওঠে। তাদের সঙ্গে তাদের আশ্রিত অনাশ্রিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব-মোসাহেব-চাকর-দাসী-ঝি সবাই-ই ওঠে। আবার মাধব দত্তরা যখন পড়ে তখন তাদের নিয়েই পড়ে।

মাধব দত্ত বলতেন—সব মিথ্যে, জানো নন্দকিশোর, এ সংসারে সব মিথ্যে। মানে সব ঝুটো মাল—

নন্দকিশোর বলতো—আজ্ঞে দত্ত-মশাই, পরমহংসদেবও ঠিক ওই কথাই বলে গেছেন—

—আরে, রাখো তোমার পরমহংসদেব! পরমহংসদেবের কি আমার মত এত টাকা ছিল?

নন্দকিশোর বলতো—আপনি হাসালেন দত্ত-মশাই, আপনার সঙ্গে কার তুলনা। আপনার সঙ্গে যদি কেউ কারো তুলনা করে তো সে আহাম্মক—

—তুমি একটি আস্ত আহাম্মক নন্দকিশোর, একটা আস্ত আহাম্মক তুমি—

নন্দকিশোর বেকুবের মত হাসতে লাগলো। হেসেই সবিনয়ে স্বীকার করে নিলে যে সে আহাম্মক। দত্ত-মশাইয়ের কাছে আহাম্মক হয়ে থাকাও আনন্দের। দত্ত-মশাই যদি আহাম্মক না বলে হারামজাদাও বলতো, তাহলেও তা মাথা পেতে স্বীকার করে নেওয়া রীতি।

তারপর হঠাৎ হয়ত খেয়াল হতো মাধব দত্তর।

মাধব দত্ত হঠাৎ বলতেন—কই, সীতানাথকে তো দেখছি নে, সীতানাথকে তো দেখছিনে—

সঙ্গে সঙ্গে লোক ছুটতো সীতানাথবাবুকে ডাকতে। সীতানাথও একজন মোসায়েব। ওই চাটুজ্জে, নন্দকিশোর আর সীতানাথ এই তিনজনই বলতে গেলে ছিল মাধব দত্তর আদি এবং অকৃত্রিম মোসাহেব।

সেই বিকেল চারটের সময় মাধব দত্ত ঘুম থেকে উঠেই যেতেন ঠাকুর-ঘরে। ঠাকুর-ঘরে গিয়ে পূজো করতেই তাঁর দু'ঘণ্টা কেটে যেত। তারপর যখন পূজোর ঘর থেকে বেরোতেন তখন মাধব দত্তর সে কী সৌম্য মূর্তি। কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক, পরনে গরদের ধুতি, ধপ্ধপে ফরসা খালি গা—

আর তারপর আদালত আলি তাঁর শান্তিপুরী ধুতি মলমলের পাঞ্জাবি, সিল্কের গেঞ্জি নিয়ে তাঁকে পরিয়ে দিত। আঙুলে আংটি দিত, হাতে রিস্ট-ওয়াচ, গলায় সোনার চিক্-হার।

আর ওদিকে অ্যাটর্নী হরনাথবাবু নিলেমের নথি-পত্র নিয়ে হাজির থাকতো নাচ-দরবারে। হরনাথের সঙ্গে হাজির থাকতো চাটুজ্জে, নন্দকিশোর। আর এককোণে বসে থাকতো সীতানাথ। সকলে হাজির না থাকলে মাধব দত্তর খারাপ লাগতো। সকলে সশরীরে হাজির না থাকলে মাধব দত্তর ঘুমের ব্যাঘাত হতো।

বলতেন—নাঃ, সবাই আল্‌সে হয়ে গেছে, কেউ আর কাজ করে না—

এ-গল্প বহুদিন আগের লেখা। যেমন আমার সব লেখাই তাগাদায় পড়ে লেখা, সে লেখাও তাই। যে-গল্প একবার লেখা হয়ে যায়, তারপরে আর সে লেখার কথা মাথায় থাকে না। গল্পের পাত্র-পাত্রীদের নামও ভুলে যাই! অনেক সময়ে লেখাটাও হারিয়ে যায়। তারপর যখন প্রকাশকের তাগিদে আবার কপির সন্ধান করতে যাই তখন কোনটাই খুঁজে পাই না। তখন কাউকে ধরে পত্রিকার অফিসে পাঠাতে হয় লেখাটার নকল করিয়ে আনতে। লেখা এক জিনিস। সেটা মনের আনন্দে কিম্বা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এক দিন শেষ করা চলে। কিন্তু সেই লেখার হিসেব রাখা অন্য জিনিস। সেইটেই বড় কঠিন কাজ মনে হয় আমার কাছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আর সেই লেখা-সংক্রান্ত ব্যাপারে পাঠকদের চিঠি লেখালেখি সেটা আরো শক্ত কাজ।

চিঠি পেতে যে ভালো লাগে না তা নয়। খুবই ভালো লাগে। যাঁরা চিঠি লেখেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু উত্তর দেওয়া?

উত্তরটা তো নিজের হাতেই দিতে হবে! নিজের হাতে উত্তর না দিলে তো কেউ খুশী হবে না। তাই উত্তর দেব-দেব করে যখন অনেক দিন কেটে যায়, তখন বাসি হয়ে যায় জিনিসটা। তখন উত্তর দেওয়াও যা আর না-দেওয়াও তাই। আর ততদিনে অন্য চিঠির ভিড়ে সে-চিঠি হয়ত হারিয়েই গেছে।

এবার আর তা নয়। এবার একেবারে সরাসরি অভিযোগ।

কবে একদিন কোন্ গল্প লিখেছিলাম কোন্ পত্রিকার কোন

কথ

আম

সঙ্গে ব

তো সে

সম্পাদকের তাগিদে, সেই গল্পকেই আবার স্মৃতির সিন্দুক খুলে উদ্ধার করতে হচ্ছে। এ যেন সেই পূর্বপুরুষের শাল-দোশালা গায়ে দেওয়ার মতন। তার ভাঁজে ভাঁজে বনেদীয়ানা, কিন্তু ভাঁজ খুললেই সর্বনাশ। একেবারে ছিঁড়ে-খুঁড়ে একশা হয়ে যাবে।

এবার মেয়েটার কথা শুনে বড় অস্বস্তিতে পড়লাম। সেই ফড়িয়া-পুকুর ষ্ট্রীটের দত্ত-বাড়ির মর্মান্তিক যন্ত্রণাটার কথাটা ভাবতে চেষ্টা করলাম। ঐশ্বর্যের সঙ্গে যে-যন্ত্রণা মেশানো থাকে, সেই যন্ত্রণার কথাই তো আমি বারবার লিখে চলেছি। যন্ত্রণা না থাকলে তো মানুষ নিশ্চিন্ত। যন্ত্রণা না থাকলে তো এ-পৃথিবী নরক হয়ে উঠতো। এই নরকের মধ্যেই আমি বরাবর শিল্পের খোরাক খুঁজে বেড়িয়েছি। আর মানুষকে আমার সাধ্যমত অমৃত পরিবেশন করতে চেয়েছি।

যেমন সীতানাথবাবু।

মাধব দত্তর নাচ-দরবারে চাটুজ্জে, নন্দকিশোর আর হরনাথবাবুর সঙ্গে সীতানাথ তো নরক-যন্ত্রণাই ভোগ করেছে। কিন্তু সেই নরকের মধ্যেও সীতানাথ কেমন করে পরমার্থের সন্ধান পেয়েছিল সেইটেই ছিল আমার সে-গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়।

মাধব দত্ত কিন্তু সীতানাথকেই খুঁজতেন।

বলতেন—কই হে, সীতানাথকে তো দেখছি নে—

লোক ছুটতো সীতানাথের কাছে। সীতানাথের কাছে মানে মাধব দত্তর আস্তাবল-বাড়িতে। মাধব দত্তর বিরাট বাড়ি। ফড়েপুকুর ষ্ট্রীটের বাইরে থেকে কিছু বোঝা যেত না। বাড়ি না বাড়ি। যেমন আর পাঁচটা বাড়ি হয়, তেমনি। কিন্তু সদর গেট পেরিয়ে একটু ঢুকলেই দেউড়ি। সেখানে মাধব দত্তর দরোয়ান বসে থাকতো। দরোয়ানের কাজ দাঁড়িয়ে সদর গেটে পাহারা দেওয়া। যেমন আর পাঁচটা বড়লোকের বাড়ির দারোয়ান পাহারা দেয়। কিন্তু মাধব দত্তর দরোয়ান বসে থাকতো; শুধু বসে থাকতো নয়—বসে থাকতো আর আড্ডা জমাতো।

তারপর দেউড়ি পেরিয়ে ডানদিক বরাবর লম্বা উঁচু পাঁচিল। একেবারে মাধব দত্তর বাগানের শেষপর্যন্ত গিয়ে সীমানা তৈরি করেছে।

আর বাঁদিকটায় বৈঠকখানা।

বৈঠকখানার ভেতর গোটাকতক হেলান দেওয়ার বেঞ্চি আছে। একটা ফরাস। ফরাসের ওপর খেরো-তাকিয়া গোটাকতক এদিক-ওদিক পড়ে আছে। দেয়ালের গায়ে খানকয়েক ছবি। কার ছবি কে জানে। সেকালের পুরনো আমলের কর্তামশাইদের কারো কারো হবে হয়ত।

সে-ঘরের উত্তর দিকে বাগানের মুখ-বরাবর ইঁট-বাঁধানো রাস্তা পেরিয়ে পড়বে বার-মহল। বার-মহলে ঢুকতে দু'পাশে সিমেণ্ট-বাঁধানো বসবার বেঞ্চি, সেখানে শুতেও পারো। একেবারে লম্বা টান হয়ে চিৎপাত শুয়ে পড়ো। অনেক জায়গা পড়ে আছে।

আর তারই ভেতরে চকমিলান বার-বাড়ির উঠোন। চারপাশে সবুজ রং-এর জানালা-দরজা। ওগুলো আসলে জানালা-দরজা নয়। আঁকা জানালা-দরজা। আর সমস্ত উঠোনটা ঘিরে দেয়াল-লাগোয়া উঁচু রোয়াক। দু'তিনটে সিঁড়ি দিয়ে সেই রোয়াকে উঠে হেঁটে গিয়ে ওদিকের কোণে পড়বে দোতলায় ওঠবার কাঠের সিঁড়ি।

সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই বাঁদিকে পড়বে মাধব দত্তর নাচ-দরবার।

তা সেই সেখান থেকে তলব পেয়ে সীতানাথকে ডাকতে গেলে ওই সিঁড়ি, ওই রোয়াক, ওই দেউড়ি, ওই বার-মহল, ওই বাগান মাড়িয়ে তবে যেতে হয়। একেবারে বাগানের পশ্চিম কোণে মাধব দত্তর আস্তাবল-বাড়ি। সেখানে আস্তাবল-বাড়ির লাগোয়া একখানা ভাঙা ঘরের ভেতরে তক্তাপোশের ওপর সীতানাথবাবুর রাজ্যপাট।

রাজ্যপাট ওই নামেই। ওটা শ্লেষার্থে বললাম।

দেয়ালের ওপর কুলুঙ্গিতে একটা কাঁচের শিশিতে একটু সরষের তেল থাকে। থাকে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। দড়িতে গামছা ঝোলে।

ভিজে চিট-ময়লা গামছা। কাছে গেলে নাকে গন্ধ লাগে। তবু তারই মধ্যে বেশ দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় সীতানাথবাবু।

মাধব দত্ত যখন রাত্তিরে গাড়ি হাঁকিয়ে মোসায়েব নিয়ে নৈশ-বিহারে যান, তখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সীতানাথবাবু নাক ডাকায়। বাজ পড়লেও তার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। তারপর শেষ রাত্রের দিকে কখন মাধব দত্ত অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে বাড়িতে ফেরেন তার খেয়াল থাকে না।

হুসেন মিয়া মাধব দত্তের কচোয়ান।

শেষ রাত্রের দিকে বাড়ি ফিরে হুসেন মিয়া আস্তাবলের সামনেই খাটিয়াটা নিয়ে পড়ে থাকে।

সীতানাথবাবু ডাকে—ও হুসেন, হুসেন মিয়া—

ঘুম-জড়ানো চোখে হুসেন মিয়া ওঠে। বলে—কী হুজুর?

সীতানাথবাবু বলে—কাল কত রাত্তিরে বাড়িতে ফিরলে গো?

হুসেন মিয়া বলে—কাল রাত্তিরে তো নয়, আজ সবেরে—

—আহা!

সীতানাথবাবুর মুখ দিয়ে একটা মৃদু 'আহা' শব্দ বেরিয়ে যায় অজান্তে। সে-'আহা'টা যে আসলে কার জন্যে তা কেউ বুঝতে পারে না।

রহিম বোঝে। রহিম মাধব দত্তর সহিস। কচোয়ানের সাগরেদ। বলে—সীতানাথবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে হুসেন ভাইয়া—

তা অন্যলোকের চোখে তার মাথাটা খারাপই হয়ে গেছে বলতে হবে। তারা সবাই ভাবে সীতানাথবাবু আস্ত পাগল মানুষ।

নইলে ঘোড়ার জন্যে কেউ মাথা ঘামায়?

মাধব দত্ত পড়ে রইল, চাটুজ্জে পড়ে রইল, নন্দকিশোর পড়ে রইল। হুসেন মিয়া, রহিম সবাই-ই পড়ে রইল, যত মায়া ঘোড়াটার ওপর।

মাঝে মাঝে সীতানাথবাবু ঘোড়াটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখের

দু'পাশে দড়ি দিয়ে বাঁধা। দানা চিবোয়। মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে ফোঁটা ফোঁটা মাটিতেও পড়ে। তার মত অবলা জীবের সঙ্গে কীসের এত ভাব সীতানাথবাবুর কে জানে!

ঘোড়াটা যেন সীতানাথবাবুর আপন কেউ।

সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সীতানাথবাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। নাকে হাত বুলিয়ে দেয়। ঠোঁটেও হাত বুলিয়ে দেয়। যেমন করে মানুষ আপন ছেলেকে আদর করে, ঠিক তেমনি।

আবার কাছাকাছি কেউ না থাকলে তার সঙ্গে কথাও বলে।

বলে– কী রে, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

ঘোড়াটা বোবার মত চেয়ে থাকে সীতানাথবাবুর দিকে।

সীতানাথবাবু বলে—ওরে, সকলেরই কষ্ট হয়, এ-সংসারে যারা গরীব হয়ে জন্মেছে, তাদের সকলেরই তোর মত কষ্ট হয়। তুই অবলা জীব তো, তাই মুখ ফুটে বলতে পারিস না—

তারপর আবার একটু থামে।

বলে—আমিও তোর মতন রে, আমিও তোর মতন। তুইও কিছু বলতে পারিস না। আমিও না।

তারপর আবার একটু থেমে বলে—যাক্‌গে, একদিন এর কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব-নিকেশ হবেই, একদিন সব বোঝাপড়া হবেই—তখন?

তারপর হুসেন মিয়ার পায়ের শব্দ পেয়ে নিঃশব্দে সরে আসে। কেউ দেখতে পাবে তাই বুঝি লজ্জা হয় সীতানাথবাবুর! ওরা তো বুঝবে না। জানোয়ারও যে মানুষ, জানোয়ারেরও যে মানুষের মত প্রাণ আছে তা হুসেন মিয়া বুঝবে না।

হুসেন মিয়া বলে—সীতানাথবাবু, আপনি কি ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলেন নাকি?

সীতানাথবাবু লজ্জায় পড়ে। বলে—না, কী যে বলো তুমি। ঘোড়া কি আর কথা বলে! আমি নিজের মনেই কথা বলছি—বলে হাসে। তারপর বলে—তবে কি জানো···

বলে কাছে সরে আসে। বলে—অবলা জীব তো, বোঝে সব। এই যে আমি ওর কাছে গিয়ে কথা বললাম, ওর ঘাড়ে মুখে হাত বুলিয়ে দিলাম।

—কী বুঝতে পেরেছে—

সীতানাথবাবু বলে—বুঝতে পেরেছে আমি ওকে ভালবাসি—। ভালবাসা কখনও চাপা থাকে না গো। আমি ওকে ভালবাসি এটা ও বুঝতে পারে। দেখছো না, ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছে—

সত্যিই সীতানাথবাবু কাছে গেলে, কাছে গিয়ে আদর করলেই ঘোড়াটার চোখ দিয়ে জল পড়তো। অবলা জীব হলেও বুঝতে পারতো এই বুড়ো লোকটা ওকে ভালবাসে। বড়লোকের বাড়ির ঘোড়া। ওই ঘোড়াই অনেক দেখেছে। মাধব দত্তকে ঘোড়াটা অনেক দিন ধরেই দেখে আসছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন চাটুজ্জে এসে জোটে, নন্দকিশোর এসে জোটে, তেমনি হরনাথ এ্যাটর্নীও এসে জোটে।

চাটুজ্জে বলে—আপনি আবার আজকে কেন এলেন এ্যাটর্নীবাবু

হরনাথবাবু বলে—কালকে একটা নীলেম আছে হাইকোর্টে—

—নীলেম? ঠিক এই সময়ে নীলেমের কথাটা শোনাবেন কর্তামশাইকে? আর সময় পেলেন না?

হরনাথবাবু বলে—কী করবো চাটুজ্জেমশাই, দত্ত-মশাই তো কিছু দেখেন না, আমার ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে নাকে সরবের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। তা বলে আমি তো আর ঘুমিয়ে থাকতে পারি না। আমার তো একটা দায়িত্ব আছে—

তা সত্যিই, সম্পত্তির ব্যাপারে মাধব দত্ত একেবারে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোতেন।

চাটুজ্জে বলতো—আজ্ঞে, আজকে একটা সর্বনাশের ব্যাপার হয়ে গেছে—

—সর্বনাশ? কিসের সর্বনাশ?

চাটুজ্জে বলতো—আজ্ঞে, আজকে আমাদের পাড়ার একটা যুবতী মেয়েকে নিয়ে এক ব্যাটা লোফার কোথায় উধাও হয়ে গেছে—

—উধাও হয়ে গেছে মানে ?

মাধব দত্ত নলটা সরিয়ে সোজা হয়ে বসতেন।

বলতেন—যুবতী মেয়ে ? তোমাদের পাড়া থেকে উধাও হয়ে গেল ?

চাটুজ্জে বললে—আজ্ঞে, তা গেল—

—গেল মানে গেল ? আর তোমরাও চুপ-চাপ মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলে ! তোমাদের পাড়ায় মানুষ নেই কেউ ?

চাটুজ্জে বলতো—আজ্ঞে, মানুষ থাকলে কী হবে, কারোর জন্যে কারোর অত মাথাব্যথা নেই—

মাধব দত্ত বলতেন—তাহলে পাড়ায় ভদ্দরলোক কেউ নেই বলো—

চাটুজ্জে বলতো—এ-সংসারে, পরের জন্যে কে ভাবে বলুন তো ? এক আপনি ছাড়া, আর তো কাউকে দেখলাম না তেমন যে পরের কথা ভাবে—

মাধব দত্ত বলতেন—তুমি তোমার ওই খোসামুদে কথাগুলো ছাড়ো তো, আমি খোসামুদে কথা শুনতে মোটে ভালবাসি না। এখন কী বিহিত করবে তাই বলো। মেয়েটার বাপ-মা-ভাই কেউ আছে ?

—কেউ নেই স্যার, কেউ নেই, একজন বুড়ি বিধবা মা আছে, তাও সে না-থাকারই মত।

—তা কোথায় আছে মেয়েটা কিছু খোঁজটোজ পেয়েছো ?

চাটুজ্জে বলতো—না স্যার, খোঁজ-টোজ আর কে-ই বা নেবে, আমরা দু'চারজন ছেলেছোকরার দল শুনলুম মেয়েটা খড়দায় আছে। খড়দায় এক গোঁসাই-এর বাড়ি নিয়ে গিয়ে কে রেখে দিয়েছে তাকে—

মাধব দত্ত দু'একবার নলটায় ঘন-ঘন টান দিতেন।

তারপর বলতেন—খড়দায় যেতে হয় তাহলে একবার, এ শুনে তো আর চুপ করে থাকা যায় না। অনাথা বিধবার একমাত্র যুবতী মেয়ে

নিখোঁজ হয়ে যাবে, আর আমরা এতগুলো ভদ্রলোক থাকতে সব চুপ করে বসে থাকবো ? চলো চলো—সবাই চলো—

তা সেই সন্ধ্যেবেলাই তোড়-জোড় শুরু হয়ে যেত। মাধব দত্ত খড়দায় যাবেন রুক্মিণী উদ্ধার করতে। সঙ্গে চাটুজ্জে যাবেন, নন্দকিশোর যাবে, সীতানাথ যাবে, আদালত আলি যাবে, আর যাবে হুসেন মিয়া আর রহিম। এতগুলো লোকের খাবার-দাবার সঙ্গে যাবে। লুচি-পরোটা মাংস আলুর দম সব সঙ্গে যাবে। আর···

আদালত আলি সঙ্গে কিছু বোতলও নিয়ে যাবে। লালপানি আর সোডার বোতল।

তারপর হৈ হৈ করে ফড়েপুকুর থেকে বেরোবে মাধব দত্তর গাড়ি। পাড়ার লোক দেখবে বাবুরা নৈশ-বিহারে চলেছে। প্রথমে মাধব দত্ত উঠবেন, তারপর চাটুজ্জে, তারপর নন্দকিশোর। আর তারপর সীতানাথবাবু। আর পেছনে আদালত আলি লুচি-পরোটা মাংসের চ্যাঙারি নিয়ে উঠবে গাড়ির ছাদে। ভেতরে বসে মাধব দত্ত গড়গড়া নল টানবেন। নল দিয়ে ধোঁয়া বেরোবে, তবে আদালত আলি নিশ্চিন্ত হবে। তারপর হুসেন মিয়া গাড়ি ছেড়ে দেবে।

তারপর দুর্গা-দুর্গা বলে যাত্রা শুরু হবে, রুক্মিণী উদ্ধার পালা আরম্ভ হবে।

এমনি প্রায় রোজ। প্রায় রোজই রাত্রে এমনি চলবে মাধব দত্তর নৈশ অভিযান। কোনও দিন খড়দা, কোনও দিন শ্রীরামপুর, কোনও দিন কলাতলার বস্তি, আবার কোনও দিন একেবারে খাস-কলকাতা। একদিন না একদিন কোনও যুবতী মেয়ের সর্বনাশের খবর দেবে চাটুজ্জে আর মাধব দত্তর বনেদী রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠবে পরোপকারের তাগিদে, আর সঙ্গে সঙ্গে লুচি-পরোটা-মাংস-আলুর দমের সঙ্গে লালপানি আর সোডার বোতলের চ্যাঙারি সঙ্গে যাবে!

আর যখন বাবুরা রুক্মিণী উদ্ধার করে ফিরবে তখন ফড়েপুকুরের রাত ভোর হয়ে এসেছে। সে-দৃশ্য আর কারো নজরে পড়ে না।

তখন ফড়েপুকুরের পাড়ায় সবাই ঘুমে অচেতন। মাধব দত্তকে তখন ধরে নামিয়ে দিতে হয়। আদালত আলি গাড়ি থেকে নেমে মাধব দত্তকে ধরে। ধরে আস্তে আস্তে সদর-গেট পেরিয়ে বাড়ির ভেতর-মহলে নিয়ে যায়। ভেতর-মহল মানে একেবারে বার-মহল পেরিয়ে অন্দরের শোবার ঘরে।

প্রথম প্রথম অন্দর-মহলে যাওয়ার ক্ষমতা থাকতো মাধব দত্তর।

কিন্তু শেষের দিকে নেশা হলে মাধব দত্তর মাতলামি যেন বেড়ে যেত। হাত-পা ছুঁড়তেন। চিৎকার করতেন। আদালত আলিকে মারধোর করতেন।

বলতেন—নিকাল যাও হিয়াসে, শালা শূয়ার কা বাচ্ছা—নিক্‌লো—

আদালত আলিকে মাধব দত্ত গালাগালিই দিন আর মারধোরই করুন, তাতে আদালত আলির কিছু এসে যেত না। শুধু বলতো—জী হাঁ—

আর তারপর মাধব দত্ত অঘোরে বিছানার ওপর টলে পড়তেন। একবার শুয়ে পড়লে তাঁকে নড়ায় এমন সাধ্য ছিল না কারো। তখন তিনিই বা কে, আর স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবই বা কে!

এ-গল্প আমি আগে বলেছি।

এ যাঁরা আগে পড়েছেন তাঁরা জানেন উনবিংশ শতাব্দীর যে ঐতিহ্য বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত চলে এসেছিল, এ তারই বিকৃত রূপ। তারপর আমরা যখন শ্যামবাজারের দিকে কলেজে পড়বার সময় যাতায়াত করেছি, তখনও তার কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখেছি।

মাধব দত্তর সেই লাল বাড়িখানা তখনও সেইরকমই অটুট ছিল। সেই লাল রং। সেই সদরফটক, সেই দেউড়ি, সেই বার-মহল। সেই পেছন দিককার বিরাট বাগান।

যে নাচ-দরবারে মাধব দত্ত বসতেন, তার মেঝের ওপর সেই লম্বা-চওড়া ফরাস তখন পাতা ছিল। আগে নাকি ফরাসটার ওপর করসা চাদর পাতা থাকতো। চারপাশে লম্বা লম্বা বেলজিয়াম কাঁচের আয়না ঝোলানো থাকতো। ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলতো মাথার ওপর। আর গোটা দশ-বারো তাকিয়া ছড়ানো থাকতো ফরাসটার ওপর।

আর ফরাসের সামনে অনেকখানি জায়গা শ্বেত-পাথরে ঢাকা ছিল। শ্বেত-পাথরের মেঝে, কিন্তু তার ওপর রং-বেরঙের পাথর দিয়ে একটা মস্ত পদ্মফুল আঁকা ছিল।

মাধব দত্তর পূর্বপুরুষের আমলে ওখানে নাচ হতো। বেনারস-লক্ষ্ণৌ থেকে বাঈজী-সাহেবারা আসতো মুজরো নিয়ে। যাবার সময় ইনাম নিয়ে যেত। আবার পরের বছর আসবার বরাত নিয়ে যে-যার দেশে ফিরে যেত।

কিন্তু মাধব দত্তের আমলে সে-নিয়ম উঠে গিয়েছিল।

মাধব দত্ত বাড়িতে নাচ-গানের পক্ষপাতী ছিলেন না। বাড়িতে মেয়েমানুষ নিয়ে এসে স্ফূর্তি করা তাঁর ধাতে সইত না।

মাধব দত্ত বলতেন—বাড়িতে ও-সব বেলেল্লাগিরি ভাল্লাগে না—

চাটুজ্জে বলতো—বেলেল্লাগিরি আপনার ধাতে সইবে না স্যার, আপনি হলেন অন্য ধাতের—

মাধব দত্ত খুশী হতেন শুনে।

বলতেন—জানো চাটুজ্জে, সে-কালের কর্তাদের তো কাজকর্ম করতে হতো না, কেবল স্ফূর্তি করে গেছে, টাকা উড়িয়ে গেছে। আমরা হলুম খেটে-খাওয়া মানুষ, আমাদের ও-সব পোষাবে কেন হে!

নন্দকিশোর বলতো - সে-যুগে স্যার কর্তাদের দায়িত্বজ্ঞান ছিল না তো—

মাধব দত্ত বলতেন—এই দেখ না, কলুটোলার মোড়ে যে মস্ত বাড়িখানা, ওখানা তো আমার কর্তাবাবারই ছিল। ছোটবেলায় আমরা ও বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি—

—ওটা তো এখন মল্লিকদের স্যার। ছুঁচো মল্লিকের—

মাধব দত্ত বলতেন—আরে এখন তো ছুঁচো মল্লিকের, কিন্তু ছুঁচো মল্লিকের সম্পত্তি হোল কী করে তাই তো বলছি—

চাটুজ্জে বলতো—তাই নাকি স্যার, কী করে হলো বলুন—

—কী করে হলো শোন, আজমীরের বাঈজী, বুঝলে চাটুজ্জে. আজমীরের বাঈজী কুন্দন বাঈ কর্তাবাবুর ডাক পেয়ে কলকাতায় গান গাইতে এসেছে। কুন্দন বাঈ-এর নাম শুনছো তো ?

নন্দকিশোর বললে—আজ্ঞে কী যে বলেন স্যার, কুন্দন বাঈ-এর নাম শুনিনি ? রেকর্ডে কুন্দন বাঈ-এর গান শুনেছি ছোটবেলায়—

—সেই কুন্দন বাঈ-এর কথা বলছি···

হঠাৎ ধোঁয়া টানতে টানতে নল দিয়ে আর ধোঁয়া বেরোয় না। মাধব দত্তর মেজাজ গরম হয়ে গেল।

লক্ষ্য করেছে চাটুজ্জে। চাটুজ্জে ডাকলে—আদালত—আদালত—

মাধব দত্ত নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। রাগে তখন মেজাজ সপ্তমে উঠেছে তাঁর।

আদালত আলি সর্বনাশের গন্ধ আগেই পেয়েছিল। একটুকু গাফিলতির জন্যেই এমন হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা সাজা-কলকে এনে নলচের ওপর বসিয়ে দিলে।

—কোথায় থাকিস, উল্লুক ?

আদালত আলির ওই এক উত্তর—জী হাঁ—

—ফের যদি গাফিলতি দেখি তো তোকে চাবুক মেরে বাড়ি থেকে বার করে দেব, হারামজাদা কোথাকার—

ধোঁয়া বেরোল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাধব দত্তর মুখেও হাসি বেরোল।

বললেন—তারপর শোন চাটুজ্জে, সেই কলুটোলার বাড়িটার কথা বলি—

কিন্তু তার আগেই এ্যাটর্নী হরনাথ সামনে এগিয়ে এসে কাগজটা মেলে ধরে।

বলে—এইখানটায় একটু সই করে দেবেন দত্ত-মশাই—

মাধব দত্ত বিরক্ত হন।

বলেন—তুমি আবার কাজের সময়ে বিরক্ত করতে এলে কেন বল দিকিনি—

হরনাথ বলে—আজ্ঞে, এই প্রপার্টিটার প্রোবেট হবে—

—তুমি এখন প্রোবেট-টোবেট রাখো দিকিনি হরনাথ। আমি বরাবর দেখেছি কাজের সময় তোমার যত তাড়া! দেখছো এখন একটা কাজ করছি—

হরনাথ কাগজটা গুটিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসে।

মাধব দত্ত বলেন—এই তোমাকে বলে রাখছি, কাজের সময় কখখনো আমাকে বিরক্ত করবে না। কাজের সময় বিরক্ত করলে আমার মাথা-গরম হয়ে যায়—

হরনাথ আর দাঁড়ালো না। অনেকক্ষণ ধরে বসে ছিল হরনাথ এই সামান্য কাজটার জন্যে। কিন্তু হলো না। মাধব দত্ত যখন গল্প করতে বসবেন তখন কারো সাধ্যি নেই তাঁকে বিরক্ত করে।

চাটুজ্জ্যে বললে—হ্যাঁ দত্তমশাই ঠিক বলেছেন, যত সব বাজে ঝামেলা। তারপর বলুন আপনার গল্পটা—

মাধব দত্ত বললেন—তবে শোন—

বলে গড়গড়ার নলটা আবার মুখে তুলে নিলেন—

বললেন—জানো, কুন্দন বাঈ তো গান গাইতে এল আমার কর্তাবাবার মুজরো নিয়ে। এসে উঠলো ওই কলুটোলার বাড়িতে। সে কী রূপ কুন্দন বাঈএর, একেবারে সারা গা-ভরা রূপ—

নন্দকিশোর বুঝতে পারলে না।

জিজ্ঞেস করলে—গা-ভরা রূপ মানে?

—দেখেছ চাটুজ্জে, নন্দকিশোর কীরকম বেরসিকের মত কথা বলে? এইজন্যেই তো আমি বেরসিকদের দেখতে পারি নে। গা-ভরা রূপ মানে বোঝনা? গা-ভরা রূপ মানে হচ্ছে ভরা-যৌবন। এবার বুঝলে?

নন্দকিশোর লজ্জায় পড়লো বড়।

বললে—আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারিনি—

—বুঝতে পারবে কী করে? তোমার কি রস-জ্ঞান-ট্যান কিছু আছে। এতদিন আমার দরবারে আছো, এখনো একটু রস-জ্ঞান হলো না। লোকে বলবে কী বলো তো?

চাটুজ্জে বললে—আজ্ঞে, গুলি মেরে দিন, গুলি মেরে দিন ওর কথায়—

মাধব দত্ত বললেন—গুলি ওমনি মারলেই হলো? সোজা কথাটা বুঝতে পারবে না? সোজা কথা যদি বুঝতেই না পারবে তো কথা বলে লাভ কী, বলো? কথা বলে আমার লাভটা কী শুনি? কথা বলতে কষ্ট হয় না?

চাটুজ্জে বললে—তা তো হবেই। কথা বললেই শক্তির তো অপচয় হয়—

—তাহলেই বোঝ! আমি যে-কথাগুলো বলি সেটা তো সোজা কথা নয়, যে ভাবলুম আর মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল। আমি অনেক ভেবেচিন্তে তবে কথা বলি, তা জানো?

চাটুজ্জে বললে—তারপর দত্ত-মশাই, তারপর?

মাধব দত্ত বললেন—হাঁ একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল চাটুজ্জে, তোমাদের পাড়ায় সেদিন বলছিলে একজন মহিলার স্বামী মারা গেল… এখন কেমন অবস্থা?

—আজ্ঞে হাঁ, সে তো আমি বলেছি আপনাকে। অবস্থা কী করে ভাল হবে?

মাধব দত্ত উদ্বিগ্ন হলেন।

বললেন—তা অবস্থা ভালো না হলে চলছে কী করে।

—আজ্ঞে চলছে না।

—চলছে না মানে ?

চাটুজ্জে বললে—তার দুঃখের কথা আর বলবেন না স্যার—বড় কষ্টে চলছে—সে অচল অবস্থাই বলতে পারেন—

—কত বয়েস ?

—আজ্ঞে আঠারো। খুব সুন্দরীও বটে—

—আঠারো ? খুব সুন্দরী ?

চমকে উঠলেন মাধব দত্ত। চমকে উঠলেন আবার রেগেও গেলেন। রেগে গড়গড়ার নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

বললেন—তোমরা তো বড় আহাম্মক হে। একজন সুন্দরী আঠারো বছরের মহিলা অনাথা হলো আর তোমরা কিনা চুপ করে হাত কোলে নিয়ে বসে আছো ?

চাটুজ্জে বললে—আজ্ঞে, কী করবো বলুন ? আমাদের কি টাকা আছে, না সময় আছে। তাকে সাহায্য করতে গেলে টাকার দরকার যে—

—তা টাকারই যদি দরকার আমি তো এখনও বেঁচে আছি, আমি তো মরিনি—

চাটুজ্জে চুক-চুক করে উঠলো।

বললে—ছি ছি, কী যে বলেন আপনি, আপনার মুখে দেখছি কিছুই আটকায় না—আপনি রাগ করবেন না স্যার—

—রাগ করবো না ? তুমি বলছো কী ! তোমায় খুন করে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমার এত রাগ হচ্ছে মনে—

চাটুজ্জে বললে—সে তো জানি, আপনাকে বলতেও ভয় হয়, আপনি একলা মানুষ। আপনি কত দিকে দেখবেন ?

—কত দিকে দেখবো মানে ? লোকে কষ্ট পাবে আর আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি তোমাদের মত ?

বলে ঘন-ঘন ধোঁয়া টানতে লাগলেন।

বললেন—তোমরা সব এক-একটা আহাম্মক, কেউ কষ্ট বুঝবে না। যেন নিজে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারলেই হলো। আরে আহাম্মক, বনের বাঘ-সিংহও তো নিজের খাবারটা জোগাড় করতে পারে, তাতে আর তোমার বাহাদুরিটা কী?

এর পর আর কারো কথা বলবার কিছু থাকে না।

হঠাৎ খানিকক্ষণ পরে মাধব দত্ত বলে ওঠেন—তা হলে কি চুপ করে থাকলেই তোমাদের চলবে? চুপ করে থাকলেই অনাথা বিধবা মেয়েটার সুরাহা হবে?

নন্দকিশোর বলে—আজ্ঞে, আপনার কষ্টের কথা ভেবেই চুপ করে আছি—

মাধব দত্ত রেগে যান।

বলেন—তা এই তোমাদের বুদ্ধি? আমার কষ্টটাই বড় হলো? আর সেই যে রূপসী অনাথা বিধবা নিরাশ্রয় হলো, একটা লোক নেই তাকে দেখবার, তার কষ্টটা বুঝি কিছু নয়? তোমরা গরু, না ভেড়া? তোমাদের ঘটে একটু বুদ্ধি নেই কেন?

তারপর একটু থেমে ডাকেন—আদালত, ও আদালত—

আদালত সামনে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়।

মাধব দত্ত বলেন—চল, তৈরি হ, এই সব আহাম্মকদের জ্বালায় অস্থির—

আদালতের এসব জানা আছে। এরকম অস্থির হওয়ার ঘটনা রোজই ঘটে। আর আদালতের তৈরি হওয়া মানে হুসেন মিয়া আর রহিমের তৈরি হওয়া। অন্দর-মহলের ঠাকুর-ঝির তৈরি হওয়া। লুচি ভাজা আরম্ভ হয়ে যাবে রান্নাবাড়িতে, আলুর দম হবে, বেগুন ভাজা হবে। তারপর ডিম মাংস মাছ তো আছেই। আর তারপর আছে সোডার বোতল আর···

—চাটুজ্জে।

—আজ্ঞে স্যার।

—দেখ তো, আদালত ওগুলো নিতে ভোলেনি তো।

চাটুজ্জে দেখবার আগেই আদালত তার ব্যবস্থা করে ফেলে। দেউড়িতে গাড়ি জোড়া হয়, ঘোড়ার পিঠে লাগাম চড়ে। গাড়ির ছাদে খাবারের চ্যাঙারি ওঠে। আর আসল মাল থাকে আদালতের জিম্মায়। বোতল-টোতল নিয়ে সে তৈরি।

তখন মাধব দত্ত সাজ-গোজ করে বেরোবে। গায়ে মল্‌মলের ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবি, গিলেকরা হাতা। গলায় সোনার মফ্‌চেন আর বুকপকেটে ঘড়ি-ঘড়ির চেন। পায়ে বো-আঁটা পম্প্‌-শু আর হাতে কুকুর-মুখো পাকানো ছড়ি।

গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াবে রহিম বক্স। মাধব দত্ত ওঠবার সময়ে পাছে কোঁচানো-ধুতির কোঁচা আটকে যায় তাই নন্দকিশোর সেটা ধরে সঙ্গে সঙ্গে চলবে। আগে উঠবে মাধব দত্ত, তারপর নন্দ-কিশোর, তারপর চাটুজ্জে।

মাধব দত্ত অনুমতি না দিলে গাড়ি ছাড়তে পারে না কচোয়ান হুসেন মিয়া।

সে তখনও লাগাম ধরে তৈরি হয়ে আছে।

মাধব দত্ত গাড়িতে উঠে যুৎ করে বসে বলবে—কী, সবাই উঠেছে তো ঠিক ?

—আজ্ঞে হাঁ স্যার !

—চাটুজ্জে, তুমি উঠেছ ? আর নন্দকিশোর ?

নন্দকিশোর বলবে—হ্যাঁ, এই তো আমি উঠেছি স্যার—

—ঠিক আছে। আর সীতানাথ ? সীতানাথ কই ? সীতানাথ আসেনি ?

চাটুজ্জে বললে—আজ্ঞে, সীতানাথের শরীরটা একটু ম্যাজ্‌-ম্যাজ্‌ করছে—

মাধব দত্ত হো-হো করে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়লেন।

বললেন—সীতানাথকে আর মানুষ করতে পারলাম না চাটুজ্জে, চিরকালই অমানুষ রয়ে গেল হে—

চাটুজ্জে বললে—আজ্ঞে, যা বলেছেন—

মাধব দত্ত বললেন—বড় বেরসিক হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন—

নন্দকিশোর বললে—শুধু বেরসিক নয় স্যার, একেবার যাকে বলে বেরসিকের বেহদ্দ—

—চলো চলো, আদালত হুসেন মিয়াকে গাড়ি ছাড়তে বল্—

হুকুম পাবার সঙ্গে সঙ্গে হুসেন মিয়া চাবুক ঘোরালো আর মাধব দত্তর গাড়ি ফড়েপুকুর ষ্ট্রীট পেরিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে মিশে গেল।

এও আমি লিখেছি সেই গল্পে। তখনকার আমলে মাধব দত্ত আর পাঁচটা বড়লোকের মত কী-রকম জীবন-যাপন করতো, এইটে দেখানোই ছিল আমার উদ্দেশ্য। অনর্জিত অর্থের অপচয়ের আনন্দে তখনকার সঙ্গতি-সম্পন্ন মানুষদের এই-ই ছিল দৈনন্দিন রুটিন।

কিন্তু এ-গল্প যে কখনও কারো জীবনের সত্যি-ঘটনা হয়ে উঠবে তা তখন ভাবতে পারিনি। ভেবেছিলাম সমাজ-বিবর্তনের চেহারাটা দেখিয়ে আজকালকার সমাজের মানুষদের একটু সচেতন করে দেব।

নীতা বলেছিল—আপনি তো ওদিকে যান মাঝে মাঝে?

বুঝতে পারলুম না। বললাম—কোন্ দিকে?

—ওই আমাদের ফড়েপুকুর ষ্ট্রীটের দিকে?

বললাম—এখন আর যাওয়ার দরকার হয় না ওদিকে। আগে যেতাম। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়বার সময় ওই পাড়ায় অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল, ওই লাহা-বাড়ি, মল্লিক-বাড়ি, দত্ত-বাড়ি, শীল-বাড়ির

ছেলেদের সঙ্গে তাদের বাড়িতে যেতাম, আর নানারকম কাহিনী শুনতাম।

নীতা বললে—মা বলেছে যদি আপনার সময় হয় তো যেদিন ইচ্ছে যাবেন—

জিজ্ঞেস করলেন—তোমার মা কি ওই বাড়িরই মেয়ে?

নীতা বললে—হ্যাঁ—

তারপর একটু থেমে বললে—সেকালের অনেক গল্প মার কাছে শুনেছি। মা'র অনেক বয়েস হয়েছে তো, কেবল আমাদের সেকালের কথা শোনাতে চায়। আমরা শুনতে চাই না বলে মা'র মন-খারাপ হয়ে যায়।

নীতা যা-ই বলুক, আসলে আমার গল্পটা ছিল ওই মাধব দত্তর বাড়ির সীতানাথকে নিয়ে।

সীতানাথবাবু।

চাটুজ্জে মাঝে-মাঝে সীতানাথের কাছে যেত। আস্তাবল-বাড়ির ছোট ঘরখানার মধ্যে গিয়ে ডাকতো। বলতো—ও সীতানাথ, সীতানাথ—

সীতানাথ তখন তক্তপোষটার ওপরে একটা আধ-ময়লা গামছা পরে হয়ত শুয়ে আছে।

উঠে পড়তো—কী চাটুজ্জে? কী খবর?

—তুমি যাবে না?

—কোথায়?

—আরে, আজকে খড়দ'য় যাচ্ছি আমরা।

—খড়দা'য় কোথায় ?

—আরে, খড়দ'র গোঁসাইপাড়ায়। একটা ভাল খবর আছে। খুব ভাল জিনিস, মানে যাকে বলে জবরদস্ত !

সীতানাথ বলতো—তোমরা যাও ভাই, আমি যেতে পারবো না, শরীরটার তেমন যুৎ নেই।

—আরে তুমি দেখছি যৌবনে যোগী হয়ে যাচ্ছো! এই ভরা-যৌবনেই এমন বুড়িয়ে গেলে হে! চল্লিশ পেরোলে তখন কী করবে ?

—আর ভাই, আমাদের কথা ছেড়ে দাও।

—কিন্তু কর্তা যে তোমার কথা বলছেন। বলছিলেন সীতানাথটা দিন-দিন বড় বেরসিক হয়ে যাচ্ছে। একেবারে যাকে বলে বেরসিকের বেহদ্দ! আরে, ভগবান রাত তৈরী করেছিল ফুর্তি করার জন্যে, আর তুমি কিনা সেই ভগবানের দেওয়া রাতগুলো এই ঘুপচি ঘরে ঘুমিয়ে কাবার করে দিলে—

দুঃখ করতো সীতানাথ।

বলতো—আমার কথা আর বোল না ভাই, আমি একেবারে মানুষের বার হয়ে গেছি—

এরপর আর সময় নষ্ট করতো না চাটুজ্জে। সীতানাথের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলাটাও সময় নষ্ট করা মনে হতো চাটুজ্জের।

অথচ এমন ছিল না আগে। সে বহুদিন আগেকার কথা। তখন ওই হাতীবাগানের মোড়ে ফোটোগ্রাফির দোকান করেছিল সীতানাথ। জোয়ান বয়েস তখন। সুন্দর লাল টুকটুকে ছেলেটা। ক্যামেরা নিয়ে নাড়াচাড়া করতো ছোটবেলা থেকে। ক্যামেরা দামী জিনিস। কেউ সহজে হাত দিতে দিত না। কিন্তু কারো কাছে ক্যামেরার সন্ধান পেলেই নেড়েচেড়ে দেখতো। ছবি তোলার সময় পেছন-পেছন ঘুরতো।

তারপর কাকা একদিন একটা দোকান করে দিলে।

সেই সময়েই এই মাধব দত্তর সঙ্গে তার পরিচয়।

মাধব দত্ত একদিন বললে—ওহে চাটুজ্জে, ভালো ছবি তুলতে পারে এমন কেউ আছে ?

নন্দকিশোর বললে—আছে স্যার, ডেকে আনবো ?

—ডাকো তো একবার, দেখি কেমন ছবি তুলতে পারে !

তা তখন ছবি তোলায় বেশ নাম হয়েছে সীতানাথের। তখন পর্দার যুগ। মেয়েরা রাস্তায় বেরোয় না। রাস্তায় যদিই বা বেরোয় তো গাড়িতে করে।

তাও আবার ঘোড়ার-গাড়ির জানালা-খড়খড়ি সব বন্ধ করে। রাস্তায় যদি কেউ মেয়েমানুষ দেখতে পেলে তো হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার ওপর। থিয়েটারে মেয়েদের দোতলার ওপর বসবার ব্যবস্থা। যাত্রার আসরে মেয়েদের দিকটা চিক্‌ দিয়ে ঢাকা।

কিন্তু ফোটোগ্রাফারের কাছে লজ্জার বালাই থাকলে চলবে না।

সুন্দরী-সুন্দরী গেরস্থঘরের বাবুরা বাড়িতে ডেকে পাঠাতো সীতানাথকে। তাদের বাড়ির মেয়েদের ছবি তুলতে হবে। একেবারে বাড়ির অন্দরমহলের ভেতর গিয়ে ঢুকতে হতো। যে-বাড়িতে পুরুষ-মাছির পর্যন্ত ভেতরে ঢোকা নিষেধ, সেখানেও সীতানাথের অবাধ গতি।

একেবারে মেয়েদের কাছাকাছি মুখোমুখি ঘেঁষাঘেঁষি।

সুন্দরী সুন্দরী বউ সব। বলতে গেলে সূর্যও কখনও তাদের মুখ দেখতে পায়নি। সেইসব মেয়ে-বউদের কাছাকাছি মুখোমুখি ঘেঁষাঘেঁষি হওয়া।

সীতানাথ বলতো—ফুর্তি যা করবার তা তখন সব করে নিয়েছি ভাই।

চাটুজ্জে নন্দকিশোর জিজ্ঞেস করতো—কী রকম ? কী রকম ?

সীতানাথ বলতো—কারো গালে হাত দিতে ইচ্ছে হলে গালটা ধরে বাঁদিকে সরিয়ে দিয়ে বলতুম—একটু বাঁদিকে মুখটা ফেরান—আর একটু, আর একটু বাঁদিকে—

সীতানাথ আবার বলতো—ওসব তোমরা দেখ ভাই, আমার ওসব পর্ব শেষ।

তা যখন সীতানাথের বেশ নাম হয়েছে চারদিকে তখন একদিন চাটুজ্জে আর নন্দকিশোর গিয়ে হাজির হলো সীতানাথের দোকানে।

চাটুজ্জে বললে—ছবি তুলতে পারবেন আপনি?

—কার ছবি?

নন্দকিশোর বললে—আমাদের কর্তার ইচ্ছে যে তাঁর মেয়েমানুষদের ছবি তুলে রাখেন—

—মেয়েমানুষদের? তার মানে?

—বলি, মাধব দত্তর নাম শুনেছেন? ফড়েপুকুরের বিখ্যাত দত্তবংশের মাধব দত্ত?

সীতানাথ বললে—খুব নাম শুনেছি—

—আজ্ঞে তাঁরই মেয়েমানুষদের।

—কোথায় গিয়ে ছবি তুলতে হবে?

চাটুজ্জে বললে—তা কি ঠিক আছে মশাই? আজ হয়ত খড়দ'র যেতো হলো, কাল হয়ত আবার চন্দননগরে। কিম্বা আজ গেলেন চন্দননগরে, কাল হয়ত কলুটোলায়। কোনও ঠিকঠাক নেই। কর্তার মেজাজের যেমন কোন ঠিক নেই, তেমনি কর্তার মেয়েমানুষেরও কোন ঠিক নেই। মেজাজ বুঝে কাজ করতে পারবেন?

সীতানাথ বললে—তা পারবো না কেন? টাকা দিলে সবই পারবো। আমার তো এই-ই কাজ—

—এক-একদিন রাত্তিরে কিন্তু বাড়ি ফিরতে পারবেন না। চাই কি পর পর সাতদিন সাতরাত মাহেশের মেলায় বজরায় কাটিয়ে দিলেন।

সীতানাথ বললে—এ আর নতুন কথা কী! এ তো কলকাতায় হামেশাই করছি! টাকা দিলে করতে কী?

চাটুজ্জে বললে—আরে, এখানে শুধু টাকা নয়, এখানে টাকার সঙ্গে পেসাদও পাবেন—

—পেসাদ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পূজোর যেমন পেসাদ থাকে, পেসাদ না হলে তো পূজো হয় না, তেমনি মাইফেলেরও আবার পেসাদ আছে। পূজোটা তো ফাউ, পেসাদটা হলো আসল।

ইঙ্গিতটা বুঝলো সীতানাথ।

তখন বয়েস কম। প্রসাদের লোভ তখন কম নেই। . সেই

বললে—চলুন— াট টুকরো

এ-সব সেই আদিকালের কথা। সেইখান থেকেই এই গ
শুরু করেছিলাম। সেই-ই প্রথম সীতানাথ এসেছিল এ-বাম।
এই ফড়েপুকুর ষ্ট্রিটে। তখন থেকেই সেই গল্প আরম্ভ হয়েছিল ছিল। আর

কিন্তু এতদিন পরে সে-গল্প কেউ মনে রেখেছে, তা কল্পনা থানেই একটা
পারিনি। বলতে গেলে আমার নিজেরও গল্পটা স্পষ্ট মনে নেইাম দিয়েছেন

সেদিন আবার ওই পাড়ার দিকে গিয়েছিলাম। শ্যামবাঃ
দিকের পাড়াগুলোর একটা মেজাজ আছে। সে-মেজাজ দার বোনের
কলকাতায় নেই। এদিকে কেমন যেন সব-কিছু ছাড়া-ছাড়া। কারোর সঙ্গে কারোর মেলামেশি নেই। আর ওদিকটায় সবকিছু ঘেঁষাঘেঁষি, সবকিছুই মাথামাথি।

ওই মাথামাথি আবহাওয়াটা আমার বরাবর ভাল লাগে।

ঠিক সময়ে ঠিক দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। কে একজন দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কাকে চাই ?

বললাম—নীতা আছে ?

ভেতর থেকে একজন মহিলার গলার আওয়াজ পেলাম—কে রে ভুতো ?

আমি আমার নিজের পরিচয় দিলাম। পরিচয় দিতেই এক বৃদ্ধা মহিলা থপাস্-থপাস্ করতে করতে এগিয়ে এলেন।

বললেন—আসুন, আসুন, নীতা কোন ষ্টুডিওতে গেছে, এখুনি আসবে, ও আপনার কথা বলছিল। বলছিল আপনি একদিন আসবেন বলেছেন···

বললাম—এদিকে এসেছিলাম, তাই মনে পড়লো আপনার কথা—

ভদ্রমহিলার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে গিয়ে একটা ঘরে বসলাম। মাধব দত্তর বাড়ীতে যে ধরণের ছবি টাঙানো থাকে, সেই ধরণের ছবিই সব টাঙানো রয়েছে দেয়ালে। নিচু নিচু চেয়ার। যেসব ছবি এদিকে ওদিকে ছোট ছোট ফ্রেমে বাঁধানো রয়েছে তা সবই মানুষেরে। নীতা রায়ের। নীতা যেসব থিয়েটারে, সিনেমায় যেসব ...কায় নেমেছে, তারই সব স্যাম্পল্।

...দ্রমহিলা বললেন—নীতা তো সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দত্তবংশে-ষ্টুডিওয় ঘুরে বেড়ায়। ওসব অভিনয় করে কী যে হবে সীতে পারি না। ওকে কত করে বলি বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে, ...ও হয় না—

...লাম—আজকাল তো অনেকেই দেখছি বিয়ে করে না—

চভদ্রমহিলা বললেন—কোন্‌টা ভালো, আর কোন্‌টি মন্দ তাও বুঝতে পারি না। সেকালও দেখলুম, আবার একালও দেখছি, কোনও তফাৎ খুঁজে পাচ্ছি না, মনে হয় যেন সেই সেকালই রয়েছে, কোনও কিছুই বদলায়নি! আপনি তো আপনার গল্পে সবই লিখে গেছেন।

বললাম—আমি যা কিছু লিখেছি সবই কিন্তু কল্পনা করে করে—

ভদ্রমহিলা বললেন—কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, আপনি যা লিখেছেন সবই সত্যি—

—সব সত্যি?

ভদ্রমহিলা বললেন—হ্যাঁ সব সত্যি, ওই মাধব দত্তও সত্যি, ওই চাটুজ্জে নন্দকিশোর, ওরাও সত্যি, ওই হরনাথ এ্যাটর্নীও খাঁটি সত্যি আর মাধব দত্ত ঠিক ওমনি করেই প্রতি রাত্রে ফুর্তি করতে

বেরোতেন, আর বাড়ীতে তাঁর স্ত্রী শোবার ঘরে একল-একলা রাত কাটাতেন। কোনওদিন তার ঘুম আসতো না—

আমি বললাম—কিন্তু বিশ্বাস করুন, ও সবই আমার কল্পনা—

—তা হবে, হয়ত আপনার কল্পনাই হবে। কিন্তু আশ্চর্যরকম ভাবে মিলে গেছে আমার দেখা জীবনের সঙ্গে। শুধু নাম-গুলো আপনি বদলে দিয়েছেন।

আমি সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম।

ভদ্রমহিলা বললেন—এ বাড়িটা সেই মাধব দত্তেরই, এই সেই নাচ-দরবার। এখন এ ঘরটাকে দেয়াল দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করতে হয়েছে। অর্ধেকের বেশি বিক্রী করেও দিয়েছি—

আমি অবাক হয়ে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম।

তিনি বলতে লাগলেন—এরই উত্তরে সেই বাগানটা ছিল। আর উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল সেই আস্তাবল-বাড়িটা, সেখানেই একটা ঝুপড়ি ঘরে থাকতো আমার মামা, যাঁকে আপনি নাম দিয়েছেন সীতানাথবাবু—

—আপনার মামা? তার মানে আপনি সীতানাথ-বাবুর বোনের মেয়ে? কিন্তু তার বোনের কথা তো আমি কিছু লিখিনি?

—আপনি লেখেন নি, কিন্তু তাঁর বোন ছিল একজন। আমি তারই মেয়ে!

কী বিচিত্র ব্যাপার সব জীবনে ঘটে! আমি এতদিন সংসারে বেঁচে থেকে এ বৈচিত্র্যের কোন কুল-কিনারা আজ পর্যন্ত খুঁজে বার করতে পারিনি।

বললাম—এরকম ঘটনা আমার জীবনে আর একবার ঘটেছিল।

ভদ্রমহিলা বললেন—কী রকম?

বললাম—জানেন, অনেকদিন আগে 'সাহেব বিবি গোলাম' বলে একটা উপন্যাস লিখেছিলাম। সেটা বাঙলা সিনেমা হয়েছিল। হিন্দী সিনেমাও হয়েছিল। হিন্দী-সিনেমাওয়ালারা কলকাতায় এসে উত্তর-

পাড়ার জমিদারবাড়ির ভেতরে ছবি তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁরা ছবি তুলতে দেননি।

—কেন?

—তাঁরা বললেন—ও গল্প আমাদের পরিবারকে নিয়ে লেখা, আমাদের বাড়ির ভেতরে ও-ছবি তুলতে দেব না।

ভদ্রমহিলা বললেন—সে তো আমরাও জানি। আমরা বনমালী সরকার লেন খুঁজতে গিয়েছিলাম বৌবাজারে, ভেবেছিলাম বড়-বাড়িটার চেহারা দেখতে পাবো, কিন্তু এ তা নয়, এ একেবারে সত্যি। ওই সীতানাথবাবুকে সত্যি সত্যিই আপনার মাধব দত্ত খুন করেছিলেন—

বললাম—সত্যিই আজব ঘটনা। তাহলে অলৌকিক ঘটনা এখনও ঘটে দেখছি—

শেষটা অলৌকিকই বটে!

এমন অলৌকিক ব্যাপার যে ঘটবে তা কে-ই বা কল্পনা করতে পেরেছিল? মাধব দত্তও কল্পনা করতে পারেনি, সীতানাথবাবুও কল্পনা করতে পারেনি।

আর মাধব দত্তর ছেলে?

যতদূর মনে পড়ে তার নাম দিয়েছিলাম বৃন্দাবন। বৃন্দাবন দত্ত।

সেই ছেলেই শেষকালে কিনা···

কিন্তু সে-সব কথা পরে বলবো।

সীতানাথবাবু প্রথম যখন এ বাড়িতে এলো, ফুটফুটে চেহারা। বাবরি চুল, ফিন্‌ফিনে আদ্দির গিলেকরা পাঞ্জাবি। লপেটা জুতো। চেহারা দেখেই মাধব দত্ত মঞ্জুর করে ফেললে।

বললে—কী রকম ছবি তোল, স্যাম্পল আছে কিছু ?

স্যাম্পল দেখালে সীতানাথ। মাধব দত্তর পছন্দ হয়ে গেল।

বললেন—আজ আমাদের সঙ্গে খড়দ'য় যেতে পারবে ? সেখানে গিয়েই ছবি তুলতে হবে।

—পারবো না কেন ? আমার তো তাই-ই পেশা!

তা সেই-ই হলো সূত্রপাত। দলের সঙ্গে সীতানাথ চললো খড়দ'য়। সেখানে গোঁসাই পাড়ায় গিয়ে রাত কাবার হয়ে গেল বাবুর সঙ্গে। খানাপিনা হলো, নাচ হলো, গান হলো। তারপর পরের দিন ফিরে এলো দলের সঙ্গে কলকাতা। আর সেই যে দলে এসে জুটলো, আর তখন থেকে তার ফিরে যাবার কথা মনে উঠলো না। সীতানাথও রয়ে গেল চাটুজ্জেদের সঙ্গে।

প্রথম প্রথম দোকানটা চালিয়েছিল সীতানাথ। কোনও রকমভাবে চালানো। সে প্রায় না-চালানোরই মত।

কোনওদিন দোকান খোলে, কোনওদিন খোলে না। খদ্দের দোকানে এসে ফিরে যায়। কাজ দিলে সময়মত ছবি পাওয়া যায় না। কাকা ছিল মাথার ওপর।

একদিন কাকা বেদম বকুনি দিলে।

বললে—টাকা দিয়ে দোকান করিয়ে দিয়েছি তোমার ফুর্তি মার জন্যে ?

বাস, সেই-ই শেষ।

মাধব দত্ত বললে—কুছ পরোয়া নেই, আমার এখানে থাকো। আমার এখানে থাকবে খাবে আর ফুর্তি করবে। ফুর্তি করলে এখানে কেউ বেজার হবে না। দম মেরে কেবল ছবি তুলে যাও—

এ-সব সেই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। সেই তখন থেকেই সুরু হয়েছিল মাধব দত্তর নৈশ-বিহার। সেই নৈশ-বিহারের সুরু থেকেই বলতে গেলে জুটে গিয়েছিল সীতানাথ।

সেই সময়ে হঠাৎ একটা কাণ্ড হলো।

সেদিন মাধব দত্ত সদববলে নৈহাটিতে যাচ্ছে। মাধব দত্তের অষ্টম-পক্ষের মেয়েমানুষ তখন নৈহাটিতে সংসার পেতেছে।

মাধব দত্তর হঠাৎ খেয়াল হলো সে-রাতটা নৈহাটিতে তার অষ্টম-পক্ষের সংসারে গিয়েই রাত কাটাবে। তোড়জোড় সুরু হয়ে গেল। আদালত আলি ভেতরে খবর পাঠিয়ে দিলে। লুচিভাজা, মাংস, আলুর দম, সোডার বোতল আর লালপানি যাবে সঙ্গে। প্রতিদিনের নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হলো না।

গাড়িতে উঠে মাধব দত্ত গড়গড়ার নলটা মুখে দিলে।

বললে—সব উঠেছে তো?

চাটুজ্জে বললে···আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, সব উঠেছে···

—নন্দকিশোর, তুমি উঠেছ?

নন্দকিশোর বললে—হ্যাঁ, এই তো উঠেছি স্যার—

—বোতলগুলো উঠেছে?

আদালত আলি ওপর থেকে বললে—জী হাঁ।

—আর সীতানাথ?

চাটুজ্জে বললে—সীতানাথ এলো না স্যার, সীতানাথের শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে, সে শুয়ে আছে।

মাধব দত্ত বললে—সীতানাথটা দিন-দিন একেবারে বেরসিক হয়ে পড়ছে—

নন্দকিশোর বললে—হ্যাঁ স্যার, একেবারে যাকে বলে বেরসিক, একেবারে বেরসিকের বেহদ্দ—

মাধব দত্ত বললে ঠিক আছে, আদালত, এবার হুসেন মিয়াকে গাড়ি ছাড়তে বল—

সেদিন সীতানাথ ঝুপড়ির মধ্যে একা-একা শুয়েছিল।

হঠাৎ মনে হলো কে যেন দরজায় টোকা দিলে। এত রাত্রে কে টোকা দেয় দরজায়? শুয়ে শুয়েই সীতানাথ বললে—কে?

কোনও উত্তর নেই।

সীতানাথ আবার একবার জিজ্ঞেস করলে—কে ? কে গো তুমি ? কে দরজায় টোকা দিচ্ছ ?

কেউই না। কেউই সাড়া দিলে না। সীতানাথ একবার উঠলো। দরজাটা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। আস্তাবল-বাড়িটা ফাঁকা। বাইরে বাগানের করবীগাছটার পাতায় চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

সীতানাথ আশে-পাশে চারদিকে চেয়ে দেখলে। সমস্ত বারমহলটা খাঁ খাঁ করছে। কেউ কোথাও নেই।

অনেকক্ষণ সেই অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে রইল সীতানাথ।

তারপর আবার নিজের ঘরের তক্তপোষের ওপর উঠে শুয়ে পড়লো।

মনের ভুল। হয়ত মনের ভুল। তাকে কে ডাকতে যাবে। কার এমন মাথা-ব্যথা পড়েছে। তাকে মনে করে কেউ ডাকবে এমন কেউ নেই তার। একটা মাত্র বোন আছে বরানগরে। তারও বিয়ে হয়ে গেছে। আর তা ছাড়া তারা তো পাগল নয়। পাগল ছাড়া এত রাত্তিরে কে আর দরজায় টোকা দেবে!

পরের দিন সকাল-বেলা সীতানাথ ঘুম থেকে যথারীতি বিছানা ছেড়ে উঠলো।

কলের কাছে চান করতে গিয়ে সরলার সঙ্গে দেখা। সরলা বালতি নিয়ে বারবাড়ির দিকে আসছিল।

সীতানাথবাবু ডাকলে—সরলা, ওগো ও সরলা, শুনছো—

সরলা সীতানাথবাবুকে দেখে ঘোমটা দিয়ে সরে গেল।

—বলি ও সরলা, শুনতে পাচ্ছো ?

সীতানাথবাবু তখন গামছা পরেছে, গায়ে তেল মেখেছে। চান করতে যাচ্ছে। বললে—হ্যাঁ গা সরলা, কাল রাত্তিরে তুমি আমার ঘরে টোকা মেরেছিলে নাকি গা ?

সরলা থমকে দাঁড়ালো।

—আমি? আমি তোমার ঘরে টোকা দিয়েছি? তুমি কী বলছো গো? আমি কখন টোকা মারতে গেলুম?

সরলা অন্দরমহলের অনেককালের খাস-ঝি। অন্দর-মহলের কাজকর্মই করে। কচিৎ-কদাচিৎ বারবাড়িতে আসে।

সীতানাথবাবু বললে—এই কাল রাত্তিরে কর্তাবাবু বেরিয়ে যাবার পর বনমালী আমায় ভেতরে খেতে ডাকতে এল। আমি রান্নাবাড়ির দাওয়ায় বসে খেয়ে নিয়ে বাইরে চলে এলুম। তারপর পেটটা খুব ভরে গিয়েছিল, তাই শুলুম আর ঘুমিয়ে পড়লুম তখন আমার মনে হলো কে যেন আমার দরজায় টোকা মারলে।

সরলা বললে—না বাবু, আমার অমন ভীমরতি ধরেনি যে ভদ্দর-লোকের ঘরের দরজায় আমি টোকা মেরে ঘুম ভাঙাবো। আমার অমন স্বভাব-চরিত্তির নয়—

সীতানাথবাবু বললে—না, আমিও তাই ভাবছিলাম—যে সরলা তো ভালমানুষের মেয়ে, সরলাকে তো আমি চিনি, সরলা তো এমন নয়—

—তাহলে হয়ত সৈরভী-মাগীর কাণ্ড!

—তাই নাকি? তা হতে পারে। তাহলে তুমি নও, সৌরভীরই কাণ্ড!

সেদিন ওই পর্যন্তই। সরলা ভালোমানুষের মত নিজের কাজে চলে গেল।

মাধব দত্তর অন্দর-মহলে একটা ঝি নয়, ঝিয়ের যেন মেলা বসে গেছে। বহুকাল থেকে বহু যুগ থেকে পূর্ব-পুরুষের আমলের সব ঝি-রা কাজ করে আসছে এ-বাড়িতে। একবার যে আসে সে আর বেরোয় না। একবার এ-বাড়িতে এলে সে থেকেই যায়। তারপর তার নিজের আত্মীয়স্বজন থেকে সুরু করে দেশের লোক পাড়াপড়শী সবাইকে এনে ঢোকায়। যখন তাদের ঝগড়া বাধে তখন সে দেখবার মত।

বনমালী এসে ডাকতো সীতানাথবাবুকে।

বলতো—চলুন বাবু, খাবার দেওয়া হয়েছে।

আগে বেশ সময় মত এসে খেতে ডাকতো বনমালী। আগে চাকর-ঝি-দরোয়ান বেশ খাতিরও করতো। সীতানাথবাবু চান-টান করে তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গেই খেতে ডাকতে আসতো। বাড়ির ভেতরে গেলে ঝি-ঝিউড়িরাও গলার সুর নামাত। মোটমাট একটু সমীহ করতো।

কিন্তু অনেকদিন থাকলে যা-হয়, শেষে আর কেউ মানতে চাইতো না। সীতানাথ-বাবু আস্তাবল-বাড়িতে তৈরি হয়ে বসে বসে শেষ-কালে হাই তুলতে আরম্ভ করতো।

হুসেন মিয়া আর রহিম বক্স তখন রান্নাবান্না সেরে খেয়ে নিয়েছে।

সীতানাথবাবু সেখানে গিয়ে দাঁড়াতো।

বলতো—কি গো হোসেন তোমাদের খাওয়া-দাওয়া সারা?

হোসেন মিয়া বলতো—হ্যাঁ বাবু, হ্যাঁ খাওয়া হয়েছে। আপনার?

—আমার কথা বোল না মিয়াসাহেব! আমাকে এখনও খেতে ডাকলে না। বনমালীর কাণ্ডটা একবার ভেবে দেখ দিকিনি। বুড়োমানুষ হয়েছি, ক্ষিধে পায় না? তোমরাই বলো না, ক্ষিধে পায় না?

হুসেন মিয়া বলে—তা তো পাবেই, ক্ষিধে তো পাবেই!

—তবেই বোঝ, তোমরা বেশ আরামে আছো মিয়া সাহেব। তোমরা নিজের হাতে রান্না করছো, আর খেয়ে-দেয়ে ঘুমোচ্ছ। আর এ যে কী বাড়ি হয়েছে, এদের কারো একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই। আমার পেট চোঁ-চোঁ করছে ক্ষিধের জ্বালায় অথচ এদের কারো সেদিকে হুঁশ নেই—

হুসেন মিয়া রহিম বক্স, তারা কি বলবে? তারা চুপ করে থাকে। তারা তো এই সীতানাথবাবুর এককালের খাতির দেখেছে।

তারা তো দেখেছে বাড়ির ঝি-চাকর থেকে সুরু করে কর্তাবাবু পর্যন্ত কি তারিফ করেছে এই সীতানাথবাবুকে।

সেদিন হঠাৎ সৌরভী এল।

বললে - হ্যাঁ বাবু, আপনি আমার নামে কি বলেছেন শুনি? আমি আপনার দরজায় রাত্তির বেলায় গিয়ে টোকা দিয়েছি?

—সে কি কথা?

সীতানাথবাবু চম্‌কে উঠলো। যেন ঘুণাক্ষরে এমন কথা বলতে পারে না সীতানাথবাবু এমনি মুখের ভাব।

বললে—তোমার নামে আমি বলেছি? ছি ছি, এমন কথা কি আমি কখনও বলতে পারি সৌরভী? তুমি কত ভালো মেয়ে তা কি আমি জানি নে? কে বললে শুনি? কোন হারামজাদী বললে এ-কথা? সিন্ধুবালা বুঝি?

—সিন্ধুবালা কেন হবে? ওই সরলা হারামজাদী। সরলা হারামজাদী তো আমার ভালো দেখতে পারে না, আমার নামে গিয়ে লাগিয়েছে বউরাণীর কাছে।

—বউরাণী?

বউরাণীর কথা শুনেই সীতানাথবাবু একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো।

বললে—বউরাণী শুনে কি বললেন?

সৌরভী বললে—বউরাণী? বউরাণী তেমন কান-পাতলা মানুষ নয় গো যে যে-যা বলবে তাই শুনবে।

সীতানাথবাবুর মুখে হাসি বেরোল।

জিজ্ঞেস করলে—বউরাণী বুঝি খুব ভালোমানুষ গো সৌরভী?

—খুব ভালো মানুষ গো বাবু, খুব ভালোমানুষ। বউরাণীর মত অত ভালোমানুষ হয় না।

সীতানাথবাবু বললে—আহা, তোমার বউরাণীর বড় কষ্ট, না গো সৌরভী?

সৌরভী বললে—কেন, কষ্ট কিসের গা? কষ্ট কেন হতে যাবে?

সীতানাথবাবু বললে—কর্তাবাবু তো বাড়ীতে শোয় না তাই বলছি—

—তা নাই বা শুলো, বউরাণীর গা-ভরা কত গয়না তা তো জানেন না। অত সোনা-দানা পেলে সোয়ামীর তুঃখুও ভোলা যায়!

সীতানাথবাবু বললে—হাজার গয়না থাক, তবু তো বাছা মেয়েমানুষের মন বলে কথা। মেয়েমানুষের মন কি গয়না পেলে ভরে গো?

সৌরভী বলে—খুব ভরে গো, খুব ভরে। গয়না হেন জিনিস, যে পেয়েছে সেই বোঝে, ও আপনি বুঝবেন না।

বলে হাসতে হাসতে সৌরভী অন্দরমহলে চলে গেল।

সেদিন সীতানাথবাবু ভেতরে খেতে গেল। বনমালী এসে এক গেলাস জল দিয়ে চলে গেল। একপাল ঝি তার আগে ঝগড়া করছিল গলা চিরে।

মাধব দত্তর বাড়িতে ঝিএর যত মেলা, তেমনি বেড়ালের পাল। এক-একটা বেড়ালের চেহারা যেন পশমের তৈরি। খাবার সময় পাতের চারপাশে গোল হয়ে বসে থাকে। একটু অসাবধান হলেই মাছের টুকরোটা ছোঁ মেরে তুলে নেবে তারা।

প্রথম প্রথম সীতানাথবাবু মেরেছিল একটা বেড়ালকে।

—বেরো, বেরো এখান থেকে, বেরো—

বলে এক লাথি ছুঁড়েছিল। বেড়ালটা ছিটকে গিয়ে পড়েছিল একেবারে উঠোনের নর্দমার ওপর।

হাঁ হাঁ করে দৌড়ে এসেছিল সরলা।

—ও কি করলেন বাবু, ও কি করলেন?

সীতানাথবাবু বললে—দেখ না সরলা, দেখ না বেড়ালটার কাণ্ড, পাত থেকে আস্ত মাছটা তুলে নিয়ে গেল একেবারে—

সরলা বললে—তা বলে আপনি সুন্দরীকে লাথি মারবেন?

—সুন্দরী? সুন্দরী আবার কে?

সরলা বললে—ওর নাম তো সুন্দরী। সুন্দরী কত আদরের বেড়াল বৌরাণীর, তাকে আপনি হেনস্থা করলেন ?

বলে তাড়াতাড়ি নর্দমার কাছে গিয়ে কোলে তুলে নিলে সুন্দরীকে। আঁচল দিয়ে গায়ের কাদা মুছে নিলে।

বললে—আহা রে, কেন তুই অমন লোকের পাত থেকে মাছ তুলে খেতে গেলি ? তোর কি মাছের অভাব রে ?

বলে রান্নাঘরে গিয়ে বললে—ঠাকুর, সুন্দরীকে একটা ভাজা মাছ দাও তো গো, বড় মাছ খেতে চাইছে—

ঠাকুরও তেমনি। বউরাণীর আদরের বেড়ালের মাছ খেতে ইচ্ছে হয়েছে, তাতে আপত্তি করবার সে কে ?

সীতানাথবাবু দেখলে ঠাকুর রান্নাঘরের ভেতর থেকে একটা পোনা মাছের টুকরো এনে সরলার হাতে দিলে। সরলা সেখানা আদর করে করে খাওয়াতে লাগলো সুন্দরীকে।

তারপর সীতানাথবাবুর দিকে চেয়ে বললে—মাছ কম পড়েছে তো মাছ একখানা ঠাকুরের কাছে চাইলেই পারতেন, তা কী-রকম ধারা মানুষ গা আপনি ?

এর পর আর সীতানাথবাবু সেদিন বেশি কথা বলেনি ও নিয়ে। দরকার কী বাড়ীর মেয়েদের সংগে কথা বলে! কথা বললেই কথা বাড়ে। তারপর যদি একদিন কথাটা মাধব দত্তর কানে যায় তো হয়ত তখন খাওয়া-পরা আশ্রয় সব-কিছুই উঠে যাবে এ-বাড়ি থেকে।

বেড়াল বলে বেড়াল। বেড়াল দু'চক্ষে দেখতে পারতো না সীতানাথবাবু কোনও কালে।

কিন্তু সেদিন থেকে তাও সহ্য করতে লাগলো।

সহ্য না-করে উপায়ও ছিল না। যার খায় তার বেড়ালকেও খাতির করতে হবে। দোকান উঠে গেছে। মামলা-মকদ্দমা হয়েছে জ্ঞাতিদের সঙ্গে। খাওয়া পরার কোনও সংস্থানও তখন আর নেই সীতানাথের।

শুধু বনমালীকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল সীতানাথ—হ্যাঁ গো বনমালী, তোমাদের বৌরাণী কিছু বলে না?

—কাদের কী বলবে দাদাবাবু?

—এই যে এতগুলো ঝি-ঝিউড়ি দিনরাত ঝগড়া করে, এদেরকে কিছু বলে না তোমাদের বউরাণী? সারাদিন তো কেবল চুলোচুলি করে এ-ওর সঙ্গে···

বনমালী বলতো—আজ্ঞে, বউরাণীর আস্কারা পেয়েই তো সব এই রকম হয়েছে এদের। আগা-পাস্তলা চাবুক মারলে তবে এরা শায়েস্তা হয়।

কিন্তু সেদিন আর এক কাণ্ড ঘটে গেল।

বড় অভাবনীয় কাণ্ড!

মাধব দত্তবাবু সেদিনও সদলবলে বাইরে গেছে।

সীতানাথ একা চিৎপাত হয়ে তক্তপোষের উপর শুয়েছিল, হঠাৎ ঝড়ের মত সৌরভী ঝি ঘরে ঢুকলো।

বললে—হ্যাঁ গা বাবু, আমি নাকি কাল রাত্‌তিরে আপনার ঘরে ঢুকে আপনার বুকে সুড়সুড়ি দিয়েছি?

সীতানাথবাবু তড়াক করে বিছানায় উঠে বসলো।

বললে—সে কী? তুমি আমার বুকে সুড়সুড়ি দিয়েছ? তুমি আর কারো বুক পেলে না, আমার বুকে সুড়সুড়ি দিতে যাবে কেন?

সৌরভীর তখন মার-মূর্তি।

বললে—হ্যাঁ, তাই তো মাগী বললে। কী ঘেন্নার কথা মা!

সীতানাথবাবু বললে—সত্যিই তো ঘেন্নার কথা! আমারই তো লজ্জা করছে শুনে, ছি ছি ছি—

সৌরভী বললে—ভাতারখাকী সব্বনেশে মাগী, আমার নামে নালিশ করে বৌরাণীর কাছে। আমি পোত্‌খালির নস্করবাড়ির মেয়ে, পেটের দায়ে পরের বাড়ি গতর খাটাতে এসেছি।

তারপর সীতানাথবাবুর হাতে ধরে টানতে লাগলো।

বললে—চলো তো বাবু, একবার চলো তো আমার সঙ্গে—

বলে সেই আস্তাবল-বাড়ি থেকে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে একেবারে অন্দর-মহলের দিকে নিয়ে চললো।

সীতানাথবাবু বললে—এ কী কাণ্ড দেখ দিকিনি—

অন্দরমহলের সদর-দেউড়ি পেরিয়ে একেবারে বারান্দায় গিয়ে পড়লো। তারপর সেখানেও পার নেই। একেবারে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

কোথা দিয়ে ঢুকে, কোথা দিয়ে বেঁকে যে কোথায় নিয়ে চললো টানতে টানতে তার ঠিক নেই।

সীতানাথবাবু যত বলে—ওগো সৌরভী, ছাড়ো ছাড়ো—

কিন্তু সেদিকে সৌরভীর খেয়াল নেই। সে তখন এক-নাগাড়ে গালাগালি দিয়ে চলেছে সরলাকে। অথচ সরলাকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

বলতে বলতে একজন বউ একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো আর সামনে সীতানাথকে দেখেই টপ করে মুখে ঘোমটা টেনেই পাশের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর সীতানাথ অবাক হয়ে এক মুহূর্তের জন্যে শুধু সেই মুখখানা দেখতে পেলে। মানুষ যে এত সুন্দর হয় তা যেন কল্পনা করা যায় না। ফটোগ্রাফার সীতানাথ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সব কিছু যেন ভুলে গেল।

নীতার মা এতক্ষণ বসে বসে শুনছিল। বললে—ঠিক যেমন লিখেছেন, তেমনি সব ঘটেছিল, এতটুকু বাড়িয়ে লেখেননি আপনি।

বললাম—এ-সমস্ত কিন্তু আমার কল্পনা।

ভদ্রমহিলা বললে—হয়ত নিছক কল্পনা, কিন্তু একেবারে খাঁটি সত্যি ঘটনা। আমি মা'র কাছ থেকে এ সমস্তই শুনেছি।

—আপনার মা এ-বাড়ির ব্যাপার জানলেন কি করে?

ভদ্রমহিলা বললে—বহুদিন পরে তো ওই মাধব দত্ত তাঁর বাড়ী থেকে মামাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন সব গল্প বলেছিলেন আমার মাকে। মা ছিল বলেই শেষ জীবনে সীতানাথবাবু আশ্রয় পেয়েছিলেন আমাদের বাড়ীতে—

বললাম—সে তো আমি লিখেইছি—

ভদ্রমহিলা বললেন—আপনি যা লিখেছেন তার পরেও অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা আপনি জানেন না। সেইটে বলতেই তো আপনাকে ডেকেছি—

বললাম—বলুন না শুনি—

ভদ্রমহিলা বললেন—আমার মায়ের তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছোট ভাইয়ের জন্যে খুব কষ্ট হলো মনে। কাকা-জ্যাঠারা মামলা-মকর্দমা করে ভাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে এটা খুব কষ্টের।

একদিন সীতানাথ বাবু বসে আছে তার নিজের ঘরখানায়।

হঠাৎ একজন ভদ্রলোক খুঁজে-খুঁজে এলেন দেখা করতে।

দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন—এখানে সীতানাথবাবু বলে কেউ থাকে?

দারোয়ান সঙ্গে করে নিয়ে এল ভদ্রলোককে।

সীতানাথ চিনতে পারলে না। দিদির বিয়ের দিন শুধু একবার দেখেছিলেন ভগ্নিপতিকে। তারপর আর সময়ই পায়নি দেখা করবার।

ভদ্রলোক বললেন—আমি আপনার দিদি মনোরমার স্বামী।

—ও, আপনি আমার ভগ্নিপতি বলরাম মুখোপাধ্যায়?

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ আমি আপনাকে নিতে এসেছি। আপনার দিদিই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে।

সীতানাথ বললে—কিন্তু আমার তো এখানে কোন অসুবিধে নেই—

—কিন্তু পরের বাড়িতে কেনই বা আপনি পড়ে থাকবেন? বরানগরে আমার নিজের বাড়ি। অনেক ঘর পড়ে রয়েছে। দরকার হলে আবার ফটোগ্রাফির দোকান করুন।

সীতানাথের একবার কী যেন মনে হলো।

কিন্তু সেটা সামলে নিয়ে বললে—কিন্তু আমি তো এখানে ভালই আছি, এখানে তো আমার কোন অসুবিধেই নেই।

ভদ্রলোক বললেন—হাজার হলেও আমাদের সঙ্গে আপনার যে সম্পর্ক এঁদের সঙ্গে তো আপনার সে সম্পর্ক নয়। হাজার হলেও এঁরা পর।

সীতানাথের তখন বড় অভিমান হয়েছিল নিজের আত্মীয়-স্বজনের ওপর। তখন আর কারো সঙ্গে দেখা করতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না।

বললে—দিদিকে বলবেন তেমন দিন যদি কখনও আসে তো নিশ্চয়ই যাবো তার কাছে। দিদি ছাড়া তো সংসারে আমার আপন বলতে কেউ নেই।

অগত্যা বলরামবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

—আপনার দিদিকে তাহলে তাই-ই বলি?

সীতানাথ বলে—হ্যাঁ, দিদিকে গিয়ে বলবেন, দিদি আমার কথা যেন ভুলে যায়। দিদি যেন মনে করে আমি মারা গেছি।

কথাটা রূঢ় শোনাল বড়।

সীতানাথ কথাটা বলেই আবার বদলে নিলে।

বললে—বলবেন, আমি একবার যাবো দিদিকে দেখতে, একটু সময় করে নিয়ে যাবো।

ভদ্রলোক বললেন—তাহলে তো ভালো হয়, আমার ঠিকানাটা তাহলে দিয়ে যাই আপনাকে—

বলে নিজের ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে দিয়ে গেলেন।

দিয়ে যাবার সময় বলে গেলেন—তাহলে যাবেন কিন্তু, আপনার দিদি খুব খুশী হবে।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। কিন্তু সীতানাথবাবু তখন ওই মাধব দত্তর বাড়িতে পুরাপুরি আটকে গেছেন। রোজ দুপুরবেলা চোব্য-চোষ্য আহার, দুপুর বেলা দিবানিদ্রা আর রাত্রে জাগরণ।

সীতানাথ নিজের ঘরের দরজাটা খুলে অন্দরমহলের রাস্তাটার দিকে চেয়ে বসে থাকে।

অনেক রাত্রে সৌরভী একটা পান নিয়ে আসে।

সীতানাথ বলে - কী রে সৌরভী, যাবো ? সব তৈরী ?

সৌরভী বলে—হ্যাঁ, সব তৈরি -

তারপর সেই অন্ধকারে টিপ-টিপ পায়ে সীতানাথেরও রুক্মিণী উদ্ধার পালা শুরু হয়। ওদিকে যখন মাধব দত্ত নৈহাটি কিম্বা মাহেশ কিম্বা খড়দ'য় গিয়ে ফুর্তিতে জেগে কাটিয়ে দেয়, তখন তারই অন্দর-মহলে সুরু হয় আর একজনের জাগরণ। মাধব দত্ত তা টের পায় না।

অন্ধকার রাত্রে যখন ঘাসের বুকের মধ্যে অঙ্কুর গজায়, করবী গাছের ডালে ফুল ফোটে, তেমনি সীতানাথও নতুন জীবন খুঁজে পায় মাধব দত্তর অন্দর-মহলে তারই শোবার ঘরের মধ্যে।

কিন্তু পরের দিন আসরে যখন সবাই গোল হয়ে বসে, তখন এক একদিন সীতানাথেরও ডাক পড়ে।

মাধব দত্ত বলেন—কী গো সীতানাথ কেমন আছো?

সীতানাথ বলে—আজ্ঞে ভালো—

মাধব দত্ত বলেন—ছাই ভালো। ভালোটার তুমি কী বুঝলে শুনি? ভগবান রাত সৃষ্টি করেছে ফুর্তি করবার জন্যে, তুমি সেই রাতটা কি না ঘুমিয়ে নষ্ট করছো? তোমার মত আহাম্মক তো আমি দেখিনি হে···

সীতানাথ সবিনয়ে মাথা নীচু করে থাকে।

মাধব দত্ত বলেন—ফুর্তি করে নাও হে, ফুর্তি করে নাও। যে কটা দিন যৌবন আছে সে-কটা দিন শুধু ফুর্তি করে নাও, কী বলো চাটুজ্জে, কালকের খড়দ'য় কেমন ফুর্তি হলো আমাদের বলো তো সীতানাথকে, বলো না। একটু সীতানাথ শুনুক···

সীতানাথ মুখ নিচু করে করে সব অপমান সহ্য করে যেত।

নীতার মা বললেন—এ পর্য্যন্ত যা লিখেছেন সবই ঠিক আছে, কিন্তু তারপর যা লিখেছেন সেখানটাই মেলেনি—

বললাম—এর পরই তো একদিন ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল সীতানাথ—

ভদ্রমহিলা বললেন—তা সেদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল বলে মাঝপথ থেকে মাধব দত্ত গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। আর খবর পেয়েই সীতানাথ বৌরাণীর ঘর ছেড়ে চটিজোড়া সেখানে ফেলে রেখে চলে এল, আর পরদিন কর্তা আসরে বসে হেসেই খুন—

মাধব দত্ত বললেন—জানো চাটুজ্জে, কাল শুতে গিয়ে কী দেখি জানো, দেখি আমার শোবার ঘরে সীতানাথের চটি-জোড়া !

চাটুজ্জে অবাক, নন্দকিশোরও অবাক, কিন্তু সীতানাথের মুখে কোনও উচ্চবাচ্য নেই।

—আচ্ছা সীতানাথ, বেড়ালে তোমার চটিজোড়া নিয়ে চলে গেল আর তুমি কিছু জানতেও পারলে না ? তোমার কী রকম ঘুম গো ? শেষকালে দেখছি কোনদিন তোমাকেও টেনে নিয়ে যাবে ঘর থেকে, তুমি বোধহয় নিজেও তা টের পাবে না—

কিন্তু মুশকিল হলো বৃন্দাবন হবার পর।

মাধব দত্তর ছেলে বৃন্দাবন। বৃন্দাবন দত্ত।

বৃন্দাবন হবার পর থেকেই মাধব দত্ত ছেলে বলতে অজ্ঞান। ছেলেকে নিয়েই আসরে বসে। ছেলের মুখে গড়গড়ার নল পুরে দেয়।

নীতার মা বললেন—ওইটেই ভুল হয়েছে আপনার—

বললাম—কেন, কীসের ভুল ?

নীতার মা বললেন—আপনি দেখিয়েছেন যে, ওই বৃন্দাবন সীতানাথবাবুর ছেলে—

বললাম—আমি তো তাই-ই কল্পনা করে নিয়েছিলাম। তাই তো যখন বৃন্দাবনকে মজা করে তামাক খাওয়াতো মাধব দত্ত, তখন আপত্তি করতো সীতানাথ।

সীতানাথ বলতো—ওর মুখে গড়গড়ার নল দেবেন না কর্তাবাবু, ছোটবেলায় তামাক খাওয়া ভালো নয়—

মাধব দত্ত বলতেন—দেখছো, কেমন চালাক-চতুর হয়েছে আমার বেটা, এই বয়সেই তামাক খেতে শিখেছে—

সীতানাথ আঁতকে উঠতো।

বলতো—শরীর খারাপ হবে বৃন্দাবনের, তামাক খাওয়া ভাল নয় কর্তা—

মাধব দত্ত রেগে যেতেন। বলতেন—তামাক খাওয়া ভালো নয়? তুমি কী যা-তা বলছ? তামাক তো আমিও খাই, আমি খারাপ হয়ে গিয়েছি? খবরদার বলছি আমার ছেলের ব্যাপারে তুমি আর আমাকে কিছু বলতে এসো না—

নীতার মা বললেন—এখানটাও ঠিক লিখেছেন, কিন্তু ওই বৃন্দাবন তো সীতানাথবাবুর ছেলে নয়।

সীতানাথবাবুর ছেলে নয়? তাহলে কি মাধব দত্তর ছেলে?

নীতার মা বললেন—না বাবা তাও নয়, তাও নয়, ওই বৃন্দাবন হলো বলরাম মুখুজ্জের ছেলে—

—বলরাম মুখুজ্জে? সীতানাথবাবুর বোনের?

—হ্যাঁ, তবে শুনুন সবটা।

বলে তিনি বাকিটা বলতে আরম্ভ করলেন।

মাধব দত্তর শেষ-জীবনটা সত্যিই বড় কষ্টের। সারাজীবন পৈত্রিক সম্পত্তি উড়িয়েছেন। সারাজীবন স্বাস্থ্যের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে গেছেন। রাতের পর রাত জেগেছেন। মোসায়েব-খোশামুদেরা সারাজীবন তাকে ঘিরে টাকা শুষে নিয়েছে। এ্যাটর্ণী-উকীলরাও যা পেরেছে যেমনভাবে পেরেছে টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে। সম্পত্তি বেনামীতে কিনে নিয়েছে।

তখন সব গেছে মাধব দত্তর।

গাড়ি গেছে, মোসাহেবরা গেছে, সম্পত্তিও গেছে। সেই হুসেন মিয়া রহিম বক্স গেছে। চাটুজ্জে চলে গেছে, নন্দকিশোরও চলে গেছে। নৈহাটি, খড়দ', মাহেশ যেখানে যতকিছু ছিল সবই শেষ হয়ে গেছে।

শুধু ছিল সীতানাথবাবু। সীতানাথ রায়।

সীতানাথ রায় তখনও কোনও রকমে টিঁকে ছিল আস্তাবল-বাড়ির ঘরখানার মধ্যে। টিম-টিম করে টিঁকে ছিল তখনও।

এমন কি যে অন্দর-মহলের বউরাণী, সেও চলে গেছে একদিন। তাকে নিয়ে গিয়ে শ্মশানে পুড়িয়ে এসেছে মাধব দত্ত। শ্মশানে গিয়ে খুবই কেঁদেছে। কেঁদে কেঁদে মাধব দত্ত চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে।

তখন একমাত্র ভরসা বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন! মাধবদত্ত'র একমাত্র ছেলে।

ভদ্রমহিলা বললেন—কিন্তু আসলে বৃন্দাবন মাধব দত্ত'র ছেলেই নয়—

বললাম—তার মানে?

ভদ্রমহিলা বলিলেন—মাধব দত্ত'র ছেলেই হয়নি মেয়ে হয়েছিল—

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—সে কী?

ভদ্রমহিলা বললেন—হ্যাঁ, তাহলে শেষের সবটা শুনতে হবে—বলে তিনি শেষটা নিজেই বলতে লাগলেন। অত বড় বাড়ি অত সম্পত্তি। সব যখন গেছে তখন একমাত্র ভরসা ছিল বৃন্দাবন।

কিন্তু বৃন্দাবনও তখন মাধব দত্তর মত গোল্লায় গেছে। বৃন্দাবন বড় হয়ে ঠিক মাধব দত্তর মত মোসাহেব রাখলে! ঠিক মাধব দত্তর মত মেয়ে মানুষ পুষতে লাগলো। নৈহাটি, খড়দ,' মাহেশ সব জায়গায় একটা করে সংসার পাতলে।

সীতানাথবাবুর বড় কষ্ট হতে লাগলো।

একদিন মদ খেয়ে বাড়ি ফিরতেই সীতানাথ ধমক দিলে খুব। সকলের সামনেই ধমক দিলে খুব।

বললে— এসব কী করছো বাবা, এসব করা কি ভালো? এসব ভালো নয়।

মাধব দত্তর কাছে খবরটা গেল।

একদিন ডেকে পাঠালো মাধব দত্ত।

সীতানাথ কাঁপতে কাঁপতে এসে হাজির।

সীতানাথ বললে—আমাকে ডেকেছেন দত্তমশাই?

মাধব দত্ত বললে—তুমি বৃন্দাবনকে কী বলেছ?

সীতানাথ বললে—আজকাল বৃন্দাবন বড় মদ খাচ্ছে, মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরছে, তাই বলেছি। ওর ভালোর জন্যই বলেছি—

ধমক দিয়ে উঠল মাধব দত্ত।

বললে—তুমি ওর ভালো-মন্দ দেখবার কে? আমি ওর বাপ, আমি বুঝবো ও ভালো করছে কি মন্দ করছে।

—আজ্ঞে, আপনার ছেলে হলেই বা, আমার ও তো বয়স হয়েছে, আমিও তো ভালো-মন্দ বুঝতে পারি। এই বয়সেই এত মদ খাওয়া কি ভালো।

—থামো!!

চিৎকার করে উঠলো মাধব দত্ত।

বললে—বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যাও—যাও বেরিয়ে এখনি—যাও—

আর সেইদিনই সীতানাথ দত্ত-বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

এতদিনকার আশ্রয় ছেড়ে কোথায় যাবে সীতানাথ? কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে? তখন অনেক বয়েস হয়ে গেছে তার। তখন আর সামর্থ্য নেই শরীরে।

তবু চলে যেতে হবে। মাধব দত্তর হুকুম। মাধব দত্তর বাড়ি। সে-বাড়িতে থাকবার তখন তার আর কোনও অধিকার নেই।

সেই সন্ধ্যোবেলা ফড়েপুকুর স্ট্রীটের মধ্যে এক-কাপড়ে সীতানাথ রায় আস্তে আস্তে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল এক নিমেষে।

তারপর?

ভদ্রমহিলা বললেন—তারপর আর কোথাও জায়গা না পেয়ে আমাদের বরানগরের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিলো সীতানাথ।

একদিন বাইরে থেকে ডাক এল—দিদি—ও দিদি—

মা দৌড়ে গেল বাইরে। দেখে ছোটভাই এসেছে—

—দাদা তুমি?

সীতানাথ বললে—হ্যাঁ রে আমি—

আমি কাছে ছিলুম। আমাকে দেখেই সীতানাথবাবু আদর করলে। কিন্তু স্বাস্থ্য তখন তার ভেঙে পড়েছে। একেবারে ভেঙে পড়েছে। আর ভালো করে তখন আর দাঁড়াবার ক্ষমতাও তার নেই। সেই যে শুয়ে পড়লো, আর তাঁর ওঠবার ক্ষমতা ছিল না।

আমার মনে আছে শুধু চুপ-চাপ শুয়ে থাকতো সারাদিন।

ওদিকে বৃন্দাবনের বিয়ের দিন। বৃন্দাবনের বিয়ের বন্দোবস্ত হয়েছে।

সীতানাথের তখন শেষ-অবস্থা একেবারে।

বললে—জানো দিদি, আজকে বৃন্দাবনের বিয়ে—

—তা হোক, তুমি এখন চুপ করে থাকো। ডাক্তার তোমাকে চুপ করে শুয়ে থাকতে বলেছে—

সীতানাথ বলতো—কিন্তু দিদি, বৃন্দাবন তো কিছুই জানতে পারবে না। আমি মরে গেলে সে তো কিছুই বুঝতে পারবে না—

—তা না বুঝুক, তুমি চুপ করে থাকো।

সীতানাথ তবু বলতো—জানো দিদি, মাধব দত্ত ওকে মদ খেতে বারণ করে না—অত মদ খাওয়া কি ভালো? আমি ওই কথা বলেছিলুম বলেই আমার ওপর অত রাগ—

দিদি বলতো—তুমি ও-সব নিয়ে আর ভেবো না অত—

—ভাববো না?

সীতানাথের চোখ দুটো ছল-ছল করে উঠতো।

—ভাববো না আমি? তুমি বলছো কী? বৃন্দাবন কি আমার পর?

দিদি ধমক দিয়ে উঠতো।

বলতো—আবার ওই সব কথা?

সীতামাথ বলতো—কিন্তু সত্যি বলো না দিদি, বৃন্দাবন কি আমার পর? আমি কেন বৃন্দাবনের এ সর্বনাশ করলুম?

শুয়ে শুয়ে কথা বলতো আর কাঁদতো সীতানাথ।

বলতো—আমারই পাপের জন্যেই ও এই রকম হলো, জানো দিদি। আমি নিজেও কষ্ট পেলুম, তোমাকেও কষ্ট দিলুম—

—আমার কষ্টের কথা থাক।

সীতানাথ বলতো—কিন্তু দিদি, আমি যে তোমার সর্বনাশ করেছি, তোমার যে কত বড় লোকসান করেছি। এ আমি কেন করতে গেলাম? আমার বোধহয় সম্পত্তির লোভ ছিল দিদি। সত্যি বলছি দিদি। সত্যি বলছি দিদি, আমার মনের ভেতরও বোধহয় সম্পত্তি পাবার লোভ ছিল—প্রতিশোধ নেবার লোভ ছিল—

বলতে বলতে উত্তেজনায় সীতানাথ অজ্ঞান হয়ে পড়তো।

আর তখন ডাক্তার ডাকতে হতো। ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে যেত।

কিন্তু ওদিকে মাধব দত্ত বাড়িতে তখন শেষ বারের মত আবার নহবৎ বেজে উঠেছে। নিভে যাবার আগে শেষকালের দপ্ করে জ্বলে ওঠার মত।

মাধব দত্তর একমাত্র সন্তান বৃন্দাবনের বিয়ে।

আদালত তখনও আছে। মুখের কাছে গড়গড়াটা এগিয়ে ধরে। কিন্তু মাধব দত্তর আগেকার তেজ তখন আর নেই। কাজের খুঁত হলে আর তেমন রেগে ওঠে না আগের মত। চারপাশে কেউ থাকে না। ফাঁকা নাচ দরবার। তবু সেই ভোল আছে। সেই সন্ধ্যেবেলা নাচ দরবারে একবারের মত এসে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসাও আছে।

মাথায় টাক পড়ে গেছে। মুখের চামড়া ঝুলে কুঁচকে গেছে।

সেই বাবরি চুল সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। হাত কাঁপে, একটু অসাবধান হলেই গড়গড়ার নলটা হাত থেকে পড়ে যায়।

একদিন তো পায়ের ঠেলা লেগে গড়গড়াটাই উল্টে গিয়েছিল। কলকের আগুনে পুড়ে গিয়েছিল ফরাস। সেদিন যে মাধব দত্ত নিজেই পুড়ে যায়নি তাও তার ভাগ্য বলতে হবে!

তা মাধব দত্ত নিজে পুড়ে গেলেই হয়ত ভালো হতো। কিন্তু কপালে কষ্ট থাকলে কে খণ্ডাবে।

সেই অভাবনীয় কাণ্ডটাই ঘটলো।

ভুবন স্যাক্‌রা এসে হাজির হলো নাচ-দরবারে।

এসে যথারীতি প্রণাম করে বসলো।

মাধব দত্ত জিজ্ঞেস করলে—হলো সব গয়না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্তামশাই। সব তৈরি করে এনেছি—

—দেখি?

ভুবন স্যাক্‌রা একে-একে সব গয়না বার করে দেখাতে লাগলো।

দত্তবংশের একমাত্র কুলতিলকের বিয়ে। গয়না বড় কম নয়। হার, তাগা, বালা, চুড়, রুলি, কানপাশা, মাক্‌ড়ি, কত রকমের সব গয়না—গয়নার কি শেষ আছে? দত্ত-বাড়ির ছেলের বউ দেখে যেন কেউ না বলে যে মাধব দত্ত কনেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে ঘরে তোলেনি।

—আর সেই গিন্নিমার কুড়ি ভরির নেকলেস্‌টা দিয়েছিলেন, সেটার লকেটের ভেতরে এই কার একটা ফোটো ছিল, এইটে দিতে এলুম—এই নিন্—

মাধব দত্তর মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা খসে পড়লো।

—গিন্নীমার নেকলেসের লকেটের ভেতর থেকে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি সেই নেকলেসটা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন ওটা ভেঙে বৌমার নতুন ডিজাইনের নেকলেস করে দিতে হবে—

—লকেটের ভেতরে ছবি ছিল কার?

—এই দেখুন না। কার ফোটো বুঝতে পারছি না।

বলে লেকেটটা এগিয়ে দিলে, ফোটোটাও দেখাল।

মাধব দত্ত সোজা হয়ে বসে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলো। এ-যে সীতানাথের ফোটোগ্রাফ। বউরাণী নেকলেসের লেকেটের ভেতরে সীতানাথের ছবি কেমন করে এল? কে দিয়েছে?

সঙ্গে সঙ্গে যেন বাজ পড়লো মাথার ওপর।

কিম্বা হয়তো বাজ পড়লেও অত চম্‌কে উঠতো না কেউ।

মাধব দত্ত চিৎকার করে উঠলো—সীতানাথকে ডাকো—

আদালত আলি মুখ কাঁচু-মাচু করে বললে—আজ্ঞে, সীতনাথবাবু তো নেই—

মাধব দত্ত বললে—নেই তো যেখানে আছে সেখান থেকে ডেকে নিয়ে এসো—

কিন্তু তখন আর সীতানাথকে কে খুঁজে পাবে? কোথায় আছে সীতানাথ কে জানতে পারবে?

কিন্তু খোঁজ্, খোঁজ্ তাকে। খুঁজে বার কর্। যেখান থেকে হোক্, যেমন করে হোক্, জীবিত বা মৃত সীতানাথকে খুঁজে বার করা চাই-ই চাই। কর্তামশাই-এর হুকুম।

মাধব দত্ত তখন পাগলের মত সারা বাড়িময় ঘুরছে।

পাগলের মত বউরাণীর ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করে বেড়াচ্ছে। হুকুম দিলে—নহবৎ থামতে বল্—

বাড়ির মাথায় নহবতীরা বাজাতে আরম্ভ করে ছিল বেহাগ। নিখাদে পৌঁছেই সুর হঠাৎ থেমে গেল।

বৃন্দাবন দত্ত, তারই বিয়ে, সে বাবার কাণ্ড দেখে অবাক।

বাবার সামনে যেতেও সাহস পায় না।

তবু জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? কী হলো বাবা?

—হলো তোমার মাথা, আর মুণ্ডু—

যাঁরা আত্মীয়স্বজন বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষে এসেছিল, তারাও

হকচকিয়ে গেছে। এসব কি কাণ্ড। ভয়ে ভয়ে কেউ আর মাধব দত্তর মুখের সামনে আসতে সাহস পেলে না।

মাধব দত্ত চিৎকার করে বললে—আদালত, আমার বন্দুকটা দে—বৃন্দাবন কি বলতে গিয়েছিল, মাধব দত্ত তাকে ধমক দিয়ে বললে—আমার কথার ওপর কথা? দে আদালত, বন্দুকটা দে—

তারপর সেই বন্দুক নিয়ে মাধব দত্ত পাগলের মত ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। সবাই অস্থির। কাকে গুলি করে মারবে কে জানে?

হঠাৎ বনমালী এসে হাজির হলো হাঁপাতে হাঁপাতে।

বললে—হুজুর, সীতানাথবাবুকে পাওয়া গেছে—

—ডেকে আন্ শয়তানকে, আমার কাছে ডেকে নিয়ে আয়—

বনমালী বললে—আজ্ঞে তিনি এখন মরো-মরো হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন উঠতে পারছেন না—

—কোথায়? কোন চুলোয় শুয়ে আছে?

—আজ্ঞে বরানগরে। তাঁর ভগ্নিপতির বাড়ি। ভগ্নিপতি বলরাম মুখুজ্জের বাড়ি—

—তা চল্ সেখানে। আমি যাবো।

গাড়ি এল। মাধব দত্ত তাতে উঠে বসলো। ছাদের ওপর আদালত আলিও বসলো। বনমালীও বসলো পাশে।

মাধব দত্ত হুকুম দিলে—চালাও—গাড়ি চালাও—জোরসে-চালাও।

সেঃ নীহার মা বললেন—তারপর তো আপনি সবই লিখে গেছেন—
এলুম

ওদিকে সীতানাথবাবুর তখন শ্বাস-কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তার এসে বসে আছে, আর জ্ঞান নেই তখন। অঘোর-অচৈতন্য অবস্থা। দিদি ভগ্নি-পতি বসে আছে। আমিও বসে আছি—

হঠাৎ মাধব দত্ত এসে হাজির হলো।

বললাম—ও-ও তো আমি লিখেছি—

নীতার মা বললেন—আপনি লিখেছেন মাধব দত্ত বন্দুক তাগ্‌ করে গুলি করে মারলো সীতানাথবাবুকে। কিন্তু সীতানাথবাবু তার আগেই মারা গেছে। কিন্তু পরেরটা লিখলেন না কেন? তারপরেই তো আসল ঘটনা ঘটলো।

সেই আসল ঘটনাটাই বললেন নীতার মা।

বললেন—অনেক বছর ধরে এই খুনের মামলা চললো। মামলা চললো মাধব দত্ত আর বলরাম মুখুজ্জের মধ্যে। এককালে বনেদী বংশ ফড়েপুকুরের দত্ত বংশ। প্রথমে নীচের কোর্ট, তারপর হাইকোর্ট, তারপর সুপ্রীম কোর্ট।

মোটকথা আমি অত সব কোর্টের ব্যাপার বুঝতুম না। কিন্তু জলের মত পয়সা খরচ হতো তা মনে আছে।

শেষকালে একদিন আদালতের রায় বেরোল। রায় বেরোতে আমি মাধব দত্তর এই বাড়ী পেয়ে গেলাম। ততদিনে মাধব দত্ত মারা গেছে। মাধব দত্তর ছেলে বৃন্দাবন দত্তও মারা গেছে। মাধব দত্তের বংশের তখন আর কেউ জীবিত নেই। বৃন্দাবন দত্ত একদিন আত্মহত্যা করে সব যন্ত্রণা জুড়োল।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সব শুনে।

বললাম—আপনি এ-সম্পত্তি পেলেন কেন?

নীতার মা বললেন—আদালতের রায়ে প্রমাণ হলো বৃন্দাবন দত্ত আসলে মাধব দত্তর নিজের ছেলে নয়। মাধব দত্তর স্ত্রীর মেয়ে হয়েছিল। আর সীতানাথবাবুর দিদিরও একটা ছেলে হয়েছিল। সীতানাথবাবু সেই ছেলেকে বদলি করে মাধব দত্তের আঁতুড় ঘরে রেখে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিল দিদির কাছে।

—কেন?

—তখনকার দিনে মেয়েরা তো বাপের সম্পত্তি পেতো না তাই।

জিজ্ঞেস করলাম—আর সেই মেয়ে?

নীতার মা বললেন—আমি সেই মেয়ে বাবা! আমার কপালে অনেক দুঃখ ছিল, তাই এতদিন পরে এখনও বেঁচে আছি। আপনার গল্পটা পড়ে তাই নীতাকে বলেছিলাম আপনাকে ডাকতে। আগাগোড়াই যদি ঠিক লিখলেন, শেষটায় আর কেন ভুল থাকে—তাই···

হঠাৎ বাইরে কড়া নেড়ে উঠলো।

ভদ্রমহিলা বললেন—ওই বোধহয় নীতা এল—

তারপর ডাকলেন—ওরে ভূতো, দরজা খুলে দে দিদিমণি এসেছে—

দ্বিতীয়া

শংকরলাল!

শংকর লালের কথা আমার শোনা ছিল। সেবার বোম্বাইতে গিয়ে সেই শংকরলালের সঙ্গে দেখা হলো।

ভেবেছিলাম শংকরলালকে নিয়ে উপন্যাস লিখবো। শংকর-লালের ঘটনাটা নিয়ে তার সঙ্গে কিছু নতুন মাল-মশলা মিশিয়ে দিলে চলনসই একটা ছোটখাটো উপন্যাস হতে পারে।

অনেক দিন থেকে অনেক মাল-মশলাই তো কৃপণের মত সঞ্চয় করে আসছি। সঞ্চয়ের বোঝায় ভারি হয়ে উঠেছে জীবন। তার সঙ্গে জঞ্জালও যে কত জমেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। অথচ ভালো করেই জানি—একদিন এই সবকিছু সঞ্চয়ই এখানে ফেলে রেখে নিঃস্ব হয়ে দূরের উদ্দেশে পাড়ি দিতে হবে। তখন কোথায় থাকবে এই মমতা, এই মোহ। কাজের মধ্যেই ঐকদিন হঠাৎ ডাক আসবে, আর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে নিষ্কাম হতে হবে। সেদিন কোনও পেছু টান সে সহ্য করবে না, কোনও পেছনের আকর্ষণ তাকে কর্তব্য-ভ্রষ্ট করতে দেবে না।

তবু মাঝে মাঝে সঞ্চয়গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করি। তার যত্ন করি, তার গায়ের ধূলো ঝেড়ে দিই ; তাকে সাজাই-গোছাই, আদর করি আর আগেকার মত কাচের আলমারির ভেতরে তুলে রেখে দিই।

শংকরলাল আমার জীবনের এমনই একটি সঞ্চয়।

এতদিন পরে সেই সঞ্চয়ের গায়ে হাত পড়লো হঠাৎ।

তখন গুরু দত্ত বেঁচে। গুরু দত্ত সিনেমা জগতের লোক। নিজে অভিনয় করতো, নিজে ছবি তুলতো, আবার পরিচালনাও করতো।

তা ছাড়া ভারতবর্ষের লোকের কাছে গুরু দত্তর নামটা অত্যন্ত চেনা।

আর আমি?

আমি নিতান্তই অভাজন। গল্প লিখে খাই। কেউ পড়ে, কেউ পড়ে না; কেউ প্রশংসা করে, কেউ করে না। প্রশংসার চেয়ে নিন্দেটাই কপালে জোটে বেশি। তবু ঘটনাচক্রে তখন দুজনের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

গুরুদত্তই একদিন শংকরলালের কাছে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে সঙ্গে করে।

গুরু দত্ত তখন যে ছবিটা করছিল, তার মিউজিক ডাইরেক্টর ছিল শংকরলাল।

মিউজিক ডাইরেক্টর যে কি বস্তু তা তখন আমার জানা ছিল না। শুধু এইটুকু জানা ছিল যে, ছবিতে যে গান-বাজনা থাকে—সেগুলো তৈরি করে মিউজিক ডাইরেক্টর।

কিন্তু শংকরলালের অফিসে গিয়ে দেখলাম সে একেবারে অন্য জিনিস। আমার কল্পনাতেও তা লেখা সম্ভব নয়।

বিরাট একটা বাড়ি। তার খোপে খোপে অফিস। একটা বড় খোপ নিয়ে শংকরলাল তার মিউজিকের অফিস বানিয়েছে। সামনে একটা বসবার চেম্বার। সেখানে ভিজিটার্সদের জন্য খান কয়েক চেয়ার আছে। তার পেছনে শংকরলালের নিজের আসল চেম্বার।

সে অফিসটার বর্ণনা করা দরকার।

একটা বড় ঘর। ঘরের ভিতরে বিরাট একটা খাট। তার উপর ডানলোপিলোর গদি। গদির উপর মখমলে মোড়া ডানলোপিলোর তাকিয়া। আর তার ওপর একটা দামি হারমোনিয়াম রাখা। শংকরলাল ট্রাউজার-শার্ট পরে তখন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিল। কয়েকটা খালি চায়ের কাপ এদিক-ওদিক ছড়ানো। বিছানার ওপর টেলিফোন।

যখন আমরা ঘরের ভেতর ঢুকলাম তখন শংকরলাল দরজার দিকে পিছন করে টেলিফোনে কথা বলছিল। গুরু দত্তকে দেখেই তাড়াতাড়ি টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে বললে—আইয়ে আইয়ে গুরুজী—

গুরু দত্তকে অনেকেই গুরুজী বলে ডেকে খাতির করতো।

আমি তখন অবাক হয়ে দেখছি শংকরলালকে। এই তো সেই। কলকাতার প্রভাংশু দত্ত তো এই শংকরলালের কথাই বলেছিল?

কলকাতা থেকে আসবার সময় প্রভাংশু দত্ত বলেছিল—এই তো বোম্বাই যাচ্ছেন, দেখে আসবেন শংকলালকে।

প্রভাংশু দত্তর মুখে শংকরলালের সমস্ত জীবনের ঘটনাটা শুনেছিলাম। প্রভাংশু দত্তর বাড়িতে শংকরলালের ফোটোগ্রাফও দেখেছিলাম। তখনই দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল শংকরলালকে। ফরসা, টক্‌টক করছে গায়ের রং। ভারি হাসিখুশি মুখ, চঞ্চল স্বভাব।

গুরু দত্ত আলাপ করিয়ে দিলে—এই আমার বন্ধু বিমল মিত্র—এরই লেখা বই আমি ছবি করছি—

শংকরলাল আমার দিকে চাইলে। হাতটা বাড়িয়ে দিলে। আমিও হাত বাড়িয়ে তার হাতে হাত ঠেকালাম।

বললাম—আপনার গানের আমি ভক্ত—

শংকরলাল হাসলো। ভারি মিষ্টি সে হাসি। বুঝলাম এই হাসি দেখেই হয়ত ভুলেছিল উষা মৈত্র।

কিন্তু শংকরলাল জানতেও পারলে না আমি আর তখন তাকে দেখছি না—ভাবছি উষা মৈত্রের কথা।

বেচারা মৈত্রমশাইয়ের অমন সাধের মেয়ে। কত সাধ ছিল তার। কত আশা ছিল তার! কত ইচ্ছে ছিল যে দিল্লীর কোন গেজেটেড অফিসারের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন। তা নয়, শংকরলাল বোম্বাইয়ে মিউজিক ডাইরেক্টর শংকরলাল।

আর তখন তো শংকরলালের নামও কেউ জানতো না। দিল্লীর

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর অফিসে একজন সামান্য আর্টিস্ট। মাস-মাইনেয় সেতার বাজায় অন্য ভোক্যাল আর্টিস্টের গানের সঙ্গে।

আশ্চর্য মানুষের মন।

আর আরো আশ্চর্য মেয়েমানুষের মন।

গুরু তার নিজের কাজ নিয়ে কথা বলছে তখন।

গুরু বললে—আমার থিম্ সংটা কদ্দূর হলো?

শংকরলাল বললে—হয়ে গেছে, শুনিয়ে—

বলে গান গাইতে শুরু করলে।

হিন্দী গান, হিন্দী সুর, হিন্দী সিনেমার সুরের সঙ্গে আমি ঠিক অভ্যস্ত নই। তবু গান শুনতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে হঠাৎ টেলিফোন এলো। শংকরলাল তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। অন্য কার কীসের ছবি। সেই ছবিরও মিউজিক ডাইরেক্টর শংকরলাল।

একটা টেলিফোন শেষ হলো তো আর একটা।

এদিকে চা এল। গুরু একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে যখন কথা শেষ করলো তখন তিন ঘণ্টা কেটে গেছে।

কিন্তু এই তিন ঘণ্টার মধ্যে আমি যা কিছু দেখবার সব দেখে নিয়েছি। দেখলাম শংকরলাল সাকসেসফুল লোক। দেখলাম শংকরলালের চাহিদা আছে বোম্বাইএর সিনেমা জগতে। দেখলাম শংকরলাল গুণী লোক। অর্থাৎ প্রভাংশু দত্ত আমাকে যা-যা বলেছিল সব মিলে গেল।

প্রভাংশু দত্ত আমাকে বলেছিল—ষাট টাকা মাইনে পেত তখন। রোগা ঢ্যাঙা চেহারা। অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে আর্টিস্টদের গানের সঙ্গে মিউজিক বাজাতো। চোখ দুটো ছিল টানা টানা—

দেখলাম সত্যিই চোখ দুটো টানা টানা—

আসবার সময় গুরু বললে—খুব নাম করেছে শংকরলাল এখন, এখন বোম্বাই-এর নাম করা মিউজিক ডাইরেক্টদের মধ্যে একজন—

তা তো আমি জানিই। নইলে কি আর গুরু তার অফিসে যায়?

কিন্তু আমি এখন অন্য কথা ভাবছি। ভাবছি এই তো সেদিন।

কত বছরই বা আগের কথা। হয়ত পনেরো বছর। তার আগে নয়। শংকরলাল তখন ছোট।

প্রভাংশু দত্তও তখন এত বুড়ো হয়ে যায়নি। মাঝ বয়েস। পেটের দায়ে দিল্লীর অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওতে গিয়েছে চাকরী করতে। যে বাড়িতে থাকত প্রভাংশু দত্ত—সেটা ফ্ল্যাট বাড়ি। ডিউটির পর সন্ধ্যেবেলা বারান্দায় লুঙ্গি পরে হাওয়া খেত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

অবশ্য সেই দিল্লীও এখন আর তেমন নেই। মৈত্র মশাই-এরও আর তেমনি রাশভারি মেজাজ নেই। মৈত্র মশাই-এর সেই বাড়িও হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। আসলে মৈত্র মশাই-এরই অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে।

কিন্তু দিল্লীতে কে আর অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামায়? মধ্যবিত্ত মানুষ যারা দিন আনে দিন খায়, কিম্বা মাস মাইনের চাকরী করে তারা চাকরী নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সেক্রেটারিয়েট পাড়ার কথা আলাদা। সেখানে তো মাইনে দিয়েই মানুষের মনুষ্যত্বের বিচার হয়। কিন্তু অন্য পাড়ায় তুমি কী খাচ্ছো, আমি তোমার রান্নাঘরে ঢুকে তা দেখতে যাচ্ছি না! তুমি থাকো তোমার বাড়িতে, আর আমি থাকবো আমার ঘরের চারটে দেয়ালের মধ্যে!

কিন্তু গরজ বড় বালাই।

আর কার গরজ যে কখন বালাই হয়ে ওঠে, তা কেউই বলতে পারে না।

এমনি গরজের দায়েই একদিন বোধহয় একটা মেয়ে এসে প্রভাংশু দত্তকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, আপনারা কি বাঙালী?

প্রভাংশু দত্ত একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল। সাধারণত দিল্লীর সমাজে কেউ কাউকে ডেকে কথা বলে না। বিশেষ করে আবার মেয়ে।

মেয়ে মানে আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে। মেয়েটার পরণে সালোয়ার পাঞ্জাবী। বেশ গোলগাল গড়ন। কিন্তু আল্‌গা বাঁধন আছে। ঠোঁটে লিপষ্টিক লাগানো। পাঞ্জাবী মেয়েদের ষ্টাইলে কথা বলে, সাজে। তাদের মতন চুলের মোটা বেণীটাও পিঠের দিকে লম্বা করে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

প্রভাংশ দত্ত বললে—তোমরা?

—আমরাও বাঙালী! আপনি বুঝি রেডিওতে চাকরি করেন?

প্রভাংশু দত্ত বললে—হ্যাঁ, কেন?

মেয়েটি বললে—আমাকে একবার রেডিওতে গান গাইবার চান্স করে দিতে পারেন?

প্রভাংশু দত্ত একটু অবাক হয়ে গেল। এতদিন রেডিওতে চাকরি করছে প্রভাংশু দত্ত, বহু লোক রেডিওতে চান্স চেয়েছে। ছেলে কিম্বা মেয়ে, বহু। কিন্তু কোনও অচেনা মেয়ে কখনও সামনা-সামনি প্রথম আলাপে এমন করে যেচে এ-প্রস্তাব করেনি।

প্রভাংশু দত্ত বললে—তোমার নাম কী?

মেয়েটি বললে—উষা মৈত্র। আমাকে আপনি অনেকবার দেখেছেন।

—তোমাকে দেখেছি? কোথায়? কোথায় থাকো তোমরা?

মেয়েটি বললে—ওই তো, সামনের বাড়িটাই আমাদের—

সামনের বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে প্রভাংশু দত্ত। আগেও কতদিন ও-বাড়িটা দেখেছে। দেখে তো বড়লোকের বাড়ি বলেই মনে হয়েছে।

প্রভাংশু দত্ত জিজ্ঞেস করলে—বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?

—আমার বাবা, মা আর আমি।

—তোমার বাবার নাম কী ?

—শ্রীঅম্বিকা ভূষণ মৈত্র।

আশ্চর্য হবার মতই ব্যাপার বটে। এতদিন প্রভাংশু দত্ত দিল্লীতে আছে কিন্তু বাড়ীর সামনেই যে একজন বাঙালী ভদ্রলোক থাকেন তা জানা ছিল না।

মেয়েটি হটাৎ বলেন—আপনি বাড়ীতে লুঙ্গি পরে থাকেন, তাই ভেবেছিলাম হয়ত আপনি মুসলমান।

—কেন, মুসলমান হলে কথা বলতে না ?

মেয়েটি বললে—না, তা নয়, আমার বাবা বুড়ো মানুষ তো, আমি কলেজে যাই, এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করি, বাবা খুব সাবধানে থাকতে বলেন। বাবার খুব ভয় করে—

বললাম—আচ্ছা, ঠিক আছে, এ সম্বন্ধে আমি তোমার বাবার সঙ্গেই কথা বলবো—

—আপনি যেন বাবাকে এ-সব কথা বলবেন না।

—কী কথা ?

উষা মৈত্র বললে—এই যে-যে কথা আপনাকে বললাম। বাবা সত্যিই মুসলমান-টান পছন্দ করেন না, সেকেলে মানুষ কি না। আমার বাবা আমাকে কারোর সঙ্গেই মিশতে দিতে চান না। কিন্তু আমি কলেজে পড়ি তো, তাই কার সঙ্গে মেলা-মেশা করছি উনি তা দেখতে পান না—

প্রভাংশু দত্তর কেমন যেন সন্দেহ হলো। বাবার কাছে লুকিয়ে বাইরের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশাটা প্রভাংশু দত্তরও পছন্দ নয়।

প্রভাংশু দত্ত জিজ্ঞেস করলে—তুমি যে গান-বাজনার চর্চা করো তা তোমার বাবা-মা জানেন তো ?

—তা জানেন। বাবা-মা তো গান-বাজনার ভক্ত।

—তোমাকে শেখায় কে ?

শেখায় একজন। তার তেমন নাম-টাম নেই। কারো সঙ্গে জানাশোনাও নেই তার।

প্রভাংশু দত্ত বললে—বরং সেই ভদ্রলোককেই আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।

উষা মৈত্র যেন এতক্ষণে খুশী হলো। বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করাটা যেন তার মনঃপূত নয়।

—তাহলে কবে তাকে পাঠাবো আপনার কাছে?

—কাল সকালে পাঠিয়ে দিও, অফিস যাবার আগে।

উষা মৈত্র একটু ভেবে নিয়ে বললে—তারও তো আবার অফিস আছে কি না। সেও অফিসে চাকরি করে—

—কোন্ অফিসে?

—সেক্রেটারিয়েটে। সন্ধ্যেবেলা হলে তার সুবিধে হয়। অফিস থেকে ফেরবার পর।

প্রভাংশু দত্ত বললে—তাই-ই ভালো। আমি অফিস থেকে ফিরি সাড়ে সাতটার পর। তার পরেই আসতে বলে দিও—

প্রভাংশু দত্তর তখন সংসার হয়নি। সুতরাং বাড়িতে একলাই কাটে সারাক্ষণ। অফিস থেকে ফিরে সোজা বাড়িতেই আসে। সুতরাং রাত্রে কেউ বাড়িতে এলে অসুবিধে নেই। আর রেডিও অফিস মানে তো আর সাধারণ অফিসের মত নয়। লেখাপড়ার চেয়ে গান-বাজনা-হাসি-গল্প-অভিনয়ই সেখানে বেশি হয়। এ-ঘর থেকে ও ঘরে গেলেই নানা মজার খোরাক মেলে। আর শুধু শুকনো পুরুষের চেহারা দেখেও কাটাতে হবে না। প্রজাপতির মত সেজেগুজে মেয়েরাও বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যার রূপ আছে সেও সাজে, আবার যার রূপ নেই সে আবার বেশি সাজে। সুতরাং অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়তি আড্ডার দরকার হয় না।

তা সেদিন একটা ছেলে এসে হাজির হলো।

—কে?

দরজা খুলে প্রভাংশু দত্ত চিনতে পারলেন না।

—কোথা থেকে আসছেন আপনি? কাকে চাই?

ছেলেটি বললে—প্রভাংশু দত্ত আছেন?

—হ্যাঁ আমিই।

ছেলেটি লাজুক খুব। কথা বলতে যেন তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। বয়েস বেশি নয়। খুব জোর পঁচিশ কি ছাব্বিশ। রোগা রোগা।

—ও, উষা মৈত্রকে আপনিই গান শেখান?

ছেলেটা যেন আরও লজ্জায় পড়লো। বললো—গান ঠিক নয়, সেতারটাই ভালো করে শেখাই।

আমার তক্তপোষের উপর ছেলেটিকে বসতে বললাম। ছেলেটি জুতো জোড়ার ফিতে খুলে বাইরে রেখে খালি পায়ে ঢুকলো ভেতরে। তারপর তক্তপোষের উপরে পা ঝুলিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসলো।

জিজ্ঞাস করলাম—আপনার নাম কী?

ছেলেটি বললে—আমাকে আপনি বলে কথা বলবেন না, আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মত—

বললাম—ঠিক আছে, তোমার নামটি কী?

—সুনির্মল রায়।

—বাঙালী?

—হ্যাঁ।

—দিল্লীতে কী ভাবে এসে পড়লে?

সুনির্মল বললে—আমার বাবা এখানে চাকরী করতেন। তিনি অফিসারকে বলে আমাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

বললাম—তুমি গান-বাজনা শিখলে কী করে?

সুনির্মল বললে—শুনে শুনে।

—তা উষা মৈত্রের সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কী করে?

সুনির্মল বললে—আমার বাবার সঙ্গে মৈত্র মশাই-এর জানা-

শোনা ছিল। আমার বাবা মারা যাবার পর মৈত্র মশাই আমাকে ডেকে উষাকে গান শেখাতে বলেন।

—কত মাইনে দেন?

মাইনের কথা শুনে সুনির্মল যেন লজ্জায় পড়লো। যেন গান শিখিয়ে মাইনে নেওয়াটা অপরাধ।

বললে—মাইনে কি সকলের কাছে নেওয়া যায়?

বললাম—বাঃ, তুমি গান-বাজনা শেখাবে, আর মাইনে নেবে না?

সুনির্মল বললে—আর যেখানেই নিই, উষার কাছ থেকে মাইনে নিতে পারি না—

—কেন!

—বাবার যে বন্ধু?

তা ভাল কথা। সুনির্মল সে প্রসঙ্গে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে করলে। মনে হলো মাইনের কথা ওঠাতে ওর ভালো লাগে নি।

বললে—ওকথা বরং থাক—

বললাম—কেন, অত লজ্জা কেন তোমার? ওদের বাড়িতে আসবার জন্য তোমার বাস ভাড়াও তো পড়ে—

সুনির্মল বললে—হ্যাঁ, তা তো পড়েই—আসা-যাওয়ায় প্রায় একটাকার কাছাকাছি—

—তাহলে?

সুনির্মল বললে—আপনি ও-কথা আর তুলবেন না! আপনি অন্য কথা বলুন—

বুঝলাম ও-প্রসঙ্গ কিছুতেই সুনির্মল তুলতে দেবে না।

তারপর বললে—ওর গলাটা খুব ভালো, আমি যতটা সম্ভব ওকে ভাল করে গান শিখিয়েছি। কিন্তু ভাল গান গাইলেই তো হয় না। কারো সঙ্গে জানাশোনা না থাকলে রেডিওতে চান্স পাওয়া শক্ত।

—আর কোথাও চেষ্টা করছে?

সুনির্মল বললে—করেছি। একদিন আপনাদের রেডিও অফিসে গিয়েছিলাম।

—কী বলেছে ওরা ?

—ওরা বলেছিল অডিশান্ দিতে।

—তারপর ? অডিশান্ হয়ে গিয়েছে ?

সুনির্মল বললে—হ্যাঁ, কিন্তু হয়নি—

—হয়নি মানে ?

সুনির্মল বললে—একদিন জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম উষার গান কেমন লাগলো। ওরা বলেছে আর কিছুদিন তালিম দিতে।

বুঝলাম সমস্ত ব্যাপারটা।

সুনির্মল বললে—অথচ দেখুন, যারা রেডিওতে চান্স পায়, তাদের থেকে অনেক ভাল গান গায় উষা। একটা মালকোষ রাগের ঠুংরি তুলিয়ে দিয়েছিলাম ওর গলায়। আমি খুব খেটেছি ওই গান তোলাতে। শুধু কারো সঙ্গে জানাশোনা নেই বলেই হয়নি।

সুনির্মল যতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলেছে ততক্ষণ লক্ষ্য করেছি আমার সঙ্গে কথা বলতে সে যেন লজ্জায় মারা যাচ্ছে। নেহাৎ উষা মৈত্রের কথা না বললে নয় তাই বলা। উষার যাতে ভাল হয়, যাতে নাম হয়, উষার গানের যাতে আদর হয়, তাই-ই তার একমাত্র চিন্তা।

সুনির্মল বললে—আমি তো ষ্টেশন ডাইরেক্টারের কাছে যাইনি, যে বলেছে উষার গান রেডিওতে করিয়ে দিতে পারে তাকেই ধরেছি গিয়ে।

—কাকে কাকে ধরেছো ?

সুনির্মল বললে—সকলের নাম তো জানি না। আর তা ছাড়া কাউকেই তো আমি চিনি না। শেষকালে বুঝতে পারলাম জানাশোনা না থাকলে কিছু হয় না ওখানে—

তারপর আমার দিকে হতাশ হয়ে চেয়ে রইল।

বললে—এবার আপনি যদি করে দিতে পারেন—

বললাম—তুমি যাও, আমি চেষ্টা করব করতে—

—তার আগে একদিন উষার গান শোনবার সময় আপনার হবে না?

—বেশ শুনবো।

—কবে শুনবেন, বলুন। আমি তাহলে সেদিন থাকবো। মৈত্র মশাইকেও বলে রাখবো, উষাকেও বলে রাখবো, ও-ও তৈরী হয়ে থাকবে।

সুনির্মল আস্তে আস্তে উঠলো। তারপর বাইরে বারান্দায় গিয়ে জুতো পায়ে দিলে, জুতোর ফিতে বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বললে—তাহলে আমি আসি। আপনাকে আমি নিজে এসে তাহলে নিয়ে যাবো—

বললাম—তোমাকে এসে নিয়ে যেতে হবে কেন। সামনেই তো বাড়ি, আমি চিনে যেতে পারবো—

—না, তবু আমি আসবো। শনিবার, ভুলে যাবেন না যেন! বলে সুনির্মল নমস্কার করে চলে গেল।

প্রভাংশু দত্ত বললে—যেটুকু দেখলাম তাতে মনে হলো সুনির্মল ছেলেটা ভাল। সচ্চরিত্র ছেলে-মেয়ে পাওয়াই তো আজকাল শক্ত। তারপর দিল্লীর এই সমাজ।

শনিবার অফিস থেকে সকাল সকাল ফিরে এসেই দেখি সুনির্মল বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম—তুমি এত সকাল সকাল এসেছো যে? এখন কটা বেজেছে?

সুনির্মল বললে—অফিস থেকে বেরিয়েই একটা বাস পেয়ে গেলাম কি না তাই আর দেরি হয়নি। আমি বেশিক্ষণ আসিনি, এই মিনিট পনেরো হবে বড় জোর—

বললাম—এসো, আমার ঘরে একটু বসো, আমি জামা-কাপড় বদলে তৈরী হয়ে নিই—

সুনির্মল আমার বাইরের ঘরে বসে রইল। আমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে এলাম। আমাকে দেখে সুনির্মল বললে—এদিকে আবার একটা মুসকিল হয়েছে, কাল থেকে আবার উষার শরীরটা খারাপ—

—কেন কী হলো? জ্বর নাকি?

—না জ্বর-টর নেই, বোধহয় দই খেয়েছিল।

—দই? দই খেলে কি হয়েছে? দই খায় না? দই বুঝি সহ্য হয় না?

সুনির্মল বললে—না, দই—দই খাবে না কেন? দই তো ভালো জিনিষ। আমি বলে রেখেছিলাম গলাটার যত্ন নিতে, সকালে রাত্রে নুন জল দিয়ে গার্গেল করতে বলেছিলাম, সেটা করেছে। কিন্তু কোথা থেকে দই খেয়ে ফেললে, কে যে দই খাবার মতলব দিলে কে জানে! আমি অত করে বলা সত্বেও কথাটা শুনলে না, কলেজে গিয়েছিল, যেমন রোজ যায়, সেখানে কোন পাঞ্জাবী বন্ধুর পাল্লায় পড়ে দহি-বড়া খেয়েছে—

বললাম—তা দহি-বড়া তো খারাপ জিনিষ নয়। দহি-বড়া তো আমিও খাই—

সুনির্মল বললে—দুদিন পরে খেলে কী হতো? দহি-বড়া খেলে খেলে, কিন্তু ঠিক কালকেই না খেলে চলতো না?

বললাম—তাতে কী হয়েছে, গলাটা ধরে গেছে বুঝি?

সুনির্মল বললে—হ্যাঁ, আপনি আজকে গান শুনবেন কথা আছে, আর আজকেই গলাটা ধরিয়ে ফেললে—

বললাম—তাতে কিছু ক্ষতি হবে না, আজকে তো আর ওর অডিশান নয়, আজকে গলা খারাপ হলে ক্ষতি কী?

আমার কথাতে কিন্তু সুনির্মল সান্ত্বনা পেলে না। তবু যেন তার মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগলো।

মৈত্রমশাই লোকটি ভালো। দেখলাম মোটাসোটা মানুষটি। সেকালের মানুষ। এককালে পূর্বপুরুষ দিল্লীতে বড় চাকরি করে সম্পত্তি করে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি এখন তারই সদ্‌ব্যবহার করছেন।

বললেন—আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুশী হলাম—আমি তো একলাই থাকি, মাঝে মাঝে সময় পেলে আসবেন।

তারপর একটু থেমে বললেন—একটা বড় মুসকিল হয়ে গেছে, সুনির্মল আপনাকে বলেছে নিশ্চয়ই—

বললাম—দহি-বড়া খাওয়ার ব্যাপারটা তো? ওতে কিছু অসুবিধে হবে না—

ঊষা মৈত্র কিন্তু বিশেষ তার জন্যে সঙ্কুচিত নয় মনে হলো। সালোয়ার পাঞ্জাবী ছেড়ে সে বেশ একটা শাড়ি পরেছে সেদিন। বেশ চটপটে ভাব। লজ্জা কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ কিছুই নেই মুখে।

বললে—কোন্ গান শুনবেন বলুন—খেয়াল না ঠুংরি?

সুনির্মল বললে—ধ্রুপদটাও জানে, যদি শুনতে চান তো তার ব্যবস্থাও করতে পারি। পাখোয়াজ আছে এখানে—

প্রভাংশু দত্ত ধ্রুপদও বোঝে না, খেয়ালও বোঝে না। মোট-মাট এক কথায় গানের কিছুই বোঝে না। তার কাছে ভালো লাগাটাই গানের একমাত্র মাপকাঠি।

সুনির্মল ঊষার দিকে চেয়ে বললে—তা হলে সেই মালকোষের খেয়ালটা গাও।

ঊষা বললে—ধ্যেৎ, পরজ কেমন?

বাপ মৈত্রমশাই বললেন—ও সবই শিখেছে, জানেন দত্ত-

মশাই, কীর্তন রামপ্রসাদী মায় বাউল ভাটিয়ালি পর্যন্ত শেখানো হয়েছে ওকে। কোন সাবজেক্ট বাদ দেয়নি সুনির্মল—

দরজার আড়ালে মৈত্রমশাইয়ের গৃহিনী ছিলেন মনে হলো। কারণ পর্দাটা একটু অসাবধানতায় নড়ছিল। একবার যেন ভেতর থেকে কী ইঙ্গিত এলো, আর সুনির্মল টপ করে ভেতরে ঢুকে গিয়ে আবার বাইরে এলো।

বাইরে এসে বললে—কাকিমা বলছেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে—

মৈত্রমশাই আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাইলেন।

আমি বললাম—তা রবীন্দ্র-সঙ্গীতই হোক না, ক্ষতি কী—

গান আরম্ভ করার আগে সুনির্মল গায়িকার দিকে দুটো লবঙ্গ এগিয়ে দিলে।

বললে—এগুলো চিবোতে চিবোতে গাও—

মৈত্রমশাই রেগে গেলেন।

বললেন—না না, এখন লবঙ্গ-ফবঙ্গ চিবোলে কী হবে? জিভে ঝাল লাগলে কখনও গান গাইতে পারে কেউ? খুকু, লবঙ্গ এখন খাসনে—

ভেতর থেকে কী যেন ইঙ্গিত এলো। সুনির্মল আবার ভেতরে চলে গেল।

উষা তখন মুখ থেকে লবঙ্গ ফেলে দিয়েছে।

মৈত্রমশাই বললেন—হ্যাঁ, এইবার গাও, সেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতটা গাও তো—আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—জানেন দত্তমশাই, আপনাদের রবিঠাকুর গান লিখতে পারতেন বেশ। কথাগুলো ভালো করে শুনুন, বেশ মানে আছে মশাই—

উষা মৈত্র গান আরম্ভ করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ভেতর থেকে সুনির্মল এসে বললে—কাকিমা বলছিলেন লবঙ্গ চিবোতে চিবোতে গান গাওয়াই ভালো—

—তাই নাকি ?

মৈত্রমশাই একটু যেন দমে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন—তা হলে লবঙ্গ চিবোতে চিবোতেই গাও মা—তোমার মা যখন বলছেন—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—জানেন, খুকুর গর্ভধারিণীর বড় ইচ্ছে যে রেডিওতে খুকুর গান শোনেন। নইলে আমি মশাই মেয়েদের বাইরে মেলা-মেশাটা বিশেষ পছন্দ করি না।

সুনির্মল তখন তবলা নিয়ে তৈরি।

তবলাটা বোধহয় আগে থেকেই সুর মিলিয়ে বাঁধা ছিল।

আমি গান শুনতে লাগলাম।

আর সবাই মিলে আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। সুনির্মলেরই যেন বেশি লজ্জা। এর আগে সুনির্মলই এই যজ্ঞের যেন হোতা ছিল। সে যেন এই ঘটনায় আমার সামনে বড় ছোট হয়ে গেল।

কিন্তু আমিও কোন দিকে চোখ না দিয়ে আপন মনে গান শুনতে লাগলাম।

সেদিন সেই পর্যন্ত। একটা স্তোক-বাক্য দিয়ে আমি কোনও রকমে বাড়ি চলে এসেছিলাম। মনে আছে আমার আসবার সময় মৈত্রমশাই এমনিতে ছাড়েননি। সামোশা আর চা খাইয়ে দিয়েছিলেন জোর জবরদস্তি করে।

শেষকালে আসার সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেমন লাগলো বলুন, খুকুর গান ?

বললাম—ভালোই তো।

তারপর মৈত্রমশাই আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—আপনাদের রেডিওতে চলবে তো খুকুর গান ?

বললাম—আমি চেষ্টা করে দেখি! আপনাকে জানাবো—

এই পর্যন্ত বলেই সেদিন রেহাই পেয়েছিলাম। কিন্তু তারপর থেকেই আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই দেখি সুনির্মল আমার ঘরে বসে আছে, আবার রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে দেখি সুনির্মল বসে আছে।

আমাকে দেখেই মুখ কাঁচু-মাঁচু করে সম্মান দেখাতে উঠে দাঁড়াতো।

বলতো—কেমন আছেন ?

বলতাম—না ভাই, কিছু ব্যবস্থা হয়নি এখনও—

কথাটা শুনে কিছু বলতো না সে। আস্তে আস্তে মুখ নিচু করে চলে যেত, কিন্তু তার পরদিনই আবার আসতো, এসে চুপ করে বসে থাকতো।

সেই আগের দিনের মত জিজ্ঞেস করতো—কেমন আছেন ?

শেষকালে অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম। যেরকম গান শুনেছি মেয়েটার, সেরকম গান জানাশোনা না থাকলে ব্রডকাস্ট করানো শক্ত।

কিন্তু হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল।

লক্ষ্ণৌ স্টেশন থেকে আমাদের বন্ধু ভট্টাচার্যি এসেছিল মিউজিক সেকশানে এ্যাকটিং করতে। দিল্লী-রেডিওর পার্মানেন্ট প্রোগ্রাম-এক্জিকিউটিভ ছিল ভার্মা। সে ছুটিতে চলে যেতে তার জায়গায় ভট্টাচার্যি এসেছিল।

একদিন ভট্টাচার্যিকে আমার অবস্থাটা বললাম।

সব শুনে ভট্টাচার্যি বললে—মেয়েটা দেখতে কেমন ?

বললাম—দেখতে যা-ই হোক গানটা মন্দ গায় না, যেসব আর্টিস্ট গান গায় আমাদের স্টেশনে, তাদের মতই—

ভট্টাচার্যি বললে—তাহলে নিয়ে এসো একদিন। অডিশন্ নিয়ে দেখি—

বললাম—তাই দেখ ভাই, অন্তত একটা চান্স দিয়ে দাও, আমারও মুখ রক্ষে হোক। অনেক সিঙাড়া চা খেয়েছি, একটুখানি উসুল করতে দাও—

ভট্টাচার্যি একটা দিন স্থির করে দিলে। বললে—তাহলে সোমবার দিন আসতে বলে দিও—অডিশানের ব্যবস্থা করে দেব। সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার সময়।

এদিকে কথাবার্তা ঠিক করে ফেলে খবরটা দিলাম সুনির্মলকে।

সুনির্মল সেদিনও যথারীতি এসে আমার বাইরের ঘরে চুপ করে বসেছিল। ভেবেছিল রোজকার মত হতাশ হয়েই তাকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু খবরটা শুনেই তার কান ছ'টো লাল হয়ে উঠলো।

বললে—সত্যি ?

বললাম—সত্যি না তো কি মিথ্যে ?

—কিন্তু শেষকালে অডিশান্ করার পর রিজেক্ট করে চিঠি দেবে না তো ?

বললাম—তা আমি বলতে পারি না।

—কিন্তু সেইটে যাতে না হয়, সেইজন্যেই তো আপনার থ্রু দিয়ে যাওয়া। সেইটে শুধু আপনি একটু ওদের বলে দেবেন দাদা!

বললাম—যা বলবার তা আমি বলেই রেখেছি, তুমি উষাকে নিয়ে সোমবার ঠিক সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় হাজির হয়ো—

সুনির্মলের মন থেকে তবু পুরোপুরি ভয়টা গেল না। আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেল। তারপর দেখলাম রাস্তা পেরিয়ে সোজা মৈত্রমশায়ের বাড়িতে খবরটা দিতে ঢুকলো।

কিন্তু পরদিন ভোরবেলাই মৈত্রমশাই আমার বাড়িতে এসে হাজির।

—দত্তমশাই, দত্তমশাই, দত্তমশাই বাড়ি আছেন নাকি?

বুড়ো ষাট-সত্তর বছর বয়সের লোক। কিন্তু তবু ভাবলাম হয়তো রেডিওতে মেয়ের গান গাওয়ার চান্স মিলেছে বলে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছেন।

কিন্তু না, তা নয়।

আমাকে দেখে বললেন—সুনির্মলের মুখে শুনলাম সব। তাহলে সোমবার সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার সময়ই অডিশান্ হবে?

বললাম—হ্যাঁ, সেই রকম কথাই তো আছে। আমি সুনির্মলকে তাই জানিয়ে দিয়েছি।

মৈত্রমশাই বললেন—না, সেজন্যে নয়, আমি জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম যে আমি কি সঙ্গে থাকবো?

বললাম—না না, আপনি কেন কষ্ট করতে যাবেন?

মৈত্রমশাই বললেন—কষ্ট আর কিসের, মেয়ের গান রেডিওতে হবে, এ তো আনন্দের কথা। আমার কিছু কষ্ট হবে না। আপনি যদি বলেন তো আমি থাকবো—

তারপর একটু থেমে বললেন—আসলে কী ব্যাপার জানেন, এখন এখানকার দিনকাল ভালো নয়। খুকুর তো বয়েস হয়েছে কিনা, যেখানে-সেখানে একা ছেড়ে দিতে ভয় করে মশাই।

বললাম—কিন্তু কলেজে তো একাই যায়—

মৈত্রমশাই বললেন—কলেজে তো আর আমি সঙ্গে যেতে পারি না দত্তমশাই, তা তাও আমি বলেছিলাম যে আমি না হয় তোর

সঙ্গে যাই, আবার ছুটির সময় তোকে আমি সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসবো। তা খুকু আপত্তি করে।

বললাম—তা তো করবেই—

—অথচ মেয়েকে আজকাল লেখাপড়া না শিখিয়ে মুখ্যু করে তো আর রাখতে পারি না। আজকালকার ছেলেরা আবার লেখা-পড়া জানা না হলে যে বিয়েই করতে চায় না।

বললাম—কিন্তু গান? গান কেন শেখাতে গেলেন?

মৈত্রমশাই বললেন—ওই কথা কে বলে বলুন না! ওর গর্ভধারিণী যে না-ছোড়বান্দা। বলে মেয়েটাকে নাকি আমি গো-মুখ্যু করে রাখতে চাই—

—আপনার গৃহিনীরই তাহলে গান শেখানোর বেশি গরজ?

—আরে তা নয় দত্তমশাই, আসলে আমায় গৃহিনীর তাগিদেই গান শেখার হিড়িক। আর তাও বলি, শুধু গান শিখলেই তো হবে না, দশ জায়গায় গাইতেও হবে। আচ্ছা দত্তমশাই, আপনি বলুন তো শুধু গান শিখলেই তো চুকে যায় ল্যাটা, আবার রেডিওতে গাওয়া কেন বাপু। এই তো আমি, আমার কথাই ধরুন না। আমি তো নাচও জানি না, গানও জানি না, আমার নামও ভূ-ভারতে কেউ জানে না। তা আমি কি মানুষ নই?

বললাম—না না, সে তো খাঁটি কথা।

মৈত্রমশাই বললেন—আপনি বিচক্ষণ লোক, আপনি তো তা বলবেনই, কিন্তু ওই কথা যদি আমি গিন্নীকে বলি তো তখনই লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে। একেবারে সেই যে শুরু হবে ঝগড়া তা আর শেষ হবে না। তখন বলবে—আমার জীবনটাও তুমি নষ্ট করে দিয়েছ, মেয়ের জীবনটাও ওই করে নষ্ট করে দিয়ে ছাড়বে।

মৈত্রমশাইয়ের আক্ষেপ শুনে মায়া হলো নিজের মনে। ভাবলাম ভদ্রলোক দায়ে পড়েই মেয়েকে গান শেখাচ্ছেন। দায়ে পড়েই আমার কাছে তদ্‌বির-তদারক করতে এসেছেন।

বললাম—ঠিক আছে, আপনার যদি মনে কোনও সন্দেহ থাকে তো আপনিও চলুন, আমার কোনও আপত্তি নেই—

মৈত্রমশাই বললেন—হ্যাঁ, তাই ভালো। মেয়েকে ওখানে পাঠিয়ে দিয়ে আমি বাড়িতে ধড়্‌ফড়্‌ করবো। তার চেয়ে সঙ্গে গিয়ে দেখেই আসি না ব্যাপারটা কী ?

তারপর গলা নিচু করে বললেন—আর একটা কথা—

বলে আমার কাছে সরে বসলেন :

বললেন—গৃহিনী আমাকে বিশেষ করে বলতে বলেছে। আর আজকাল সব ব্যাপারেই তো ঘুষ দিচ্ছি। কোর্ট-কাছারিতে গিয়ে জজ-ব্যারিস্টার-মোক্তার থেকে শুরু করে রেলের ইস্টিশান পর্যন্ত ঘুষটি ছাড়া কেউ কথা বলবে না। তাই বলছিলাম—

আমি বুঝতে পারছিলাম না কীসের ইঙ্গিত করছেন মৈত্রমশাই।

মৈত্রমশাই বললেন—আপনি যেন লজ্জাটজ্জা করবেন না দত্ত-মশাই, এতে লজ্জার কিছু নেই। যদি কাউকে কিছু দিতে হয় তাও আগে থেকে বলুন, আমি সঙ্গে রেখে দেব টাকাটা।

আমি বললাম—কীসের টাকা ?

মৈত্রমশাই বললেন—এই কাউকে যদি ধরুন দিতে হয়—আর আজকাল সব জিনিসেরই তো দাম বাড়ছে মশাই—

বুঝতে পারলাম।

বললাম—না না, আমাদের অফিসে ওসব ব্যাপার নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ওদিক থেকে—

মৈত্রমশাই চলে গেলেন।

অফিসে সাড়ে ছ'টার সময়ই ওঁদের যাবার কথা। সেই সময়েই

অডিশানের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তার আগেই ওরা তিনজনে গিয়ে হাজির।

আমি তো ওদের দেখে অবাক।

—সে কী! আপনারা এখনই এসেছেন? সাড়ে ছ'টা বাজতে এখনও তো অনেক দেরি।

মৈত্রমশাই এগিয়ে এলেন।

বললেন—রাস্তায় বাসের যা কাণ্ড, তাই একটু আগেই এসে পড়লাম। কেউ কিছু মনে করবে না তো?

বললাম—তা নয়। আপনারা বসুন, আমি দেখছি কী ব্যবস্থা হয়েছে—

সুনির্মলও দেখলাম একপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। আমি ঘরের বাইরে চলে গেলাম।

ভট্টাচার্যিকে গিয়ে বললাম সব।

ভট্টাচার্যি বললে—আচ্ছা মক্কেল এনেছ তুমি। আসবার আগেই তো আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে। আমি দেখাই করিনি। কেউ হয়-টয় নাকি তোমার?

বললাম—আরে না, কে আবার হবে? আমাকে ধরেছে তাই বলছি—

যা হোক, যথারীতি অডিশান হলো। ঊষা একটা ভজন গাইলে। সুনির্মলের ভজন গাওয়াবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মৈত্রমশাই বললেন—না না, ভজনটাই ভালো লাগবে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপারটা শেষ হলো।

ভজনের দুটো লাইন শোনবার পরই ভট্টাচার্যি বললে—আর গাইতে হবে না—থাক।

ঘর থেকে বেরোবার সময় সুনির্মল এলো আমার কাছে।

বললে—কী হলো বলুন তো? গান ভালো হয়নি বুঝি?

বললাম—কে বললে ভালো হয়নি?

—তবে যে গান থামিয়ে দিলেন ওঁরা ?

বললাম—ওঁদের যতটুকু শোনবার ততটুকু শুনে নিয়েছে, আর শোনবার দরকার নেই—

সুনির্মল বললে—আমার কিন্তু বড় ভয় করছে, শেষ পর্যন্ত প্রোগ্রাম দেবে তো ?

যার গান তার কিন্তু এসব ভাবনা নেই। সে দেখলাম রীতিমত চারদিকে ঘুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে সব দেখছে। রেডিও অফিসের ভেতরে ঢোকবার সুযোগ পেয়েছে, সে-সুযোগের সে সদ্ব্যবহার করছে।

বললে—এইটে বুঝি আপনার ঘর ?

চারদিকের লাল আলো, সবুজ আলো দেখে তার যেন আর বিস্ময় কাটে না। আগেও দু'একবার এসেছে এখানে কিন্তু এবার আমার সুপারিশে একটু সাহস পেয়েছে যেন !

মৈত্রমশাই তাড়া দিলেন।

বললেন—চলো চলো সুনির্মল, বাড়ি চলো—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—উষার গর্ভধারিণী আবার বাড়িতে একলা-একলা ভাববেন, হয়তো তিনি রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বললাম—কিন্তু আপনি তো সঙ্গে এসেছেন, ভাবনার কী আছে ?

মৈত্রমশাই বললেন—সেজন্যে নয়, আমার মত তাঁরও তো মেয়ে-মেয়ে বাতিক আছে। খবরটা জানবার জন্যে তাঁরও তো বুক দুর দুর করছে, বলেছেন এখান থেকে সোজা গিয়ে যেন তাঁকে খবরটা দিই—

সুনির্মল বললে—হ্যাঁ, কাকিমা আমাকেও বলে দিয়েছেন।

বললাম—আপনাদের কিছু ভাবতে হবে না। আমি যথাসময়ে খবরটা জানিয়ে দেব—

তারা তিনজনেই চলে গেল।

ভট্টাচার্যির ঘর থেকে ভট্টাচার্যি বললে—কী মাল জুটিয়েছ হে! এ যে একেবারে বটের আটা হয়ে আটকে ধরেছিল।

—কেন, তোমাকে বিরক্ত করেছে নাকি?

ভট্টাচার্যি বললে—আরে ওই মেয়েটার সঙ্গে যে বুড়ো বাপটা এসেছিল, ও একেবারে আমার পেছন ছাড়তে চায় না। শেষে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। মালটা কোত্থেকে জোগাড় করলে?

বললাম—জোগাড় কি আর করেছি! আমার ঘাড়ে এসে উঠেছে—ঘাড় থেকে কোনও রকমে নামাতে পারলেই বাঁচি এখন।

—কারা ওরা?

বললাম—আমার বাড়ির সামনেই থাকে।

—তাহলে তো জ্বালাবে। যতদিন না বিয়ে হয়, ততদিন এমনি করে জ্বালাবে। তারপর বিয়ে হয়ে যাবার পর একটা ছেলে-মেয়ে যা হোক কিছু হলেই গান-টান সিকেয় উঠবে।

সেদিন ঐ পর্যন্তই।

আমি অবশ্য জানতাম যে, ভট্টাচার্যি যে-ক'দিন আছে ততদিন আমার কথা রাখবে। কিন্তু তারপরে যে আর হবে না, তাও জানতাম। ততদিন যদি মৈত্রমশাইয়ের মেয়ের একটা বিয়ে হয়ে যায় তো আমি মুক্তি পেয়ে যেতে পারি।

কিন্তু তখন কি জানি এর জের এতদূর গড়াবে?

তারপর থেকে আরম্ভ হলো তাগাদা। তাগাদার পর তাগাদা। সকালে বিকেলে তাগাদা। ভোরবেলা মৈত্রমশাই মর্নিং-ওয়াক করে ফিরে আসার সময় তাগাদা। বিকেলবেলা অফিস থেকে ফেরবার পথে সুনির্মলের তাগাদা।

আর তারই ফাঁকে ফাঁকে উষা মৈত্র।

আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখতে পেলেই সামনের বাড়ি থেকে সোজা এসে হাজির হতো।

—দাদা, এখনও তো কোনো চিঠি এলো না আমার নামে?

বলতাম—আসবে আসবে, অত ভাবছো কেন?

—না, আমি যে আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ডদের সবাইকে বলে দিয়েছি। এখন যদি না হয় তো লজ্জায় পড়বো যে!

আমি বলতাম—বেশীদিন দেরি হবে না, চিঠি আসবে। তুমি ভেবো না—

এই রকমই চলতো।

তারপর একদিন চিঠি এলো।

মৈত্রমশাই হাসতে হাসতে এলেন ভোরবেলা। হাতে এক বাক্স মিষ্টি।

বললাম—কী হলো? মিষ্টি কীসের?

হাসি দেখেই ব্যাপারটা আমি বুঝে নিয়েছিলাম। তবু প্রশ্নটা করেছিলাম।

মৈত্রমশাই বললেন—না, এ আমার নয়; উষার গর্ভধারিণী পাঠিয়ে দিলেন। এটা আপনাকে নিতেই হবে দত্তমশাই।

অগত্যা নিতে হলো।

বললাম—গলা-টলার যত্ন নিচ্ছে তো উষা?

মৈত্রমশাই বললেন—যত্ন নিচ্ছে কিনা জানি না তো?

বললাম—না, আপনি একটু যত্ন নিতে বলবেন। এই সকাল বেলা খালি-পেটে নুন-জল দিয়ে কুলকুচো করতে বলবেন রোজ—

মৈত্রমশাই বললেন—বেশ। আর কিছু করতে বলবো?

বললাম—না, আর কিছু করতে হবে না।

মৈত্রমশাই চলে গেলেন। ক'দিন ধরে খুবই আনাগোনা চললো।

মৈত্রমশাইয়ের বাড়িতে এলাহি কাণ্ড লেগে গেল মেয়ের গান নিয়ে। গলা যেন খারাপ না হয়। গান গাইবার দিন যেন কোনও বিপর্যয় না ঘটে।

শেষে সেই দিন এসে হাজির হলো।

সেদিন মৈত্রমশাই-ই শুধু নয়, শুধু সুনির্মলই নয়, মৈত্রমশাইয়ের গৃহিনীও সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি হলেন।

আমাকে মৈত্রমশাই বললেন—উনি তো ধরেছেন, উনিও কি যাবেন?

বললাম—যান না, ক্ষতি কী?

পৃথিবীতে যেখানে যত আত্মীয় ছিল, সব জায়গায় চিঠি লিখে দেওয়া হয়েছিল যে অমুক তারিখে অমুক সময়ে আমার মেয়ে গান গাইবে, তোমরা শুনবে। কেমন লাগলো পত্রযোগে জানাবে।

সবাই উত্তর দিয়েছিল—তারা শুনবে, আর কেমন লাগলো জানাবে।

শেষকালে একদিন গান হলো।

সে কী ঝামেলা! গান যেন আর কেউ রেডিওতে গায় না। কত লোক এসে নিঃশব্দে গান গেয়ে যাচ্ছে, কেউ টেরই পাচ্ছে না। যার যখন টাইম তখন সে আসে, তারপর যথারীতি ঠিক সময়ে স্টুডিওতে ঢোকে। যখন লাল আলোটা জ্বলে ওঠে, তখন গান শুরু করে। তারপর ঠিক সময়ে গান শেষ করে চেক্ নিয়ে চলে যায়।

কিন্তু এ অন্যরকম। আর্টিস্ট গান গাইতে এলো। কিন্তু সঙ্গে এলো বাপ-মা গানের মাস্টার। স্টুডিওতে হৈ-চৈ পড়ে গেল।

ভট্টাচার্যি আমাকে এসে বললে—তুমি দত্ত, ওদের বাইরে যেতে বলো—

আমি আস্তে আস্তে মৈত্রমশাইকে বললাম যে স্টুডিওতে এত লোকের ঢোকার নিয়ম নেই। আপনারা বাইরে বসে বসে ঊষার গান শুনুন। সবাই আপত্তি করছে—

মৈত্রমশাই বললেন—তা তো বটেই, ঠিক আছে, আমরা বাইরে যাচ্ছি।

তারপরে গান হলো। কেমন গান হলো তা আর আমি শুনিনি। শোনবার ইচ্ছেও হয়নি। ভালো মন্দ নানারকম গান শুনে শুনে আমাদের অরুচি ধরে গেছে। আমি ডিউটি শেষ করে বাড়ি চলে এসেছি।

এরপরে সুনির্মল আমাদের বাড়ী এসেছিল। গান শুনে কে-কে ভালো বলেছে তার ফিরিস্তি দিলে। মৈত্রমশাইও খুশি খুব। তারপরে চিঠি আসতে লাগলো নানা দিক থেকে। লক্ষ্ণৌ থেকে কাকা, বেরিলি থেকে পিসেমশাই, শোনপুর থেকে জ্যাঠাইমা। সবাই উষার গান শুনে মোহিত হয়ে গেছে।

এসব খবর রোজই শুনতে হতো। এক একখানা করে চিঠি আসে আর রোজই সুনির্মল এসে তা আমাকে সবিস্তারে শুনিয়ে যায়।

কিন্তু মুসকিল হলো দ্বিতীয় প্রোগ্রাম নিয়ে, আবার কবে গান হচ্ছে!

হয়তো দ্বিতীয়বারের জন্যেও আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতো ওরা, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই আমি ছুটি নিয়ে নিলাম।

কাউকে না জানিয়ে আমি দিল্লী ছেড়ে কলকাতায় চলে এলাম।

বললাম—তারপর?

প্রভাংশু দত্ত বললে—তারপর ভাবলাম আমি চলে এলে আর কিছু গণ্ডগোল হবে না। কারণ ভট্টাচার্যিও ক'দিনের জন্যে বদলি

হয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লীতে এসেছিল, সে চলে গেলে কে আর কথা রাখবে?

আমি কলকাতায় এসে মৈত্রমশাইদের কথা ভুলেই গেলাম বলতে গেলে।

ভোলা ছাড়া উপায়ও ছিল না।

কিন্তু একদিন আবার যখন দিল্লীতে ফিরলাম তখন দু'মাস কেটে গেছে।

দু'মাস পরে গিয়ে বাড়ির সামনের দিকে চেয়ে দেখলাম মৈত্রমশাইয়ের বাড়ি আমাদের বাড়ির মুখোমুখি। বাইরে কাউকেই দেখতে পেলাম না। আমি যে দিল্লীতে এসেছি সে-খবরটাও জানালাম না। চুপি চুপি আসা-যাওয়া করতে লাগলাম বাড়ি থেকে।

বহুদিন পরে একদিন অফিসের ভেতরে কাজ করছি।

হঠাৎ যেন চেনা গলা এলো। উষার গলা না! উষা তাহলে কি আবার রেডিও অফিসে এসেছে?

বাইরে বেরিয়ে দেখি উষা শুধু একলা নয়, সঙ্গে আরো কয়েকজন আর্টিস্ট!

কেমন যেন অবাক লাগলো আমার। ওদের সঙ্গে কেমন করে এত ঘনিষ্ঠ হলো?

তাহলে কি আবার প্রোগ্রাম পেয়েছে নাকি? বেশ হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে বারান্দা পেরিয়ে চলেছে। যে আর্টিস্ট আমাদের সেতার বাজায়, আর যে তবলা বাজায় তারা দু'জন পাশাপাশি চলেছে।

আমার সঙ্গে দেখা হলো আনন্দীলালের। আনন্দীলাল ওদিক থেকে আসছিল।

বললাম—ও আর্টিস্টটা কে আনন্দীলালজী?

আনন্দীলালজী সাউণ্ড ডিপার্টমেণ্টের লোক। আমার সঙ্গে আগে থেকেই ঘনিষ্ঠতা ছিল।

বললে—ও তো উষা মৈত্র।

বললাম—উষা মৈত্র? সে আমাদের আর্টিস্ট নাকি?

আনন্দীলাল বললে—হ্যাঁ, আজকাল তো ঘন ঘন প্রোগ্রাম থাকে ওর। আজও প্রোগ্রাম আছে বোধহয়—

কথাটা বলে আনন্দীলাল চলে।

আমি একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম উষা মৈত্রের দিকে। ওরা করিডোর পেরিয়ে বাঁ দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিজের ঘরে বসে ভাবতে লাগলাম এ কেমন করে হলো!

তবে কি আমি চলে যাবার পর ভট্টাচার্যিই আবার ওকে চান্স দিয়েছিল? না-কি সুনির্মল আমার অনুপস্থিতিতে আর কাউকে ধরে প্রোগ্রাম আদায় করে নিয়েছে!

সেদিন রেডিওর প্রোগ্রামটা খুলে দেখলাম কখন গান আছে উষার। সন্ধ্যে সাতটায় দেখলাম উষার ঠুংরি প্রোগ্রাম রয়েছে।

সেদিন আর সকাল সকাল বাড়ি না গিয়ে গানটা রেডিওতে শুনতে লাগলাম।

বড় মিষ্টি লাগলো গানটা।

সুনির্মল তো ভাল গান শিখিয়েছে উষাকে। সুনির্মল তো গুণী লোক।

গান শেষ হবার পর সমস্তটা শুনে বাড়ি চলে এলাম। মনে হলো গান ভালই হয়েছে। দু'মাস আগেও উষার গান শুনেছি, তার চেয়ে অনেক ভালো গান শিখেছে সে। অনেক উন্নতি হয়েছে উষার।

বাড়িতে ঢোকবার আগে একবার ইচ্ছে হলো মৈত্রমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। বাড়িটার সদর দরজা পর্যন্তও গেলাম। কিন্তু ভাবলাম দরকার নেই। মৈত্রমশাইয়ের মেয়ে রেডিওতে গানের

প্রোগ্রাম পেয়েছে, এ তো ভালো কথা ও নিয়ে আমার ভাববার দরকার কী ?

প্রভাংশু দত্ত গল্প বলছিল আর আমি শুনছিলাম।

বললাম—তারপর ?

প্রভাংশু দত্ত বলতে লাগলো—তারপর আমিও আর ও নিয়ে মাথা ঘামালাম না। যদিও আমার বাড়ির সামনেই মৈত্রমশাইদের বাড়ি, একবার গিয়ে অন্তত দেখা করতে পারতাম। বলতে পারতাম যে উষার নাম শুনে খুব খুশি হয়েছি। রেডিওতে ঘন ঘন প্রোগ্রাম পাচ্ছে, এটাও খুব সুখবর।

কিন্তু ভাবলাম ওরাই যখন আমার খোঁজ নেয় না তখন আমারই বা কী দরকার খবর নেওয়ার। আমি কে বলো না! আমার সঙ্গে মৈত্রমশাইয়ের ছিল দরকারের সম্পর্ক। এখন দরকার ফুরিয়ে গিয়েছে, সুতরাং ওদের কাছে আমারও দরকার ফুরিয়ে গিয়েছে।

তারপর হয়তো বড় জোর দু'মাস কেটেছে।

সেই সময়ে আমি কী একটা কাজে নিজের অফিস থেকে বাইরে বেরিয়েছি। নিজের ঘরের বাইরে অন্য এক ডিপার্টমেন্টের কর্তার সঙ্গে দেখা করতে যাবো, দেখি বারান্দায় একটা খালি বেঞ্চের ওপর সুনির্মল বসে আছে।

আমাকে সুনির্মল দেখতে পায়নি তখনও। চেহারাটা যেন সুনির্মলেরই মত, অথচ হয়তো সুনির্মলই নয়।

আমি ঘুরে মুখের সামনে গেলাম ভালো করে দেখবার জন্যে।

বললাম—সুনির্মল না ?

আমাকে দেখে সুনির্মল কাঁদো-কাঁদো ভাবে চাইলে আমার দিকে। তারপর বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

বললাম—কী হয়েছে তোমার ? তোমার নাম সুনির্মল না ? এরকম চেহারা হলো কেন ?

সুনির্মলের বুকের ভেতরে যেন কান্না ঠেলে উঠতে চাইছিল, কথা বেরোচ্ছিল না মুখ দিয়ে।

বললাম—এখানে এমন করে বসে আছো কেন ? ঊষার গান আছে নাকি ?

সুনির্মলের মুখ দিয়ে এতক্ষণে কথা বেরোল।

বললে—আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন দাদা ? আমি তো অনেক খুঁজেছি আপনাকে। শুনলাম আপনি ছুটিতে গিয়েছেন। কবে ফিরলেন ?

বললাম—ফিরেছি ছ'মাস হলো প্রায়। কিন্তু তোমার খবর কী বলো ?

সুনির্মল একবার মাথাটা নিচু করে আবার মাথাটা তুললো।

বললে—খবর ভালো নয়। নইলে দেখছেন না আমি অফিসে যাইনি—

—কিন্তু কেন ? কী হলো তোমার ?

সুনির্মল বললে—দাদা, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন ? সেই আড়াইটের সময় এসেছি—

বুঝলাম একটা কিছু ব্যাপার হয়েছে।

সেখান থেকে সুনির্মলকে নিয়ে গিয়ে বসালাম নিজের ঘরে, জল দিলাম।

সুনির্মল ঢক্ ঢক্ করে পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে ফেললে।

তারপর বললে—ঊষার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম—তা

ভালোই হলো আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আপনি আমাকে বাঁচান দাদা—

আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম—

বললাম—কী হলো তোমার? খুলে বলো সব।

সুনির্মল বললে—আপনিই তো সেই রেডিওতে গানের ব্যবস্থা করে গেলেন। আপনিই তো দাদা চেষ্টা করে করালেন, আপনার চেষ্টাতেই বলতে গেলে সব হলো—

বললাম—সে থাক, তারপর কী হলো বলো?

—তারপর আপনি তো ছুটিতে চলে গেলেন, আমি তখন থেকে আরো মন দিয়ে গান শেখাতে লাগলাম ঊষাকে। একটা প্রোগ্রাম হলো, কিন্তু আর একটা প্রোগ্রামের তো ব্যবস্থা হওয়া চাই। তাই ঊষাকে সঙ্গে করে নিয়ে এখানে আসতাম। আপনি নেই, তাই কে আর আমাদের আমল দেবে? শেষকালে আপনাদের ওই যে সেতার বাজায় শশীভূষণ—

বললাম—হ্যাঁ হ্যাঁ শশীভূষণ, ইউ-পি'র লোক—

—হ্যাঁ, ওই শশীভূষণের একটু দয়া হলো। একদিন শশীভূষণকে নিয়ে জ্যাঠামশাইদের বাড়িতে গেলাম ঊষার গান ভালো করে শোনাতে—

তার পরের কথা সুনির্মল যা বললে, তাতে আরো অবাক হয়ে গেলাম।

শশীভূষণ নাকি ঊষার গান শুনে একেবারে উচ্ছ্বসিত। সে বলেছে, আপনার মেয়ে একটা জিনিয়াস মৈত্রমশাই—

আর তারপর থেকেই শশীভূষণের খুব নাকি খাতির বেড়ে গেল ওদের বাড়িতে।

—তারপর?

—তারপর শশীভূষণ প্রায়ই যায়, ঊষাকে সেতার শেখায়। শশীভূষণের সঙ্গে আপনাদের এখানকার বাহাদুরজীও যায়। চেনেন

তো বাহাদুরজীকে? ওই যে তবলা বাজায়। এখন বেশ ঘন ঘন প্রোগ্রাম পাচ্ছে উষা, এখন যখন-তখন জলসায় যাচ্ছে। আপনি তো দিল্লী শহর চেনেন? এভাবে যেখানে-সেখানে যার-তার সঙ্গে কি যাওয়া ভালো? আপনিই বলুন?

বুঝলাম অন্য লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করাতে সুনির্মলের মনে খুব লাগছে।

—তা তুমি এখন এখানে কি করতে এসেছ?

—আমি? এখানে? বাড়িতে গেলে যে আমার সঙ্গে দেখাই করে না ও।

—সেকী! তোমার সঙ্গে দেখাই করে না?

সুনির্মল কাঁদো-কাঁদো চোখে চাইলে আমার দিকে।

বললে—না দাদা, আমার সঙ্গে প্রায়-দিনই দেখা করবার সময় হয় না ওর—

—সেকী! তুমিই তো বলতে গেলে ওকে রেডিও অফিসে গান গাইতে নিয়ে এলে। তোমার আগ্রহ দেখেই তো আমি অত করে বলে-কয়ে ব্রডকাষ্টিংয়ের ব্যবস্থা করলাম। আগে তো তুমি ছাড়া কেউ ছিল না উষার।

সুনির্মল বললে—এখন দাদা ওর লোকের অভাব নেই, এখন সবাই বলে উষার নাকি ফিউচার খুব ভালো—

বললাম—তা তোমার জ্যাঠাইমা আর জ্যাঠামশাই, তারা কী বলেন?

সুনির্মল বললে—তারাও আজকাল অন্য রকম হয়ে গেছে। তারা আর সেরকম নেই। এখন আমাকে আর ওরা তেমন আমল দেয় না।

একটু থেমে সুনির্মল আবার বললে—জানেন দাদা, আগে আমি একদিন উষাকে গান শেখাতে না এলে আমার খোঁজ পড়তো।

আমার বাড়িতে জ্যাঠামশাই নিজে গিয়ে খবর নিতেন—কী হলো আমার, আমার শরীর খারাপ হয়েছে কিনা, এইসব—

একটু সহানুভূতি দেখিয়ে বললাম—সত্যিই তোমার জন্যে খুব দুঃখ হয় সুনির্মল। তা আমি আর এ ব্যাপারে কী করতে পারি বলো? আমি তো বাইরের লোক—

সুনির্মল বললে—কিন্তু আপনি কিছু না করলে, কে করবে? আমার আর কে আছে?

বললাম—তা তুমি আজকে কী করতে এখানে এসেছিলে?

সুনির্মল বললে—ওই উষার সঙ্গে দেখা করতে। বাড়িতে তো দেখা হয় না। ভাবলাম এখানে যদি দেখা হয়। কিন্তু অনেকবার খবর পাঠালাম রিহার্শাল-রুমে, এলো না। এখানে বসে আছি, যদি এই রাস্তা দিয়ে আসবার সময় মুখোমুখি দেখা হয়—

বললাম—উষা কি আমাদের এখানে এখন রিহার্শাল দিচ্ছে নাকি?

সুনির্মল বললে—হ্যাঁ—

—কীসের রিহার্শাল?

—কোন্ থিয়েটার হবে, সেই থিয়েটারের হিরোইনের সোলো গানগুলো গাইবে।

বললাম—আচ্ছা দেখি, তুমি আমার সঙ্গে চলো তো।

সুনির্মল খুশি হলো।

আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে রিহার্শাল-রুমের দিকে গেলাম। খোঁজ-খবর নিয়ে রিহার্শাল-রুমে গিয়ে খবর নিয়ে দেখলাম গান-টান কখন শেষ হয়ে গেছে। আর্টিস্টরাও সব চলে গেছে। ঘর ফাঁকা।

সুনির্মল অবাক হয়ে গেল দেখে।

বললে—তাহলে কি বাড়ি চলে গেল নাকি?

বললাম—তাই তো দেখছি—

—কিন্তু গেল কোন্ দিক দিয়ে? আমি তো রাস্তার ওপরেই

বসে আছি তখন থেকে। তাহলে কি অন্য দরজা দিয়ে চলে গেল নাকি ?

তা হতে পারে। হয়তো সুনির্মলকে বসে থাকতে দেখে ওরা অন্য সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে গেছে।

সুনির্মল কী করবে বুঝতে পারলে না।

আমি বললাম—তুমি এখন বাড়ি যাও ভাই, দেখি আমি কী করতে পারি। নাহয় আমি শেষ পর্যন্ত শশীভূষণকে জিজ্ঞেস করে দেখবো।

বললে—না দাদা, আমার নাম করে যেন কিছু বলবেন না।

বললাম—না, সে ভয় তোমার নেই, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সুনির্মল বললে—তাহলে আপনি একটু বলে দেবেন দয়া করে। সত্যি বলছি, আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি ক'দিন ধরে।

বললাম—তা তো বটেই! কষ্ট তো হবারই কথা। আচ্ছা আমি দেখছি কী করতে পারি।

সুনির্মল তো চলে গেল। আমি ভাবলাম এ আবার কী হলো। ভেবেছিলাম এইসব ব্যাপার থেকে আমি মুক্তি পেলাম। কিন্তু এ যে আরো জড়িয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু তখন কি জানি যে আরো জড়িয়ে পড়বো উষা মৈত্রকে নিয়ে।

সেদিন শশীভূষণের সঙ্গে দেখা করলাম নিজেই।

শশীভূষণ মাস-কাবারি মাইনের আর্টিস্ট। যারা রেডিওতে গান গায়, তাদের গানের সঙ্গে সেতার বাজায়। একজন নামকরা সেতারীও বটে।

বললাম—উষা মৈত্র বলে কোনও আর্টিস্টকে চেন তুমি শশীভূষণ ?

শশীভূষণ প্রথমটায় অবাক হয়ে গিয়েছিল।

তারপর বললে—আপনি কী করে চিনলেন উষাকে ?

বললাম—আমার বাড়ির সামনেই তো থাকে ওরা। আর আমিই তো ভট্টাচার্যিকে বলে ওর গানের ব্রডকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছিলাম।

শশীভূষণ বললে—কিন্তু যাই বলুন, খুব গুণী আর্টিস্ট দত্তবাবু। এতদিন একজন খারাপ মাস্টারের হাতে পড়ে সব ভুল শিখছিল। তাই আমি এখন উষাকে নিজের হাতে নিয়েছি, আর কোনও ভয় নেই।

আমি আরো ভয় পেয়ে গেলাম।

বললাম—তুমি উষাকে নিজের হাতে নিয়েছ ? তার মানে ?

শশীভূষণ বললে—আমরা তো রামকিষেণের ঘরানা। এতদিন উষার কোন ঘরানাই ছিল না, তা জানেন ?

বললাম—ঘরানা-টরানা যা-ই হোক, কিন্তু পুরনো মাস্টারকে তোমরাই বা তাড়িয়ে দিলে কেন ?

শশীভূষণ বললে—সে কী কথা দত্তবাবু, একটা ভালো আর্টিস্ট খারাপ মাস্টারের হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে, আর আমরা রামকিষেণের ঘরানার লোক হয়ে তাই দেখবো ?

বললাম—তোমরা উষাদের বাড়ি যাও, তাও শুনেছি—

—হ্যাঁ, তা যাই-ই তো। মৈত্রমশাই যে উষাকে তালিম দিতে বলেছেন আমাকে, আমি যাই আর বাহাদুরজী যায়। তবলা না হলে ঠেকা দেবো কী দিয়ে ?

বললাম—কিন্তু তোমরা যে যাও ওদের বাড়িতে, তাতে উষার মায়ের কোনো আপত্তি নেই ?

শশীভূষণ বললে—আপত্তি থাকবে কেন দত্তবাবু। আমরা কয়েক দিন না গেলে উষার মা আবার জিজ্ঞেস করে কেন এতদিন

আসিনি। আর তাছাড়া আমরা ওদের বাড়ি গেলে তো ওদেরই লাভ—

বললাম—কেন? লাভ কীসে?

শশীভূষণ বললে—লাভ নয়? কত নাম হয়েছে জানেন ওই উষার? আগে তো কেউ উষাকে জানতো না? এখন চারিদিক থেকে কল্ আসছে গান গাইতে—

- খুব ভালো গান গাইছে নাকি?

শশীভূষণ বললে—আগের চেয়ে এখন অনেক ভালো গায় দত্ত-বাবু। আপনি তো আগে ভট্টাচার্যিবাবুকে বলে এখানে চান্স করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন যদি আর একবার ওর গান শোনেন তো আপনিই আবাব তারিফ করবেন। শুনবেন একদিন?

বললাম না, আমার সময় হবে না—

—আবে সময় করে একদিন শুনুনই না! রামকিষেণের ঘরানা একবার দেখুনই না শুনে। বড় কড়া ঘরানা। সদারঙ-ঘরানার মত মেয়েলি-মোলায়েম ঘরানা নয়।

আমি এমনিতে গানই বুঝি না, তার ওপর ঘরানা তো আরো দুর্বোধ্য জিনিস আমার কাছে।

শশীভূষণ বললে—তার ওপর আগে ভট্টাচার্যিবাবু পনেরো টাকা রেট করে দিয়েছিলেন, এখন হাফিজ সাহেবকে বলে পঁয়ত্রিশ টাকা বেট করিয়ে দিয়েছি উষার। তার ওপর ড্রামা-ডাইরেক্টর লাল-সাহেবকে ধরে গানগুলো সব উষাকে দিয়ে গাওয়াচ্ছি। তাতেও বেশ টাকা আসছে—

ব্যাপারটা বুঝলাম।

উষা শুধু রেডিওতে গান গাইবার সুযোগ পাচ্ছে তাই-ই নয়, মোটা টাকাও পাচ্ছে। এতে মৈত্রমশাই কিংবা মৈত্রমশাইয়ের গিন্নী কারোরই আপত্তি হবার কথা নয়, বরং তারা খুশিই হয়েছেন।

মনে মনে ভাবলাম, একজন মেয়ের ভালো করতে গিয়ে কি তবে তার খারাপই করে ফেললাম ?

শশীভূষণকে সেদিন আর কিছু বললাম না। কিন্তু মনে বড় সন্দেহ রয়ে গেল। আমিই যখন উপলক্ষ ছিলাম, তখন আমারও তো এক্ষেত্রে একটা দায়িত্ব আছে !

পরদিন সকালবেলাই সুনির্মল আমার বাড়িতে এসে হাজির।

তার চোখ-মুখের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম।

বললাম—এ কী চেহারা হয়েছে তোমার সুনির্মল ?

সুনির্মল বললে—ক'দিন ধরে আমার মোটে ঘুম হচ্ছে না দাদা—

বললাম—এরকম করে না ঘুমিয়ে আর কতদিন কাটাবে ?

সুনির্মল বললে—আমার মত ব্যাপার হলে কি আপনিই ঘুমোতে পারতেন ? শুধু ঘুমই বা কেন, খেতেও পারছি না।

—কেন, এরকম পাগলামি করছো কেন ?

সুনির্মল বললে—একে আপনি পাগলামি বলছেন দাদা ? আমি অত কষ্ট করে উষাকে গান শেখালাম, আগে কিছু জানতো না ও, তা জানেন ? হারমোনিয়াম টিপতে জানতো না। গলা বেসুরো বলতো। আমিই গলা সাধিয়ে সাধিয়ে গলার আড় ভাঙিয়েছি। তাল্-কাণা ছিল উষা, আমি নিজে ঠেকা দিয়ে দিয়ে ওকে তাল শিখিয়েছি। এখন কোত্থেকে কারা এসে সব খারাপ করে দিলে। ওই অত সুরেলা গলার কি আর কিছু থাকবে দাদা ? উষার তো সর্বনাশ করে দেবে ওরা দু'জন মিলে।

বললাম—কেন, সর্বনাশ বলছো কেন ? কত টাকা পাচ্ছে উষা, তা জানো ? আগে ব্রডকাস্ট করে পনেরো টাকা পেত, এখন ওরা

হাভেজীকে ধরে-করে পঁয়ত্রিশ টাকা পাইয়ে দিচ্ছে—আর শুনলাম ড্রামা-ডাইরেক্টারকে ধরে ড্রামাতেও গান-টান গাচ্ছে, তাতেও বেশ দু'পয়সা আসছে—

সুনির্মল সব শুনলে। শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো।

তারপর বললে—আপনাকে বুঝি শশীভূষণ এই কথা বুঝিয়েছে। আর টাকাটাই যদি উষার আসল উদ্দেশ্য ছিল, তবে নিজে তো তাহলে আগেই বলতে পারতো, তাহলে আর আমি ওদিকে মাড়াতাম না। আমি কেন এতদিন নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে উষাকে গান শিখিয়ে গেছি। আমি এই এত বছর গান শেখাচ্ছি, আমি তো একটা পয়সাও নিইনি জ্যাঠামশাইয়ের কাছ থেকে। তার কি কোনও দাম নেই? বলুন দাদা, আপনি বিবেচক লোক, আপনিই বলুন!

আমি আর কি বলবো। চুপ করে রইলাম।

সুনির্মল আবার বলতে লাগলো—জানেন দাদা, কাল রেডিও অফিসে আপনার সঙ্গে দেখা করে এসে আর বাড়ি ফিরে গেলাম না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগলাম। ভাবলাম বেঁচে থেকেই বা আর লাভ কী? আর কার জন্যেই বা বাঁচা!

রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে সুনির্মল আবার বলতে লাগলো—শেষকালে যখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল তখন হাঁটতে হাঁটতে আবার এখানে এলাম। বাড়ির সামনে আসতেই উষার গলা কানে এলো। বাইরে জানলার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গানটা শুনতে লাগলাম! ভেতরে ঢুকতে আর প্রবৃত্তি হলো না। কী শুনলুম জানেন? ভৈরবী রাগ একটা গাইছে উষা, তাতে শুদ্ধ ধৈবত লাগাচ্ছে—

কথাটা বলে সুনির্মল ভেবেছিল আমাকে অবাক করে দেবে।

কিন্তু আমি গান সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মতই আনাড়ি। ভালো গান শুনতে ভালো লাগে ওই পর্যন্ত। কেন ভালো কিংবা কেন খারাপ লাগে তা বলতে পারবো না।

বললাম—শুদ্ধ ধৈবত মানে ?

সুনির্মল আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো গানের কূট নিয়মকানুন। রামকেলিতে কোন পর্দাটা বিবাদী, আর কোন পর্দাটা বাদী, আর শুধু রামকেলি কেন, প্রায় সারা সঙ্গীত শাস্ত্রটাই সে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলো।

আমি বললাম—ওসব আমাকে বুঝিয়ে কী হবে! আমি তো ওসব কিছু জানি না।

সুনির্মল বললে—না দাদা, আপনাকে আমি বোঝাচ্ছি না। কিন্তু কী সিরীয়াস ব্যাপার বলুন, সব ভুল শেখালে আমার কষ্ট হয় না! আমার নিজের হাতে গড়া আর্টিস্ট যে ঊষা!

বললাম—ওসব কথা থাক। তারপর তুমি কী করলে ? তুমি সেই জানলার তলায় দাঁড়িয়ে ভুল সুর শুনতে লাগলে ?

সুনির্মল বললে—তা ছাড়া আর কী করবো দাদা, ওই সব ভুল শুনে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে লাগলো!

বললাম—তারপর ?

—তারপর আর কী করবো। অনেক রাত্রে গান শেষ হলো, তখন আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে এলাম! বাড়ি ফিরে গিয়ে রাত্তিরে আর ঘুম এলো না। মা বললেন, কী রে, কিছু খেলিনে কেন ? আমি মাকে আর কী বলবো। বললাম, খিদে নেই। তারপর আবার ভোর হয়েছে, আবার বাড়ি থেকে বেরোলাম। বেরিয়ে আর কোথায় যাবো, আপনিই আমার একমাত্র ভরসা, তাই আপনার কাছেই চলে এলাম।

আমি সুনির্মলকে চা-জলখাবার খেতে দিলাম।

বললাম—খাও তুমি, না খেলে যে অসুখ করবে তোমার। শেষ-কালে কোন্‌দিন রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে থাকবে—

সুনির্মল খেতে লাগলো। আমার কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হলো।

বললে—আপনি দিলেন বলে খাচ্ছি। কিন্তু আপনি ইচ্ছে

করলেই এর একটা বিহিত করতে পারেন দাদা। একটা ভালো আর্টিস্ট এ-রকম খারাপ লোকের হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে, এ তো আর চোখ মেলে দেখা যায় না। আপনি একটা কিছু করুন।

বললাম—আচ্ছা আমি ভেবে দেখি, কী করতে পারি। তুমি যাও। দুদিন পরে এসে কী হয় খবর নিয়ে যেও। এখন অফিসে গিয়ে মনটাকে সুস্থ করো আগে—তোমার ভালোর জন্যেই, আমি বলছি এসব কথা—

সুনির্মল অগত্যা চলে গেল। অর্থাৎ স্তোকবাক্য দিয়ে বুঝিয়ে-সুছিয়ে তাকে বিদায় করলাম শেষ পর্যন্ত।

প্রভাংশু দত্ত বললে—তারপর আমি একবার ভাবলাম মৈত্র-মশাইকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো কী ব্যাপার। আবার ভাবলাম তাঁদের মেয়ের ব্যাপার তাঁরা যা ভালো বুঝেছে তাই-ই করেছে, আমি কেন খামোকা তাদের অপ্রীতিভাজন হই।

শেষ পর্যন্ত সেদিনের মত যাবো-যাবো করেও মৈত্রমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না।

তাছাড়া আমার নিজেরও তো ব্যক্তিগত হাজার সমস্যা আছে।

আর বিশেষ করে দিন-দিন তো মানুষের সমস্যা বেড়েই চলেছে। আমার যা সমস্যা, আমার বাবা-ঠাকুর্দারা ওসব সমস্যা কল্পনাও করতে পারতেন না।

কিন্তু সেদিন যে কী হলো, হঠাৎ জোর করেই মৈত্রমশাইয়ের বাড়িতে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলাম।

একটা ঝি এসে দরজা খুলে দিতেই দেখি মৈত্রমশাই আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

একটা নমস্কার করলাম।

মৈত্রমশাই খুব খুশী।

বললে—এ কী? আপনি? অনেক দিন পরে এলেন। কী খুশিই যে হলাম। এতদিন কোথায় ছিলেন?

—আমি ছুটিতে ছিলাম, তাই কোন খোঁজ-খবর নিতে পারিনি।

মৈত্রমশাই বললেন—আপনি এখন এলেন, খুকু আবার ঠিক এখনই বাইরে বেরিয়েছে। আপনাকে দেখলে খুব খুশি হতো সে।

বললাম—কোথায় গেছে?

মৈত্রমশাই বললেন—কোথায় নাকি গান-বাজনার একটা কন্‌ফারেন্স আছে। আজকাল বড্ড নাম-ডাক হয়েছে খুকুর, জানেন! চারদিক থেকে ডাক আসছে। আর সব্বাই খুব বাহবা দিচ্ছে। একদিন আপনি ওর গান শুনুন। জানেন দত্তবাবু, সেই খুকু আর সে খুকু নেই। সে এখন অনেক ইমপ্রুভ করেছে। এই তো ক'দিন আগে রেডিওতে একটা প্রোগ্রাম ছিল। আপনাদের রেডিও অফিস থেকে শশীভূষণবাবু আর বাহাদুরবাবু এসে রেডিওর গাড়ি করে ওকে তুলে নিয়ে গেলেন।

আমি যেন কিছুই জানি না।

বললাম—শশীভূষণবাবু? তিনি কে?

মৈত্রমশাইও যেন অবাক।

বললেন—সে কী, আপনি শশীভূষণবাবুকে চেনেন না? মস্তবড় গুণী। অমন গুণী বড় একটা দেখা যায় না মশাই। রামকিষেণের ঘরানা তো আগে শুনিনি কখনও। সেদিন শুনে আমারই চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো। আহা, কী গানই গাইছে আজকাল খুকু—

বুঝলাম যা শুনেছিলাম সবই সত্যি।

হঠাৎ বললাম—আর সেই সুনির্মল? সে কেমন আছে?

মৈত্র মশাইয়ের যেন মনে পড়লো না।

খানিক ভেবে নিয়ে বললেন—ও হ্যাঁ, কী জানি, সে তো অনেক দিন ধরেই আর এদিকে আসছে না—

বললাম—আমার কাছে সেদিন সুনির্মল এসেছিল।

মৈত্রমশাই বললেন—তাই নাকি? তাহলে আমাদের বাড়িতে এলো না কেন? ছেলেটা খুব ভালো, সৎ। কিন্তু গান-বাজনাটা তেমন ভালো করে শিখলো না। নইলে ওই কেরানীগিরির চাকরি করে আর পচতে হতো না। আপনাদের রেডিওতেই তো একটা চাকরি পেয়ে যেত।

বললাম—রেডিওর চাকরি কি ভদ্রলোকের চাকরি? নিজেরা তো করছি!

মৈত্রমশাই বললেন—কেন খারাপটা আর কী? এও তো গভর্নমেণ্টের চাকরি—

বললাম—তা ঠিক কিন্তু চাকরি রাখা আমাদের এখানে শক্ত। বড্ড ক্লিক—

মৈত্রমশাই বললেন—তা ওসব ব্যাপার আর কোথায় নেই আজকাল বলুন তো? কিন্তু রেডিওতে চাকরি হলে কত নাম হতো সেটা তো জানেন।

বুঝতে পারলাম সুনির্মল এখন মৈত্রমশাইয়ের বিষ নজরে পড়ে গেছে। এখন এদের কাছে সুনির্মলের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে।

মৈত্রমশাই আবার বলতে লাগলেন—আর আপনাদের রেডিওর শশীবাবুই তো এখন উষার গানের ভার নিয়েছে। সেদিন বলছিল, আগেকার মাস্টার সব ভুল শিখিয়েছে

বললাম—ভুল! সুনির্মল ভুল শিখিয়েছে?

মৈত্রমশাই বললেন—হ্যাঁ দত্তবাবু, তবে আর আপনাকে বলছি

কী? আমি তো তাই শুনেই অবাক। আমরা তো আর গানের কিছু বুঝি না।

আমি অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকালাম।

মৈত্রমশাই আবার বলতে লাগলেন—সেই শুনে আমি একদিন সুনির্মলকে বললাম, তুমি উষাকে ভুল গান শিখিয়েছ—

—তা শুনে সুনির্মল কী বললে?

—কী আবার বলবে দত্তবাবু। আমরা তো গান সম্বন্ধে আনাড়ি, আমরা এ্যাদ্দিন কিছু বুঝতাম না, যা শিখিয়েছে তাই-ই গেয়েছে উষা। এখন বুঝছি কেন এতদিন রেডিওতে চান্স পেতো না খুকু। আমি ভুল করে ভাবতাম বুঝি ওর ভেতরে ঘুষের কারবার চলে—ছি ছি ছি—

বললাম—আমাদের শশীভূষণ? সে আপনাকে ওইসব কথা বলেছে?

মৈত্রমশাই বললেন—শশীভূষণ না বললে আমি জানবো কেমন করে বলুন? আমরা কি গানের কিছু বুঝি?

বললাম—কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে সুনির্মলই ঠিক শিখিয়েছিল, এরা ভুল শেখাচ্ছে।

মৈত্রমশাই বললেন—তাও হতে পারে। আমি তো গানের কিছু বুঝি না। লোকে যা বলছে, তাই-ই বিশ্বাস করছি।

তারপর একটু থেমে বললেন—তা, আপনি তো গান বোঝেন? আপনিই একবার উষার গান শুনুন না—

আমি বললাম—আমিও আপনার মত মৈত্রমশাই, আমি গান-বাজনার কিছুই বুঝি না—

মৈত্রমশাই বললেন—আচ্ছা, আর একটা কথা, উষা যদি ভুলই গাইবে তো এখন রেডিওতে এত চান্স পাচ্ছে কেন? টাকার রেট্ বাড়িয়ে দিলে কেন তাহলে?

এ-কথার উত্তরে অনেক কথাই বলতে হয়। জানাশোনা থাকলে

সেসব জায়গাতেই অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় এই সহজ কথাটাও বলতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু আবার ভাবলাম একবার যখন মৈত্র-মশাইয়ের মন ভেঙে গেছে, তখন আর জোর করে তা জোড়া লাগানো যাবে না।

আমি চলে এলাম। সুনির্মলের জন্যে দুঃখ করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় রইলো না।

পরদিন ছিল আমার ছুটির দিন।

সকালবেলা সুনির্মল আসে না। এই তার প্রথম না আসা। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একলাই বাড়িতে কাটিয়েছি।

বিকেলবেলা রামলীলা ময়দানের দিকে বেড়াতে গিয়েছি, গিয়ে দেখি মাঠের এখানে-ওখানে ছোটখাটো ভিড় জমে আছে। ও-রকম থাকে ওখানে। একটা না একটা উপলক্ষ নিয়ে ওখানে কিছু জমায়েৎ হয়ই।

কিছুক্ষণ রামলীলা ময়দানে পায়চারি করে আবার ফিরতে লাগলাম। হেঁটে হেঁটেই ফিরছি।

হঠাৎ একটা বাড়ির সামনে আসতেই মনে হলো ভেতরে কিছু গান-বাজনা যেন চলছে।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল। সঙ্গীত সম্মেলন! আমাকেও একটা নেমন্তন্নর চিঠি দিয়েছিল উদ্যোক্তরা, পকেটে হাত দিয়ে দেখি কার্ডটা রয়েছে পকেটে।

ভেবেছিলাম একটুখানি বসেই আবার উঠে পড়বো।

বড় বড় নামজাদা গায়ক-গায়িকার গান চলছে। খেয়াল-ঠুংরী। কয়েকটা গান হয়ে গেছে। আরো কিছু গান পরে হবে।

একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, সম্মেলন শেষ হতে প্রায় রাত একটা বাজবে।

আসলে আমার ভালোই লাগছিল না ওস্তাদী গান। ওসব বুঝতে গেলেও তো নিজের কিছু জ্ঞান থাকা দরকার।

উঠে আসছি, হঠাৎ মাইক্রোফোনে কী যেন ঘোষণা হলো। মনে হোল যেন উষা মৈত্রের নামটা শুনলাম। উষা মৈত্র গান গাইবে নাকি?

যা ভেবেছি তাই। দূর থেকে দেখলাম উষা মৈত্র স্টেজের ওপরে এসে বসলো। পাশে বাহাদুরজী তবলা বাঁধতে লাগলো। আর আমাদের শশীভূষণ তানপুরা ধরেছে।

ব্যাপারটা দেখে আর চলে আসতে পারলাম না।

যেখানে বসেছিলাম, আবার সেইখানে বসে পড়লাম। গান শোনার জন্যে বসলাম না, দেখবার জন্যে বসলাম।

আমি যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে স্টেজ অনেক দূর। আমি প্রায় শেষের দিকে বসে আছি।

উষা গান আরম্ভ করে দিলে। প্রথমে আলাপ। প্রায় আধঘণ্টা ধরে আলাপই চললো গানের। তারপর বাহাদুরজীর তবলা চটপট শব্দ করে উঠলো তারপর একপাশ থেকে শশীভূষণ কানে তানপুরা লাগিয়ে একমনে তারে হাত চালিয়ে চলেছে।

পাশে এক ভদ্রলোক বসেছিল।

জিজ্ঞেস করলাম—এ কেমন গাইছে মশাই?

ভদ্রলোক বললে—দাঁড়ান আর খানিকটা শুনি—মনে হচ্ছে হিন্দোল—

এপাশের দিক থেকে তখন একটু একটু গুঞ্জন শুনছি। যেন কারা কথা বলছে। একটু অন্যমনস্ক হয়েছে কিছু কিছু লোক।

পাশের ভদ্রলোককে আবার জিজ্ঞেস করলাম—হ্যাঁ মশাই, কী সুর গাইছে?

ভদ্রলোক বললে—এখনও বুঝতে পারছি না, পুরিয়াও হতে পারে, হিন্দোলও হতে পারে—

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম ভদ্রলোকের কথা শুনে। পুরিয়াও হতে পারে, আবার হিন্দোলও হতে পারে? তার মানেটা কী?

এইটুকু শুধু বুঝতে পারলাম যে গানটা তেমন জমছেনা যেন। আগে যে গায়ক গান গেয়ে গেল, তার গান সবাই মন দিয়ে শুনেছে। তার বেলায় এমন গুঞ্জন ওঠেনি, গোলমালও হয়নি। এক-একজন উঠে যেতে আরম্ভ করেছে।

সব দেখে শুনে আমারই খারাপ লাগছিল।

পাশের ভদ্রলোককে বললাম—কী মশাই, কী বুঝছেন? কেমন লাগছে?

ভদ্রলোক বললে—তেমন জমাতে পারছে না—

—কিন্তু কেন জমাতে পারছে না বলুন তো?

ভদ্রলোক বললে—কী জানেন, এসব আর্টিস্টদের গাছে না উঠতেই এক কাঁদি—

—তার মানে?

আমি কথাটা আরো পরিষ্কার করে বুঝতে চাইলাম।

ভদ্রলোক বললে—অহঙ্কার হলেই আর্টিস্টের পতন হয়! এই ঊষা মৈত্র সবে একটু উঠছিল মশাই, একটু নাম-টাম করছিল! আর উঠতির মুখেই পড়ে গেল—

বললাম—কেন, পড়ে গেল কীসে বলছেন? কী জন্যে?

ভদ্রলোক বললে—ওই যে পোঁড়িদার জুটেছে—

—পোঁড়িদার মানে?

ভদ্রলোক বললে—ওই যে দু'জন দেখছেন, একপাশে একজন তানপুরা বাজাচ্ছে আর একজন তবলা, ওরাই হলো ঊষা মৈত্রর পোঁড়িদার। ওরাই খারাপ করে দিলে মেয়েটাকে। নইলে মেয়েটার মধ্যে পার্টস্ ছিল আগে—

তবু স্পষ্ট হলো না ব্যাপারটা।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু মেয়েটার কী ক্ষতি করছে ওরা?

ভদ্রলোক বোধহয় গান-বাজনার জগতের খবরাখবর রাখে।

বললে—ওই ওদের সঙ্গেই তো দিন-রাত ঘোরাফেরা করে। যেখানে-সেখানে নিয়ে গিয়ে গাওয়ায়। বাপ-মাও আর কিছু বলে না। আর বলবেই বা কেন? টাকাও তো উপায় করছে বেশ!

বুঝলাম সুনির্মল যা বলেছে তা মিথ্যে নয়।

গান তখন বেশ জমে চলেছে। হঠাৎ দূরের একটা কোণ থেকে কী একটা গোলমাল উঠলো। একজন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কী বলছে। আর সবাই একসঙ্গে হৈ-হৈ করে উঠলো।

ভালো করে তখন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

পাশের ভদ্রলোককে বললাম—কী হয়েছে মশাই?

ভদ্রলোক নিজেও তখন কিছু বুঝতে পারছে না।

বললে—আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না—

ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠলো। সারা হলময় একটা তোলপাড় পড়ে গেল। তখন আর গান শোনা যাচ্ছে না। কেবল চিৎকার। শশীভূষণ তানপুরা বাজাচ্ছিল। সে গান চলতে চলতেই তানপুরা ছেড়ে স্টেজ থেকে নেমে পড়ে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল।

আর তারপর এক অদ্ভুত ঘটনা।

এমন ঘটনা কোনও সঙ্গীত-সম্মেলনে আগে ঘটেনি। বেশ হাতাহাতি মারামারি চলছে দেখতে পেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমারই মত শান্তিপ্রিয় লোক কিছু কিছু উঠে পড়লো। গান শুনতে এসে কে আর গণ্ডগোলে পড়তে চায়?

আমিও উঠে পড়লাম।

তারপর কোনও রকমে বাইরে এসে বাঁচি। কিন্তু হলের বাইরে এসে দেখি আর এক কাণ্ড! গেটের কাছে ভিড় জমেছে খুব। খুব বচসা চলছে।

কী হয়েছে দেখতে গিয়ে দেখলাম একজনকে ঘিরে অনেক জটলা চলেছে!

কাছে গিয়ে ভালো করে দেখতে গিয়ে আকাশ থেকে পড়লাম। দেখি আমাদের সুনির্মল! তার চোখ ফুলে গেছে। কেউ যেন ঘুষি মেরে তার ওই দশা করে দিয়েছে!

তাড়াতাড়ি ভিড়ের ভেতরে ঢুকে সুনির্মলের হাতটা ধরলাম।

বললাম—এ কী? সুনির্মল? তোমার এ কী হলো? কে তোমাকে মারলে?

সুনির্মল আমাকে দেখে যেন অকূলে কূল পেলে।

বললে—দাদা, আমি সত্যি কথা বলেছি বলে আমাকে সবাই ধরে মারলে—

বললাম—কী করেছিলে তুমি?

সুনির্মল বললে—ঊষা পুরিয়া রাগ গাইতে গাইতে পঞ্চম লাগিয়েছে দেখে আমি শুধু বলেছিলাম ভুল হচ্ছে—তাইতেই সবাই আমাকে ধরে মারতে এলে—

বললাম—তা তুমি ওসব বলতে গেলে কেন?

সুনির্মল বললে—তা ভুল করলে বলবো না?

বললাম—সকলের সামনে সেটা না বলে গান হয়ে যাবার পর ওদের আড়ালে ডেকে বলতে পারতে? সকলের সামনে আসরের মধ্যে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললে কেন? তোমার একটা আক্কেল নেই?

অনেক কথা বলতে লাগলাম সুনির্মলকে। অনেকক্ষণ ধরে বোঝাতে লাগলাম।

বললাম—দেখছো অনেক লোক, অনেক বড় বড় লোক গান

শুনতে এসেছে, তাদের সামনে শশীভূষণদের অপমান করতে হয়? পরে বললে চলতো না?

সুনির্মলের কপাল-চোখ-মুখ তখন বেশ ফুলে গেছে।

বললে—কিন্তু ওরা যে ওকে ভুল শিখিয়েছে দাদা, পুরিয়া রাগে কখনও পঞ্চম লাগায় কেউ? এ সুরে তো পঞ্চম বর্জিত।

আমি বললাম—পঞ্চম লাগাক আর রেখাব লাগাক, তাতে তোমার কী?

—কিন্তু দাদা, আমি অত কষ্ট করে যে ওকে শেখালাম, তার কোন দাম নেই?

বললাম—মনে করে নাও না, ঊষা মৈত্রর সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই, ওকে তুমি চেনো না—

—কিন্তু তা কী করে মনে করি দাদা?

—তাহলে তুমি এখানে এলে কেন? না এলে তো আর ভুল সুর শুনতে হতো না। না এলেই তো ল্যাটা চুকে যেত।

সুনির্মল বললে—প্রথমে আমি তো তাই-ই ভেবেছিলাম যে আসবো না—

—না এলে আর এ-কাণ্ড ঘটতো না।

সুনির্মল বললে—এই হলের গেটের কাছে এসে ভেবেছিলাম দূরে থাকবো। ভেতরে ঢুকবো না—

- -তাহলে ঢুকতে গেলে কেন?

সুনির্মল বললে—একবার যে বড় শুনতে ইচ্ছে হলো কী-রকম গান শিখেছে ঊষা, শুনি—

বললাম—তোমার কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে দেখছি—

সুনির্মল বললে—তা তো আমি বুঝতেই পারছি দাদা, নইলে কিছু না বলে আমার চুপ করে থাকলেই হতো। কেন যে আমি চেঁচাতে গেলাম—

সুনির্মলকে নিয়ে একটা ডাক্তারখানায় গেলাম। সেখানে ওষুধ

দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়ে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম একটা ট্যাক্সি ডেকে—

বললাম—একটু ভালো হলেই আমি তোমাকে নিয়ে যাবো মৈত্রমশাইয়ের কাছে, তুমি এখন বাড়ি যাও—

কিন্তু পরদিনই সন্ধ্যেবেলা সুনির্মল এসে হাজির।

আমি অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি সুনির্মল আমার বাইরের ঘরে বসে আছে।

বললাম—কী হলো তোমার? আবার এরই মধ্যে বেরোলে কেন?

তখনও মাথায় তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে।

বললে—ওই যে আপনি কাল বললেন আমাকে নিয়ে উঁদের বাড়ি যাবেন?

—তা আমি কি বলেছি আজই যাবো? একটু সেরে উঠলে তখনই না হয় যেতে!

সুনির্মল বললে—না দাদা, জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করা ভালো। ওঁরা অন্তত আমাকে দেখে বুঝবেন শশীভূষণরা কী-রকম খারাপ লোক!

বললাম—তা তুমি কি মনে করো তোমার ওই ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথা দেখলে মৈত্রমশাইয়ের দয়া হবে তোমার ওপর? বরং তোমাকেই ধমকাবেন। বলবেন, তুমি ওসবের মধ্যে যাও কেন? তখন কী জবাব দেবে?

সুনির্মল বললেন—না দাদা, আপনি একবার আমাকে ওদের

বাড়িতে নিয়ে চলুন না—সামনাসামনি গিয়ে অন্তত দুটো কথা তো বলতে পারবো।

সুনির্মলের অবস্থা দেখে আমার দয়া হলো।

বললাম—আচ্ছা চলো—কিন্তু ওরা কি এখন আসবে?

—কারা?

—ওই শশীভূষণ আর বাহাদুরজী।

সুনির্মল বললে—ওরা তো দাদা রোজ সাড়ে সাতটার সময় ওখানে আসে।

বললাম—কোথাও গান-বাজনার ব্যাপার নেই তো আজ?

সুনির্মল বললে—না, সে আছে পনেরো তারিখে—

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—আচ্ছা তুমি এত খবর রাখো কী করে বলো তো সুনির্মল? ওরা কবে কোথায় গান গাইবে—সব যে দেখছি তোমার নখদর্পণে!

সুনির্মল বললে—ওইটেই তো আমার দোষ। আমি কিছুতেই যে ভুলতে পারছি না—

—কী জন্যে খোঁজ রাখো বলো তো? খোঁজ রেখেই বা তোমার কী লাভ হয়?

সুনির্মলের মুখটা যেন বিষণ্ণ দেখালো।

বললে—উষার নাম খারাপ হলে যে আমার মনে লাগে। এত কষ্ট করে ওকে গান শিখিয়েছি, আমার হাতে গড়া ছাত্রীকে ওরা এমন করে নষ্ট করে দিলে, মনে লাগবে না?

বললাম—তোমার আর গতি হবে না সুনির্মল। পৃথিবীর এত মেয়ে থাকতে তুমি সেই একজনকেই আঁকড়ে ধরে পড়ে আছো! ও তোমাকে ভুলে গেছে কবে, তোমার কথা ও একবার ভাবেও না, আর তুমি কিনা এখনও উষা-উষা করে ভেবে মরছো—

সুনির্মল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

বললে—আমিও তাই এক-এক সময় ভাবি, আমার কপালে বোধহয় অনেক দুঃখ আছে—

তারপর বললে—অথচ দেখুন, আমার তো আর পাঁচটা ছাত্রও নেই, দশটা ছাত্রীও নেই! ওই একটিই মাত্র। ও চলে গেলে আমার থাকে কী?

সুনির্মলকে এতদিন ধরে দেখে আসছি, আমি তার কোনও অপরাধ দেখতে পাইনি। হয়তো সে একটু অবিবেচনার কাজ করে ফেলেছে, হয়তো একটু অশোভন ব্যবহার করছে। যেভাবে ব্যবহার করলে জিনিসটা ঠিক সঙ্গত হতো, তা করেনি। কিন্তু তা হলেও তার পক্ষেও অনেক কথা ভাবার আছে!

সে যে এতদিন উষা মৈত্রকে গান শিখিয়ে এসেছে, তাতে তো তার কোনও স্বার্থই ছিল না। সে টাকা নেয়নি, পয়সা নেয়নি। এমন কি প্রতিদিন নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে বাস ভাড়া দিয়ে উষাকে গান শেখাতে এসেছে।

তারপর কতদিন ধরে রেডিওতে যাতে উষার গানের ব্রডকাস্টিং হয় তার চেষ্টা করেছে। যাকে ধরলে রেডিওতে উষার গান গাওয়া সম্ভব হয়, তাকে ধরেছে। অর্থাৎ উষার প্রতিষ্ঠার জন্যে একজন লোকের দ্বারা যা কিছু করা সম্ভব তাই-ই সুনির্মল করে এসেছে।

তবু আজ যখন উষার সবে একটু নাম হয়েছে তখন কোথা থেকে কারা এসে তার সমস্ত পরিশ্রম, সমস্ত সাধনা পণ্ড করে দিলে। এতে মানুষ মাত্রেরই কষ্ট হবার কথা, দুঃখ পাবার কথা।

সুতরাং সুনির্মলকে তো আমি খুব বেশি দোষ দিতে পারি না।

তাই সেদিন আমি সুনির্মলকে নিয়ে মৈত্রমশাইয়ের বাড়িতেই গেলাম।

সুনির্মল আমার পেছনেই ছিল।

মৈত্রমশাই তাকে দেখেই বললেন—ও কে? সুনির্মল নাকি? কী হলো? তুমি এতদিন আসোনি কেন হে? তোমার কপালে কী হলো?

সুনির্মল একথার কোনও উত্তর দিলে না। মাথা নিচু করে চুপ হয়ে রইলো।

উত্তরটা তার হয়ে আমিই দিলাম।

বললাম—আপনাদের শশীভূষণ আর বাহাদুরজী ওকে মেরেছে। সেই দেখাতেই আমি ওকে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে, ও আসতে চাইছিল না—

মৈত্রমশাই বললেন—মেরেছে? শশীভূষণবাবু আর বাহাদুরজী মেরেছে? কিন্তু তারা হঠাৎ সুনির্মলকে মারতে গেল কেন?

আমি সব ঘটনাটা খুলে বললাম। মৈত্রমশাই চুপ করে সমস্তটা শুনলেন।

তারপর বললেন—তা এ-ব্যাপারে আমি কী করতে পারি?

বললাম—আপনি সব করতে পারেন। আপনি শশীভূষণ আর বাহাদুরজীকে বলতে পারেন।

মৈত্রমশাই বললেন—তা আমি বলতে পারি। কিন্তু সুনির্মলই বা ওদের সঙ্গে লাগতে যায় কেন? ওর কীসের মাথাব্যথা?

বললাম—দেখুন, উষারই দোষ। উষাই বা ওদের কিছু বলে না কেন?

আর ঠিক সেই সময়েই এসে উষা মৈত্র এসে ঘরে ঢুকলো। ঢুকে আমাদের দেখে প্রথমটায় অবাক হয়ে গেল।

তারপর একটু সামলে নিয়ে বললে—দাদা, আপনি?

তারপর সুনির্মলের দিকে ফিরে বললে—কী হলো? তোমার মুখ এত ফুলে গেছে? ওষুধ-টষুধ লাগিয়েছিলে?

সুনির্মল কিছু জবাব দিলে না সে-কথার।

বললাম—তুমি কী বলো তো উষা? তোমার সামনে সুনির্মলকে দু'জনে মিলে মারলে, আর তুমি কিছু বলতে পারলে না? দেখ তো, কী রকম করে মেরেছে একে? দেখো—

উষা বললে—কিন্তু শশীদারও তো মান-অপমান জ্ঞান আছে? সকলের সামনে সুনির্মলদা ওঁকে অমন করে বলতে গেলই বা কেন?

সুনির্মল এতক্ষণে কথা বললে। বললে—তুমি পুরিয়া রাগে পঞ্চম দিচ্ছিলে না? পুরিয়াতে কখনও পঞ্চম লাগে? আমি তোমাকে কী শিখিয়েছিলাম?

উষা বললে—আমি কখন পঞ্চম লাগালাম? শশীদা আমাকে যেমন ভাবে শিখিয়েছেন, তেমনি ভাবেই তো গেয়েছি। আমার কী দোষ?

—তা আমি যেমন ভাবে শিখিয়েছি, তেমনি ভাবে গাও না কেন?

—বা রে বা! শশীদা যে রামকিষেণের ঘরানার লোক।

—তা আমি তোমাকে এতদিন ভুল শিখিয়েছি বলতে চাও?

উষা বললে—না, তা তো আমি বলিনি—

—তাহলে তুমি ওদের কথাই শুনবে? আমার কথা শুনবে না?

মৈত্রমশাই এতক্ষণে কথার মধ্যে কথা বললেন।

বললেন—তোমাকেও একটা কথা বলি বাপু সুনির্মল, কিছু মনে করো না। শশীভূষণবাবুরা এখন উষাকে ঘন ঘন রেডিওতে গাইবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। চারিদিক থেকে এখন ওর একটু ডাকটাক আসছে। রেডিওতে আগে পনেরো টাকা পেত, এখন পাচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাকা। সব তো শশীভূষণবাবুই করে দিয়েছেন। এই তুমি তো এতদিন ধরে রেডিও অফিসে ঘোরাফেরা করছো, তুমি তো কিছুই করতে পারোনি এতদিন? আর যখন উষার নাম-ধাম হয়েছে, ওমনি তুমি এসে বাগড়া দিচ্ছো? তোমার তো বাবা একটু বোঝা

উচিত! উষার যাতে ভালো হয়, সেইটাই তো তোমার দেখা উচিত—

সুনির্মল বললে—আমি উষার ভালো চাই না? আপনি এসব কী বলছেন?

—তা ভালো চাইলে এই ঝগড়া মারামারিটা হচ্ছে কেন?

সুনির্মল বললে—কিন্তু আমি তো ঝগড়া করতে যাইনি। ঝগড়া তো ওরাই করলো—

উষা এতক্ষণে বললে—কে বললে? ঝগড়া তো তুমিই প্রথমে করলে সুনির্মলদা! ওরা তো কিছুই বলেনি, ওরা তো আমার পাশে বসে তানপুরা আর তবলা বাজাচ্ছিল এক মনে।

মৈত্রমশাই কিছু বুঝতে পারছিলেন না কী করবেন।

আমি বললাম—আপনি নিজে বলুন মৈত্রমশাই, আপনি কী চান?

মৈত্রমশাই বললেন—আমি কী চাই মানে?

বললাম—আপনি জানেন কি-না জানি না কিন্তু আমার বলা কর্তব্য বলেই বলছি, এ-ব্যাপার যেমন ভাবে গড়াচ্ছে তাতে আপনার হাতেই ব্যাপারটা তুলে নেওয়া উচিত। বেশি দেরি করলে ব্যাপারটা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠতে পারে—

কী সঙ্গীন হবে?

—চারদিকে যে রকম বদনাম শুরু হয়েছে উষার, তাতে আর দেরি করলে ফল খারাপ হবে বলে আমার ধারণা।

মৈত্রমশাই বললেন—আমার মেয়ের বদনাম দিচ্ছে? কিন্তু কই, আমি শুনিনি তো।

—আপনি শোনেননি, কিন্তু আমি শুনেছি। আমি সেদিন ওই গানের আসরে হাজির ছিলাম। আশেপাশের লোক যেসব মন্তব্য করছিল, তাতে তাই-ই প্রমাণ হয়।

কী মন্তব্য করছিল?

—সেসব আপনি নাই-ই বা শুনলেন। একদিন আপনি আমার বাড়িতে এসে নিজে আপনার মেয়ের গান শোনার জন্যে অনুরোধ করছিললেন, সেইজন্যেই বলছি—

এতক্ষণ উষা চুপ করেই ছিল। এবার কথার মাঝখানে বলে উঠলো—কী বদনাম দিচ্ছে বলুন আপনি, আমি তা শুনতে চাই—

—তোমার সেসব না শোনাই উচিত!

—কেন না-শোনা উচিত? আমি শুনতে চাই আমার সম্বন্ধে লোকে কী বলছে?

কিন্তু সেকথা তোমার কি শুনতে ভালো লাগবে?

—তাহলে সবাই আমার নিন্দে করছে বলুন?

বললাম—নিন্দে বলেই তোমাকে বলতে পারছি না।

উষা বললে—কিন্তু কিসের নিন্দে! আমি কী করেছি তাদের?

—তা জানি না। তবে যেটুকু শুনেছি তাতে আমার মনেও কিছু কষ্ট হয়েছে। আমি কষ্ট পেয়েছি বলেই তোমাকে তা বলে কষ্ট দিতে চাই না। তোমার বাবাকে আমি আড়ালে সব বলবো।

বলে মৈত্রমশাইকে লক্ষ্য করে বললাম—চলুন পাশের ঘরে, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে—

এমন সময় হঠাৎ ঘরে ঢুকলো শশীভূষণ আর বাহাদুরজী। আমাকে দেখে তারা একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। তারপর সুনির্মলকে ওই অবস্থায় দেখে আরো অবাক হয়ে গেল।

শশীভূষণ বললে—কী হলো দত্তবাবু, আপনি?

আমি বললাম—আমার সঙ্গে মৈত্রমশায়ের জানাশোনা আছে, তা তুমি জানতে না?

শশীভূষণ বললে—তা তো জানতাম, কিন্তু এতদিন তো দেখিনি।

বললাম—এতদিন দরকার হয়নি তাই আসিনি।

শশীভূষণ বললে—আমাদের সম্বন্ধে কিছু কথা হচ্ছিল নাকি?

বললাম—হ্যাঁ—

—তাহলে আমরা আসতে বাধা পড়লো বোধহয়?

বললাম—না, আমরা অন্য ঘরে গিয়ে কথা বলছি, তোমরা বসো—

শশীভূষণ বললে—তাহলে সেদিনকার সেই গানের আসরের কাণ্ড নিয়েই কথা বলছেন বোধ হয়? কিন্তু এঁকেই জিজ্ঞেস করুন না, দোষ আমাদের, না এঁর!

সুনির্মল হঠাৎ কথা বলে উঠলো।

বললে—তবু বলছেন আমার দোষ? আপনারা পুরিয়া রাগে পঞ্চম লাগাচ্ছেন, তবু বলবেন···জানেন না যে পুরিয়াতে পঞ্চম বর্জিত···

শশীভূষণ বললে—আপনি নিজে শুনেছেন পঞ্চম লাগিয়েছে উষা?

—আমি নিজে না শুনে কি বলেছি? আপনারা তো বরাবর ভুল শেখাচ্ছেন উষাকে। আমি এতদিন ধরে ধরে যা-কিছু শিখিয়েছি সব উল্‌টে দিয়েছেন। তাতে আমার মনে কষ্ট হয় না? আমার নিজের হাতে গড়া ছাত্রীকে আপনারা নষ্ট করে দিলেন?

শশীভূষণ রেগে গেল। বললে আপনি গানের কী বোঝেন? আপনি কার কাছে রাগ রাগিণী শিখেছেন? কোন্ ঘরানা?

সুনির্মল বললে—আমার গুরু ওস্তাদ বাদশা খাঁ। তাহলে বলতে চান বাদশা খাঁ গান-বাজনা ভুল শেখান?

—রেখে দিন আপনার বাদশা খাঁ। ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁ আমার ওস্তাদজী। তার চেয়ে তো বাদশা খাঁ বড় নয়?

উষা শশীভূষণের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে—থামুন শশীদা, বাড়ির ভেতরে এসব কেলেঙ্কারি করবেন না—

—তা আমি কেলেঙ্কারি করছি, না তোমার উনি করছেন, ওই সুনির্মলবাবু—

সুনির্মল আর পারলে না। মৈত্রমশাইয়ের দিকে চেয়ে বললে—

আপনার বাড়ীর ভেতরে ঢুকে এরা আমাকে অপমান করবে? এদের এতদূর সাহস?

আমি ধমক দিলাম সুনির্মলকে।

বললাম—তুমি থামো তো সুনির্মল। তুমি কোনো কথা বলো না—

—কিন্তু দাদা, আমি তো কোনো কথা বলিনি প্রথমে, ওরাই তো আমার সঙ্গে কথা বলছে। ওরাই তো আমার ওস্তাদজীর নামে বদনাম দিচ্ছে—

শশীভূষণ বললে—তা নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেব যে বাদশা খাঁর চেয়ে বড় ওস্তাদ এ তো সবাই জানে!

—রাখুন! বাদশা খাঁর বাঁ-পায়ের কড়ে আঙুলের যোগ্য নয় নাসিরুদ্দিন খাঁ!

বলতেই শশীভূষণ আর বাহাদুরজী সুনির্মলের দিকে এগিয়ে এলো।

উষা তাড়াতাড়ি দু'জনকে সামলে নিয়ে বললে—এ কী শশীদা, তোমরা কি মারামারি করবে নাকি!

আমিও সুনির্মলকে ধমকালাম।

বললাম—ওরা যা ইচ্ছে বলুক, তুমি চুপ করে থাকতে পারো না?

সুনির্মল চুপ করে রইলো আমার কথা শুনে। আমি মৈত্র-মশাইকে নিযে পাশের ঘরে গেলাম।

ঘরের ভেতরে গিয়ে মৈত্রমশাইকে বললাম—আপনি এর একটা বিহিত করুন মৈত্রমশাই! যা কাণ্ড ঘটেছে তাতে কিন্তু শেষকালে আপনার উষার বিয়ের সময় গণ্ডগোল বাধবে। বিয়ে তো একদিন দিতেই হবে উষার—

মৈত্রমশাই বললেন—দাঁড়ান, আমি একবার আমার গৃহিনীকে ডেকে নিয়ে আসি মশাই—

মৈত্র-গিন্নী বোধহয় পাশের ঘরের পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সমস্তই শুনছিলেন।

তিনি আসতেই আমি প্রণাম করলাম।

বললাম—আমি উষার বিয়ের কথা বলছিলাম মৈত্রমশাইকে।

মৈত্র গিন্নি বললেন—উষার পাত্র তো ঠিক করাই আছে। তাঁরা তো উষাকে দেখে পছন্দও করে গেছেন। কিন্তু পাত্রটি অফিসের একটা পরীক্ষা দিতে দেরাদুনে গেছে, ছ'মাস পরে পরীক্ষায় পাশ করলেই এখানে গেজেটেড অফিসার হয়ে যাবে—তখন বিয়ে করবে সে—

বললাম—সে তো খুবই সুসংবাদ, কিন্তু এই ছ'টা মাসের মধ্যে যদি কিছু গোলমাল হয়ে যায়, তখন কী করবেন?

—কী গোলমাল হবে?

—গোলমাল তো হবেই! এখনই হচ্ছে। আমি সেদিন হঠাৎ ঢুকে পড়েছিলুম ওই গানের মজলিসে, গিয়ে আশেপাশের লোকেদের মুখে যেসব মন্তব্য শুনলাম, তাতে তো ভয় লেগে গেল আমার। সেসব বড় কুৎসিত মন্তব্য। কী মন্তব্য আমি তা বলতে চাই না আপনাদের, আমি সেসব উচ্চারণও করতে চাই না—

মৈত্র-গিন্নী বললেন—তা সে তো সমস্ত সুনির্মলের জন্যে। ও-ই সব চারদিকে উষার নামে যা-তা বলে বেড়াচ্ছে। সেইজন্যেই তো আর-এ বাড়িতে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছি—

বললাম—সুনির্মলকে তাহলে আপনারা চিনতেই পারেননি—

মৈত্রমশাই বললেন—তাহলে সুনির্মল উষার নামে চারদিকে এত নিন্দে করে বেড়াচ্ছে কেন? ওর মত ছেলের কি এটা উচিত হচ্ছে।

আমি তখন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। তিনি সমস্ত শুনলেন মন দিয়ে।

শেষে বললেন—তাহলে এর মীমাংসা কিসে হবে।

বললাম—এক কাজ করুন। আপনারা শংকরলালের নাম শুনেছেন? সেও গান-টান খুব বোঝে। সে ভদ্র-বংশের ছেলে। সে যদি মীমাংসা করে দেয় তাহলে কী আপনার কিছু আপত্তি আছে? সে বলুক যে, শশীভূষণ ভুল, না সুনির্মল ভুল। তার কথা যদি দু'জনে মেনে নেয়, তাহলে সব গোলমালই মিটে গেল?

মৈত্রমশাই বললেন—তার মীমাংসা কী ওরা মেনে নেবে?

—সেটা ওরাই বলুক। ওদের ওপরেই ছেড়ে দিন না।

তা সেই ব্যবস্থাই হলো। বাইরে এসে সবাইকে কথাটা বললেন মৈত্রমশাই। আমিও বললাম। সুনির্মল রাজী হলো। শশীভূষণ বাহাদুরজী সবাই রাজী হলো। শংকরলালকে সবাই সমীহ করে। শংকরলাল রেডিও অফিসে সুর দেয়। মানুষটি ভালো। কোনও সাতে-পাঁচে থাকে না। বসে শুধু সুর লাগায়। সুর-পাগলা লোক বলে সবাই তাকে ভালবাসে। সে যদি বলে শশীভূষণরা উষাকে ভুল শিখিয়েছে, তাহলে সেই রায়ই মেনে নিতে হবে।

শশীভূষণ বললে—ঠিক আছে, আপনি যা বলছেন দত্তবাবু, তাইতেই রাজী—

সুনির্মল বললে—আমিও রাজী—বাদশা খাঁ সাহেবের কাছে নাড়া বেঁধেছি—

উষা কিছু কথা বললে না, তবে তার মুখ দেখে মনে হলো সে রাজী।

আর তা ছাড়া মাত্র ছ'মাসের তো ব্যাপার। ছ'মাস পরে তো বিয়েই হয়ে যাচ্ছে উষার।

তা সেইদিনই গেলাম শংকরলালের বাড়িতে। ছেলেটা দিনরাত

গান-বাজনা নিয়েই থাকে। ব্যাচিলার মানুষ। সারা ঘরখানা বই আর বাজনার যন্ত্রে ভর্তি।

আমার প্রস্তাব শুনে শংকরলাল বললে—আমাকে আবার ওর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন দাদা?

বললাম—তোমাকে জড়াচ্ছি না। তুমি শুধু শুনবে। শুনে বলবে ভুল সুর হয়েছে না ঠিক সুর। যদি ভুল হয় তো শশী-ভূষণরা উষাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় আর ঢুকবে না কথা দিয়েছে। তখন আবার ওরা সুনির্মলকে ঢুকতে দেবে। তুমি যে রায় দেবে দু'পক্ষই তা মেনে নেবে।

শংকরলাল কাশ্মীরী বামুন। বাপ-মা-ভাই-বোন কেউ নেই। আছে শুধু তার সুর।

বললে—আমার যে এখন অনেকগুলো কাজ হাতে রয়েছে দাদা—

বললাম—এতে আর কতটুকু সময় লাগবে তোমার?

শংকরলাল বললে—কী যে বলেন? এ কী একদিনের কাজ? একদিন শুনলে কি বুঝতে পারবো কিছু? অনেকবার শুনলে তবে মালুম হবে।

—বেশ তো, তোমার যতদিন সুবিধে হয় শুনবে।

শংকরলালকে কিছুতেই রাজী করানো যায় না। অনেক টাল-বাহানা করে শেষে রাজী করালাম।

শেষে বললে—ঠিক আছে, আমি যাব। কিন্তু একটা কথা—

বললাম—কী কথা?

—আমি যখন গান শুনবো, সেখানে শশীভূষণও থাকতে পারবে না, সুনির্মলও থাকবে না। আমিও কারোর সামনে থেকে গান শুনবো না—

তা তাতে মৈত্রমশাইয়ের কোনও আপত্তি ছিল না।

সুনির্মল এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলে—কী হলো দাদা? শংকরলাল রাজী হয়েছেন

বললাম—হয়েছে, অনেক বলবার পর রাজী করিয়েছি, কিন্তু শংকরলাল যখন বিচার করবে, তোমরা সেখানে কেউ থাকতে পারবে না।

বললাম—তারপর ?

প্রভাংশু দত্ত বললে—তারপর সেই শংকরলালকে নিয়ে গেলাম মৈত্রমশাইয়ের বাড়িতে।

বেশ খাতির করে বসালেন মৈত্রমশাই।

আর খাতির করে বসাবার মত লোকই বটে শংকরলাল।

শংকরলাল বিনয় করে বললে—দেখুন, আমাকে দিয়ে কেন এই অপ্রিয় কাজটা করাচ্ছেন ? আমি মাঝখান থেকে অপ্রিয় হবো দু'পক্ষেরই। দুজনের মধ্যে একজনের বিপক্ষে তো আমাকে বলতেই হবে।

মৈত্রমশাই বললেন—একটু কষ্ট আপনাকে করতেই হবে। নইলে আমরা তো গানের কিছুই বুঝি না—

শশীভূষণ ছিল সেখানে।

শংকরলালকে সেও খুব শ্রদ্ধা করে আমি জানতাম।

সে বললে—আপনি যা বলবেন আমি অন্তত তাই-ই মেনে নেবো—

সুনির্মলও ছিল সেখানে। সেও বলল—আমিও মেনে নেবো শংকরলালজী। আমি যদি কিছু ভুল শিখিয়ে থাকি তো সে আমার দোষ নয়। আমাকে আমার গুরুজী বাদশা খাঁ সাহেব যা শিখিয়েছেন তাই শিখেছি—

শশীভূষণ বললে—ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেব আমার গুরু। তিনি যদি ভুল শিখিয়ে থাকেন তো আমিও নাচার।

সেদিন সকলেরই মন খুব খুশি। মৈত্রমশাইয়ের বাড়িতে সেদিন সবাই মিলে চা-সিঙাড়া জলযোগ করলাম। সবাইকেই বেশ খুশি-খুশি দেখালো।

উষা হঠাৎ শংকরলালকে জিজ্ঞেস করলে।

বললে—আচ্ছা শংকরলালজী, পুরিয়াতে শুদ্ধ নিখাদ লাগে, না কোমল নিখাদ লাগে?

শংকরলাল বললে—দেখ, একটা কথা তোমাকে বলে দেওয়া ভালো, সঙ্গীতশাস্ত্র তো বিজ্ঞান নয়, আর্ট। আর্টেরও একটা লাইন আছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের মত সেটা অত রিজিড নয়। এসব জিনিস তোমার গান না শুনে বলা যাবে না—

সুনির্মল আড়ষ্ট হয়ে উঠলো।

বললে—সুরের তাহলে আইন-কানুন নেই বলতে চান?

শংকরলাল বললে—আইন-কানুন নেই কে বলেছে? আইন আছে বৈকি। আর সেই আইনটা নিয়েই তো যত কিছু ঝগড়া। কিন্তু…

বলে শংকরলাল চায়ে চুমুক দিলে।

তারপর বললে—কিন্তু কথাটা হচ্ছে সে আইন কাদের জন্যে?

সুনির্মল বললে—সকলের জন্যে।

শংকরলাল বললে—না—

আমি বললাম—এসব তর্ক এখন থাক না শংকরলাল। আগে তুমি উষার গানটা শোন।

শংকরলাল বললে—হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো আমি এসব কথা এখন তুলতে চাইনি। আমি আগে গান শুনবো, তারপর আমার জাজ-মেণ্ট দেবো। এখন আমি কারোর কথাই শুনবো না—

জিজ্ঞেস করলাম—তাহলে কবে থেকে উষার গান তুমি শুনতে আরম্ভ করবে ?

শংকরলাল খানিক মনে মনে হিসেব করে বললে—আসছে মাসের সাত তারিখে আমি একটু হালকা হচ্ছি—তারপর থেকে আমি সাতদিন পর-পর শুনবো।

শশীভূষণ বললে—ঠিক আছে—

মৈত্রমশাইও বললেন—তাই ঠিক রইলো। আপনি আসবেন, এসে আমার চাকর থাকুক বা আমিই থাকি, দরজা খুলে দেবো।

সুনির্মল বললে—কিন্তু এই পনেরো দিন! এই পনেরো দিন কী হবে ?

শংকরলাল বললে—এই পনেরো দিন আপনাদের রেওয়াজ গান-বাজনা বন্ধ রাখতে কিছু আপত্তি আছে ?

মৈত্রমশাই বললেন—না, আপত্তি কীসের! উষা না-হয় এ পনেরো দিন গাইবে না।

শংকরলাল বললে—না গাওয়াই উচিত।

মৈত্রমশাই বললেন—তা বেশ, গাইবে না। পনেরো দিন না গাইলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে!

তা তাই-ই ঠিক রইলো।

সেদিন ওই পর্যন্তই হয়ে গেল। আমরা যে যার বাড়ি চলে এলাম।

গুরু দত্ত শুনে হাসতে লাগলো।

বললে—তাই নাকি? এই সব কাজ করেছে শংকরলাল?

আমি এতদিন ধরে শংকরলালকে দিয়ে মিউজিক করাচ্ছি, এসব ব্যাপার তো জানতাম না। তা তারপর ?

বললাম—আপনি জানতেন যে, শংকরলাল একদিন রেডিওতে চাকরি করেছিল ?

—তা আমাকে বলেছে, কিন্তু এ-গল্প বলেনি।

বললাম—এ গল্প বলবার নয় বলেই বলেনি।

—কেন, বলবার নয় কেন ?

বললাম—সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। আমি তো নিজের চোখে শংকরলালকে আগে দেখিনি। প্রভাংশু দত্তর কাছে শুনেছিলাম। প্রভাংশু দত্ত আমাকে বলেছিল, আপনি তো বোম্বে যাচ্ছেন, ওখানে গেলে শংকরলালের সঙ্গে দেখা করবেন। শংকরলাল আমার খুব চেনা লোক, আমার নাম করবেন তার কাছে।

—কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ডটা কী করলো শংকরলাল ?

বললাম—শংকরলাল নিজে পাঞ্জাবি হলে কী হবে শংকরলালের বৌ বাঙালী, এটা জানেন আপনি ?

গুরু দত্ত বললে—তা জানি। ওর বৌকে কত দেখেছি, আমার বাড়িতে এসে কতবার ডিনার খেয়ে গেছে—

বললাম—তার নামই তো উষা মৈত্র।

—তাই নাকি ?

গুরু দত্ত হাসতে হাসতে আকাশ থেকে পড়লো যেন।

বললে—তা জানতাম না তো।

বললাম—ওই-ই তো। ওই শংকরলাল রোজ উষার গান শুনতো একটা ঘরের দরজা বন্ধ করে। কাউকে ঢুকতে দিত না সে-ঘরে। সে বিচার করে দেখতো উষা ভুল শিখেছে না ঠিক শিখেছে—

ঠিক সন্ধ্যে সাতটার সময় আসতো শংকরলাল, আর রাত ন'টার সময় চলে যেত।

মৈত্রমশাই জিজ্ঞেস করতেন—কী বুঝছেন শংকরলালজী ?

শংকরলাল বলতো—শুনছি গান, তবে আরো কিছুদিন সময় লাগবে—

এমনি করে মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন আর উষাকে পাওয়া গেল না। শংকরলালও তার চাকরি ছেড়ে দিয়ে যে কোথায় উধাও হয়ে গেল টের পেলে না কেউ।

আর ঠিক তারপরে বোম্বের এই সিনেমাওয়ার্লডে একদিন শংকরলালের খুব নাম হয়ে গেল। লাখ লাখ টাকা উপায় করতে লাগলো। গাড়ি বাড়ি সব হলো। প্রথম দিকে মৈত্রমশাই আর মৈত্র-গিন্নী খুব চটে গিয়েছিলেন। জামাইয়ের নামে মামলা করবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এখন তো জামাইয়ের বাড়িতে এসেই দু'জনে উঠেছেন।

—আর সেই সুনির্মল আর শশীভূষণ? তারা কোথায়?

বললাম—তারা সেই এখনও দিল্লীতে আছে। সুনির্মল এখনও দিল্লী সেক্রেটারিয়েটে বি-গ্রেড ক্লার্ক, আর বাহাদুরজী এখনও দিল্লী রেডিও স্টেশনে তবলা বাজায়, আর শশীভূষণ সেতার।

গুরু দত্ত বললে—কিন্তু শংকরলালের বৌ তো আর গান গায় না!

বললাম—তার আর গান গেয়ে কী হবে! গান গেয়ে যা হতো, তার চেয়ে তো অনেক বেশিই হয়েছে। সেই দেরাদুন থেকে পাশ করা গেজেটেড অফিসারের সঙ্গে বিয়ে হলেই-বা এমন কী হতো। এত সুখ তো পেতো না। এখন লণ্ডন যাচ্ছে, প্যারিস যাচ্ছে, টোকিও যাচ্ছে, বার্লিন যাচ্ছে। ফিল্ম-ফেস্টিভ্যালের কল্যাণে এ-যুগে আপনারাই তো এখন ভি-আই-পি।

ততক্ষণে গাড়িটা গুরু দত্তর পালি হিলের বাড়ির কাছে এসে গিয়েছে।

তাই তো বলছিলাম আমরা কি সবাই অভিনেতা? এই আমরা যারা এ-সংসারে বাস করছি। এক-এক সময় ভাবি আমরা তো সব সময় অভিনয় করেই চলেছি।

কিন্তু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা আমাদের স্বরূপ প্রকাশ করেছি কতটুকু? কতটুকু নিজেকে জেনেছি আর পরকেই বা জানিয়েছি? পরের সামনেও আমরা অভিনয় করি, নিজের সামনেও। আজ আমাদের জীবনে ঘর আর পর একাকার হয়ে গিয়েছে।

তৃতীয়া

রাস্তাটা বড়। রাস্তার এদিকে ছোট একটা মাটির বাড়ি। মাটির বাড়ি, টিনের চাল। দরজার ওপর ছোট একটা সাইন-বোর্ডে লেখা আছে—'দি গ্রেট্‌ হোমিও হল'। কিন্তু ভিতরে ঢুকলে বোঝা যায় ঘরের ভেতরে পাঁচজনের বেশি লোক ধরে না।

রাস্তা দিয়ে তীর্থযাত্রীরা যেতে যেতে সাইনবোর্ডটার দিকে নজর পড়লে হেসে ফেলত।

বলত, দেখ দেখ হে—'গ্রেট হোমিও হল' দেখ—

আলকাতরা মাখানো একটা দরজা। ঘরের ভেতরে ঢুকতে গেলে মাথা নিচু করতে হয়। চেহারা দেখে মনে হত একটা ঝড়ের ঝাপটা এলেই ঘরটার বুঝি আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না, একেবারে হুড়মুড় করে পড়ে যাবে মুখ থুবড়ে। আর আরও ভিতরের দিকে যারা চাইত, হেসে গড়িয়ে পড়ত। রুগী নেই পত্র নেই—একটা কমবয়সী লোক রাস্তার দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকত। বোধহয় রোগীর আশাতেই বসে থাকত।

আর ডাক্তারখানার উল্টো দিকে ?

উল্টো দিকে মস্ত বড় একটা বাড়ি। লাল ইটের মনোহারি বাড়িটা। বাড়িটার সদর দরজায় বন্দুক নিয়ে পাহারা দিত দরোয়ান। আর এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত বাড়ির সবগুলো জানালা-দরজা সমস্ত দিন বন্ধ থাকত। নতুন বাড়ি। অন্ততঃ জানালা-দরজা ইট-কাঠ সমস্ত রঙ করা হয়েছিল নতুন করে। ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করত বাড়িখানা। আর মাঝে-মাঝে একটা বিরাট মোটর এসে দাঁড়াত সামনে। সঙ্গে সঙ্গে পর্দা খাটানো হয়ে যেত মোটর থেকে নামবার পথে। কে নামত, কে উঠত বোঝা যেত না। শুধু 'দি

গ্রেট্‌ হোমিও হল'-এর ডাক্তার—ডাক্তার তিনকড়ি ভঞ্জ হাঁ করে চেয়ে থাকত সেই দিকে।

আসলে বড় রাস্তার এই বড় বাড়িটা নিয়েই আমার এই গল্প।

নির্মল লাহিড়ী বললেন, কই মশাই, এইতো গেল পূজোর সময় দেওঘর গিয়েছিলাম আমি, আপনার এই বড় বাড়িখানা দেখেছি বলে মনে পড়েছে বটে—কিন্তু ওই 'দি গ্রেট্‌ হোমিও হল' তো দেখি নি—বড় রাস্তার দু দিকেই তো শুধু দুটো বাড়ি আছে দেখেছি—

বললাম, একি আজকের কথা! তখন আমার বয়স কত আর, বারো কি চোদ্দ—বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম, আমিই বলে সেই 'গ্রেট্‌ হোমিও হল' দেখি নি তো আপনি দেখবেন কী করে? এ-সব আমার শোনা কথা! ওই টিনের চালের ডাক্তারখানাও দেখি নি, আর ওই দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িটাও তখন ভেঙে নুয়ে পড়েছে। আসলে ওই ডাক্তার তিনকড়ি ভঞ্জও আর তিনকড়ি ভঞ্জ নেই। সে চেহারাই বদলে গেছে তাঁর।

কয়েকজন বন্ধু মিলে গল্প হচ্ছিল বিকেল বেলা।

নির্মল লাহিড়ী বললেন, ছোটবেলায় কেবল ফাঁকি দিয়েছি ভাই, সুতরাং জীবনে কিছু হল না—ভালো করে আড্ডাও যদি দিতুম তো একটা কাজের মত কাজ হত, আড্ডাবাজ হিসাবেও নাম হত, এখন না-ঘাট্‌কা না-ঘরকা—

চিত্ত সরকার বললেন, যে যেমন অদৃষ্ট নিয়ে এসেছে তাই-ই তো হবে, এই দেখো না অদৃষ্টে ছিল বারোটা ছেলের বাপ হব, হয়েছি—

সমীর দে বললেন, অদৃষ্ট-ফদৃষ্ট সব বাজে, আসলে পুরুষকার। পুরুষকারই হল সব—আইনস্টাই বলেছেন···

চিত্ত সরকার বললেন, রাখ তোমার আইনস্টাইন। আইনস্টাইন তোমার এতবড় যুদ্ধটা আটকাতে পারলে?

সমীর দে বললেন, এই তোমাদের মত ফেটালিস্ট্ নিয়ে কারবার বলেই ইণ্ডিয়ার এত হয়রানি, নইলে আরও তু শো বছর আগেই দেশ স্বাধীন হয়ে যেত—এই বলে রাখলাম—

চিত্ত সরকার বললেন, এখন আর হয়েছে কি ভাই, সবে বিয়ে করেছে, বউটি এখনও নতুন, রক্তে তেজ আছে তোমার, তাই পুরুষকার পুরুষকার বলে চেঁচাচ্ছে।

নির্মল লাহিড়ী বললেন, অদৃষ্ট-চক্র বলে চক্র! অদৃষ্ট-চক্রের চরকিতে পড়ে হাড়-মাস ভাজা-ভাজা হয়ে গেল ভাই, তাই তো কেবল পালিয়ে বেড়াই—

চিত্ত সরকার বললেন, সেটি পারবেন না দাদা, তা হলে আর অদৃষ্ট নাম হতো না বেটার—

সমীর দে বললেন, তাহলে বলুন এই যে দালাইলামার ব্যাপার—খেয়ে-দেয়ে রাজত্ব করছিল—হঠাৎ রাজ্যপাট ছেড়ে ইণ্ডিয়ায় পালিয়ে আসতে হল, এ-ও অদৃষ্ট—?

চিত্ত সরকার বললেন, ওই তো মজা ভাই, যে-অদৃষ্ট রাজা করায়, সেই অদৃষ্টই একদিন আবার ভিখারী বানিয়ে ছাড়ে—নইলে সাধে কি আর ঋষিরা বলেছেন—ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র—

সমীর দে রেগে গিয়েছিলেন।

বললেন, তাহলে বলব international politics আপনারা ছাই বোঝেন—

আমি হঠাৎ বললাম, তর্ক থাক, তার চেয়ে আমি বরং একটা গল্প বলি—

নির্মল লাহিড়ী বললেন, তাই বলুন, উঃ। এতক্ষণ প্রায় জমে যাবার যোগাড় হচ্ছিলাম—

চিত্ত সরকার বললেন, আড্ডা চলছিল, বেশ চলছিল, সমীরটা তর্ক তুলেই মাটি করে দিলে—

সমীর দে বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, থাম তুমি সমীর—তর্ককে আমি বড় ভয় করি। বিশ্ব-সংসারে তর্ক করে কেউ জিতেছে এমন নজির আমি তো পাইনি। তর্ক থামাবার জন্যেই আমি গল্প আরম্ভ করলাম। কারণ গল্প হল তর্কের যম—।

আমার বাবা ছিলেন নামকরা কবিরাজ। সেকালে দক্ষিণ কলকাতায় আমার বাবার মত নাম-ডাক আর কার ছিল জানা নেই। রাজ-রাজড়া এটর্নী ব্যারিস্টার থেকে শুরু করে অফিসের কেরানী পর্যন্ত অনেক ছিল তাঁর ক্লায়েন্ট্। মাঝে মাঝে কাশী, পাটনা, পুরী, আসামের চা-বাগানের থেকেও কয়েকবার ডাক আসত। বাবার সঙ্গে ইস্কুলের ছুটি থাকলে আমিও যেতাম। এইরকম করে অনেক দেশেই আমার ঘোরা হয়ে গিয়েছিল একে একে।

তা সেবার দেওঘর বদ্যিনাথ থেকে ডাক এল।

কলকাতার বড় ব্যারিস্টার কিরণ চৌধুরী সেবার দেওঘরে হাওয়া-বদল করতে গিয়েছিলেন। কিরণ চৌধুরী বাবার বহুদিনের পেসেন্ট্। সকালবেলাই 'তার' এল—। কিরণ চৌধুরীর সিরিয়স অসুখ, 'তার' পাওয়া মাত্র যেন কবিরাজ মশাই দেওঘর চলে আসেন।

আমার ইস্কুলের তখন ছুটি চলছিল।

কয়েকটা ওষুধপত্র তৈরী করিয়ে নিয়ে বাবা আর আমি দেওঘর রওনা হলাম।

কয়েকদিন বেশ কাটল দেওঘরে। বাবা তো প্রথম ক'দিন রুগী নিয়েই ব্যস্ত। সাহেবী কেতা-দুরস্ত মানুষ কিরণ চৌধুরী। দেওঘরে গিয়েও সাহেবিয়ানা বজায় রেখেছেন। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ আর ডিনারের ঠেলায় যখন প্রায় আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার যোগাড় তখন কিরণ চৌধুরী একটু ভালর দিকে মোড় ঘুরলেন।

বাবা বললেন, এবার আমি তাহলে আসি চৌধুরী সাহেব, এবার আর ভয় নেই—

চৌধুরী সাহেব পীড়াপীড়ি করলেন—আর একটা সপ্তাহ থেকে যান কবিরাজ মশাই, সম্পূর্ণ সেরে উঠলে তবে আপনি যাবেন—

বাবার অবশ্য খুব ক্ষতি হচ্ছিল না। সপ্তাহে হাজার টাকা দর্শনী, তাছাড়া খাওয়া থাকা ওষুধের দাম। তার ওপর কলকাতা থেকে আসা-যাওয়ার ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনের ভাড়া।

কিন্তু বাবা বললেন, থাকতে তো পারি কিন্তু এ-সপ্তাহে আমার খাওয়ার অন্য ব্যবস্থা করতে হবে, আপনার ওই ডিনার লাঞ্চ আর চলবে না—

চৌধুরী সাহেব বললেন, তা যা আপনার সুবিধে বলুন, সেই ব্যবস্থাই হবে—

বাবা বললেন, ও-সব স্টু, স্যুপ চলবে না, ও-সব বাদ দিয়ে শুকতুনি, মোচার ঘণ্ট, ঝিঙেপোস্ত, থোড়-ছেঁচকি—এই সব করতে হবে এখন থেকে—

চৌধুরী সাহেব বললেন, তা তা-ই হবে—

কিরণ চৌধুরী বাইরে খাঁটি সাহেব হলেও অন্তরে-অন্তরে ছিলেন বাঙালী। বোধহয় চৌধুরী-গিন্নীর পাল্লাতে পড়েই অত সাহেবিয়ানার পক্ষপাতী হয়েছিলেন। নইলে অত সাহেব হলেও অসুখের সময়ে এ্যালোপ্যাথ না ডেকে কেন কবিরাজ ডাকলেন ?

তা পরদিন থেকে সেই ব্যবস্থাই বহাল হল। আমরা আরও এক সপ্তাহ রইলাম দেওঘরে। আমরা বাপ-বেটায় সকালবেলায়

বেড়াতে বেরুই, দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করি, তারপর সন্ধ্যাবেলা আবার বেড়াতে বেরুই। তখন চৌধুরী সাহেবও ভাল হয়ে আসছেন ক্রমে ক্রমে।

ঠিক যেদিন চলে আসব তার আগের দিন ঘটনাটা ঘটল।

সেই ঘটনাটাই আমার গল্পের বিষয়বস্তু।

তোমরা এতক্ষণ পুরুষকার-দৈব নানারকম কথা আলোচনা করছিলে। আমি চুপ করে শুনছিলাম। বইতে কেউ তো সত্যি কথা লেখে না। বই পড়লে আসল মতামতটা পাওয়া দূরে থাক জিনিসটা আরও গুলিয়ে যায়। নেপোলিয়ন শুনেছি নাকি ভগবান মানতেন না। কিন্তু তিনি চাইতেন প্রজারা ভগবান মানুক—তাতে তাঁর সুবিধে। দুর্ভিক্ষের সময় তাহলে ভগবান ছেড়ে রাজার ঘাড়ে আর কেউ দোষ চাপাবে না। যদি বল ভগবান আর ভাগ্য, ও-দুটো কি এক কথা? আমি বলব এক না হক আলাদা নয়।···

নির্মল লাহিড়ী বললেন, আবার তত্ত্ব নিয়ে কেন কচকচি করছেন—গল্পটা বলুন—

বললাম, গল্প বলছি, তবু তত্ত্বটা একটু না বললে গল্পকে নেহাত আষাঢ়ে গল্প বলেই তোমরা উড়িয়ে দেবে—গল্পের সঙ্গে তত্ত্বের একটু পাঞ্চ্ না করলে তোমরাই বা বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নেবে কেন?

সমীর দে এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। এবার আর থাকতে পারলেন না।

বললেন, আপনার গল্প কি দৈবকে support করে? তাহলে কিন্তু আমি উঠলাম।

চিত্ত সরকার বললেন, গল্প তোমার একার জন্যে নয় হে, আমরাও আছি, আমরাও গল্প শুনতে ভালবাসি, আর তাছাড়া গল্প কি জ্যামিতির থিয়োরেম যে কিছু প্রমাণ করতেই হবে?

সমীর হয়ত উত্তরে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল।

আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, সমীর ভাল রকমই জানে যে গল্প

আর থিয়োরেম আলাদা জিনিস, সুতরাং আর তর্ক কোরো না তোমরা—। এখন থেকে পাঁচশো বছর আগে এর প্রমাণ দেওয়া হয়ে গেছে! পাঁচশো বছর আগেই মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে যে মানুষ পাপগ্রস্ত জীব নয়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র সাধনা। মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, নিরক্ষরতা অত্যাচার আর দুর্নীতি এগুলো দৈবের অমোঘ বিধান নয়।

নির্মল লাহিড়ী হঠাৎ বললেন, আপনি কি গল্প শোনাবার নাম করে আমাদের রেনেসাঁস শেখাচ্ছেন?

বললাম, না, গল্পের সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে বলেই বলছি—

চিত্ত সরকার বললেন, না না, আমরা গল্প শুনতে চাই, তত্ত্ব শুনতে চাই নে—গল্প আরম্ভ করে দিন আপনার—

বললাম, গল্পটা মুখে বলছি, তত্ত্বটা একটু খুলে বলছি, নইলে লিখে বলতে গেলে আর বলতাম না এ-রকম। গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকত। যা হক সেই পাঁচশো বছর আগে যে-রেনেসাঁস-এর আবির্ভাব হল তার ফলে চার্চের একচ্ছত্র শাসনে ফাটল ধরল, দিকে দিকে মানুষ বেরিয়ে পড়ল নতুন দেশ আবিষ্কারের উন্মাদনায়, আর তার প্রভাব ছড়িয়ে গেল আমেরিকায় অস্ট্রেলিয়ায় আফ্রিকায়···আর তারই ফলে হল লিবারেলিজম্।

চিত্ত সরকার বললেন, এ-সব আপনি কী বলছেন দাদা? লিবারেলিজম রেনেসাঁস—ও-সব কথা কে শুনতে চাইছে?

সমীর দে বললেন, আপনি আগে বলুন আজকের আলোচনার সঙ্গে আপনার গল্পের যোগাযোগ কী?

নির্মল লাহিড়ী বললেন, গল্প এখনও আরম্ভই হল না, এরই মধ্যে তুমি গল্পের যোগাযোগ খুঁজতে বসলে?

সমীর দে বললেন, কিন্তু গল্পটা কী নিয়ে তা জিজ্ঞেস করবার অধিকার তো আছে আমাদের?

বললাম, না, সে-অধিকার তোমাদের নেই! কেন নেই সে-

প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে। তার দরকার নেই। তার চেয়ে বলে রাখি আমার এ-গল্প প্রেম নিয়ে।

সমীর বললেন, এঃ, আবার সেই প্রেম ?

বললাম, হ্যাঁ, প্রেমের মত এত বস্তা-পচা পুরানো জিনিসও আর নেই, আবার এত আনকোরা নতুন জিনিসও আর নেই সংসারে! এ যেন ঠিক পৃথিবীর মত, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রোজই নতুন হওয়া, অথচ এত বড় পুরনো জিনিস তো আর কিছু নেই।

খানিক থেমে আবার বলতে লাগলাম, প্রেম কখনও পুরনো হয় না। প্রেম কি সবাই পায় ? যে পেয়েছে সে-ই কেবল তার মজাটা জানে। প্রেম কাছেও টানে, দূরেও ঠেলে—কিন্তু কখনও বঞ্চিত করে না। প্রেম নিয়ে বৈষ্ণব কবিরা হাজার-হাজার পদাবলী লিখে গেছেন, লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল! বোঝ ঠেলাটা। আমরা তো স্ত্রীর কাছে তিন ঘণ্টা একসঙ্গে থাকলে পালাই-পালাই করি আর লাখ যুগের কথা তো ভাবতেই ভয় পাই! তাহলেই বুঝতে পারছ যাকে আমরা প্রেম বলছি সেটা আসল প্রেম নয়—প্রেম আলাদা জিনিস!

তাহলে তোমরা শোন, গোড়া থেকেই বলি!

ব্যারিস্টার কিরণ চৌধুরী তো সেরে উঠেছেন ভাল করে। পরের দিন আমরা চলে যাব। তার আগের দিন বিকেল বেলা বেড়াতে বেরিয়েছি। দেওঘরে সব ক'টা দ্রষ্টব্য জিনিস ততদিনে প্রায় দেখা শেষ করে ফেলেছি। রাস্তার ধার দিয়ে বাবার সঙ্গে যাচ্ছিলাম। দেওঘরের রাস্তা, বুঝতেই পারছ, সে রাস্তার কোনও বালাই নেই

কোথাও। এবড়ো-খেবড়ো ,খোয়া-ওঠা রাস্তা। আশে-পাশে একটা দোকান কিংবা বাড়ি। কাজ তখন বাবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সুতরাং উদ্বেগও ছিল না মনে। এমনি গল্প করতে করতে চলেছি তু'জন।

বাবা বললেন, যাক্ দেওঘরটা এই সূত্রে তোমার দেখা হয়ে গেল।

আমি বললাম, ঠিক ভাল করে দেখা হল না বাবা।

বাবা বললেন, এর থেকে আর ভাল করে দেখা কাকে বলে!

বললাম, এখানকার কোনও লোকের সঙ্গে তো আলাপ হল না—এখানেও তো অনেক লোক আছে, যারা চিরকাল বাস করছে এখানে, বহুদিন ধরে।

এমনি কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ পাশের একটা বাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক বাইরে এসে ডাকলেন, কবিরাজ মশাই, আসুন, আসুন—

বাবার অচেনা লোক।

ভদ্রলোক বললেন, আমাকে ঠিক চিনবেন না আপনি, আমার বাড়ি এটা. আমি আজ তিরিশ বছর ধরে এখানে বাস করছি—তাতে কি, আসুন ভেতরে।

ভেতরে ঢুকলাম।

ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম তিনকড়ি ভঞ্জ, আমি অবশ্য বাংলা দেশের লোক, কলকাতাতেই আমাদের বাড়ি,. ভবানীপুরে, এখন এখানেই থাকি।

তারপর বাবার দিকে গড়গড়ার নলটা দিয়ে বললেন, আসুন তামাক ইচ্ছে করুন।

বাবা বললেন, থাক্ থাক্ আমি তামাক খাই নে।

ভদ্রলোক বললেন, তাহলে পান খান, কিছু না খেলে আপ্যায়িত করি কী করে।

বলে চাকরকে ডেকে ভেতর থেকে পান আনিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক বললেন, শুনেছি চৌধুরী সাহেবের চিকিৎসা করতে আপনি এসেছেন।

বাবা বললেন, হ্যাঁ, এখন একটু সেরে উঠেছেন।

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ তা-ও শুনেছি, প্রথমে যখন অসুখটা হল ওঁরা আমাকেও কল্ দিয়েছিলেন।

বাবা বললেন, আপনিও ডাক্তার বুঝি ?

তিনকড়িবাবু বললেন, হ্যাঁ, তবে আমি এখন আর ডাক্তারী করি না।

—তার মানে ?

—মানে ডাক্তারী বলতে গেলে আমি একবারই করেছি, একটি মাত্র রুগীই সারিয়েছি জীবনে, সেই একবার ডাক্তারী করেই এই যা-কিছু দেখছেন সব। এই তিনতলা বাড়ি, এর পেছনে সাত বিঘে জমি, আমার চাকর-বাকর যা কিছু দেখছেন, সব। এখনও আমার চাল, ডাল, তরি-তরকারী ঘি-তেল কিছুই কিনে খেতে হয় না—

—সে কী!

বাবা আর আমি দু'জনেই অবাক হয়ে গেলাম।

তিনকড়িবাবু বললেন, পাস-টাস তো করি নি মশাই, শুধু এক-খানা বাংলা হোমিওপ্যাথির বই পড়েছিলাম জীবনে, তাতে এর বেশি আর কী হবে! যথেষ্ট হয়েছে আমার, ক'জন ডাক্তার একটা রুগী সারিয়ে এত বড় বাড়ি, সাত বিঘে জমি আর সারা জীবনের আশ্রয় করতে পারে আমার মতন, বলুন ?

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কেন, আর ডাক্তারী করলেন না কেন ?

তিনকড়িবাবু বললেন, করতে তো ইচ্ছে ছিল মশাই, রুগীও আসত অনেক, আমার যখন নাম হয়ে গেল খুব, তখন একজন-দু'জন করে করে অনেক রুগী আসতে লাগল আমার বাড়িতে। আমিও বই খুঁজে খুঁজে ওষুধ দিতে লাগলাম, কিন্তু সারল না একটাও।

বলে ভদ্রলোক হো হো করে হাসতে লাগলেন।

বললেন, চা খাবেন নাকি! চা নিজে খাই না কিনা, তাই জিজ্ঞেস করতেও ভুলে গেছি।

বাবা বললেন, না না, ও-সব হাঙ্গামা করবেন না আর. তা ছাড়া আমিও চা খাই না, আমার ছেলেও চা খায় না।

তিনকড়িবাবু বললেন, ও না খাওয়াই ভাল কবিরাজ মশাই, আপনার আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কী বলে তা জানি না, তবে এইটুকু জানি যে জিনিসটা খারাপ।

বাবা বললেন, ও-সব কথা থাক, আপনার গল্পটা বলুন—যাক্ এসেছিলাম এখানে তাই আলাপ হল! কত বাঙালী কত দেশে ছড়িয়ে আছে, সবাই আপনার জনের মত, তা ছাড়া ভবানীপুরে তো আমারও বাস, সেখানে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হল না,—হল কিনা এখানে এসে।

তিনকড়িবাবু বললেন, ভবানীপুরে বাস ছিল বটে, কিন্তু এই তিরিশ বছরের মধ্যে ভবানীপুরে আর যাওয়াই হয় নি, আর সেখানে কেউ থাকলে তো যাব! যাঁরা আছেন তারা গেলে হয়ত খাতির-যত্ন করবেন, কিন্তু যেতে আর মন চায় না—

—ভবানীপুরে কোন্ পাড়ায় আপনাদের বাড়ি?

তিনকড়িবাবু বললেন, চাউলপটি চেনেন নিশ্চয়, এখনও রাজকমল ভঞ্জের বংশ বললে ওখানকার দু'একজন বুড়ো মানুষ চিনিয়ে দিতেও পারে। কিন্তু শুনেছি, আজকাল চাউলপটির চেহারাই নাকি বদলে গেছে। আর বদলে যাবেই না-বা কেন বলুন! দেওঘরেরই কি কম বদলেছে এই তিরিশ বছরে! আমি যখন প্রথম এসেছিলাম, এ-রাস্তায় একটা আলো ছিল না, জানেন! ওই যে একটা বাড়ি দেখছেন, তিনতলা, ওইখানে মাঠ ছিল, ছেলেরা ফুটবল খেলত এখানে —ওর সামনেই একটা তেলের আলো জ্বলত টিম্ টিম্ করে—আর এই সারা রাস্তাটা ছিল ঘুরঘুট্টি অন্ধকার! আর এই যে আমার বাড়িটা দেখছেন, ওখানেও কিছু ছিল না, একটা বস্তি ছিল। কয়েকটা কুঁড়ে

ঘর, আমি যখন প্রথম আসি এখানে, তখন এই একখানা কুঁড়ে ঘরে একটাকা মাসিক ভাড়া দিয়ে ডিস্‌পেনসারি খুলেছিলাম।

—ডিস্‌পেনসারি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ কবিরাজ মশাই, আমার হোমিওপ্যাথিক ডিস্‌পেনসারি শুধু নামেই, ভেতরে ছিল না কিছুই। আমি একটা ভাঙা টেবিল আর একখানা ভাঙা চেয়ার কিনেছিলাম বাজার থেকে। একজোড়া তিন টাকায়। তাই-ই তখন আমার দেবার সামর্থ্য ছিল না। একটাকা মাসিক ঘর-ভাড়া, তাই-ই তখন কেমন করে দেব ভেবে ভয় পেতাম! দেব কেমন করে? রুগী তো একটা আসে না আর চিকিৎসারই বা আমি কি জানি ছাই যে রুগী আসবে আমার কাছে।

বাবা বললেন, তা এত জায়গা থাকতে এই দেওঘরেই বা এসেছিলেন কেন আপনি! চিকিৎসা করতে?

তিনকড়িবাবু বললেন, আসলে চিকিৎসা করাটা ছিল আমার একটা ছুতো! ভেবেছিলাম, বাবা বৈদ্যনাথের চরণে এসে পড়লে একটা না-একটা কিছু জুটে যাবেই। এই যেমন আপনি এসেছেন চৌধুরী সাহেবের চিকিৎসা করতে, এ-রকম আসা তো আমার নয়— আমি, বলতে গেলে একরকম পালিয়ে এসেছিলাম—বাড়ি থেকে পালিয়ে, আত্মীয়স্বজনের ওপর অভিমান করে। যেদিন এসেছিলাম, মনে আছে সঙ্গে ছিল কেবল আমার স্ত্রী আর সাঁইত্রিশটি টাকা সম্বল।

তারপর একটু থেমে বললেন, তবে আপনাকে সমস্ত গোড়া থেকেই বলি শুনুন, আপনার হাতে এখন কোন কাজ নেই তো?

বাবা বললেন, না না আপনি বলুন।

মনে আছে তিনকড়িবাবুর গল্প শুনতে শুনতে ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে এল চারিদিকে। দেওঘরের সেই রাত্রিটায় আসবাবপত্রের মধ্যিখানে সেই অপরিচিত ভদ্রলোকের বাইরের ঘরে বসে যেন এক আরব্য উপন্যাস শুনলাম সেদিন। আমি তখন ছোট, সঙ্গে বাবা

রয়েচেন। সব বিষয়ে নিজে কোনও প্রশ্ন করছি না। একজন বৃদ্ধ লোক, ষাট বছরের বৃদ্ধ, নিজেরজীবনের কাহিনী শোনাচ্ছেন। কাহিনী শুনতে শুনতে আমিও যেন সেই চাউলপটির পুরোনো পরিবেশের মধ্যে গিয়ে একজন দর্শকে পরিণত হয়েছি।

সে এক অদ্ভুত সময়। তখন একজোড়া জুতোর দাম তিন টাকা। একটাকায় একটা শার্ট। সস্তাগণ্ডার দিন। চাউলপটির ইস্কুলে পড়তে পড়তে একদিন নাম কাটা গেল।

দাদা একদিন বড়োবাজারে একটা দোকানে ঢুকিয়ে দিলে। সাত টাকা মাইনে। সোজা হেঁটে যেতে হবে ভবানীপুর থেকে একেবারে বড়বাজার পর্যন্ত।

গদিবাড়িতে গিয়ে ন'টার সময় হাজরে দিতে হয়। চটি ফটাস করতে করতে গিয়ে হাজির হতাম সেই গদিতে। দর্মাহাটার তিন নম্বর বাড়ির এক তলায় ছিল একটা খাবারের দোকান। দহিবড়া জিলেবি, ফুচকা এই সব।

দাদা বললে, এখানে লেগে থাক্, কাজ-টাজ শিখে নিলে একটা দোকান করে দেব তোকে।

তিনকড়িবাবু বললেন, প্রথম প্রথম বেশ লেগে থাকলাম মশাই. বেশ কাজ করতে লাগলাম। কেমন করে খাতা রাখতে হয়, কেমন করে হিসেবের গরমিল ধরতে হয়, কত মালে কত নাফা, কত আয় হলে কত খরচ করা উচিত, কী দামে মাল কিনে কী দামে বেচা উচিত—এইসব শিখতে লাগলাম, দেখতে লাগলাম।

ঘনশ্যামবাবু ছিল মালিক। গদিবাড়ির মালিক।

বলত, এ বাঙালীবাবু—

ঘনশ্যামবাবু আমাকে বাঙালীবাবু বলে ডাকত। লোকটি ভাল। বয়স হয়েছে। পশ্চিমের কোন দেশ থেকে এসে পৈত্রিক ব্যবসাতে ঢুকে পড়েছিল। নানা রকম ব্যবসা ছিল ঘনশ্যামবাবুর। ঘি-এর ব্যবসা, গামছার ব্যবসা, কাপড়ের ব্যবসা। যা ধরত তাতেই লাভ হত। এই রকম দশটা গদি ছিল বড়বাজারে! ঘনশ্যামবাবু টেলিফোন নিয়ে বসে থাকত সারাদিন আর হুকুম করত একে ওকে। আমি সাত টাকা মাইনের চাকর। বেশি ক্ষমতা ছিল না আমার। দূর থেকে দেখতাম ঘনশ্যামবাবু টেলিফোনে কাকে বকছে আর আমার প্রাণ দুর-দুর করত। যদি আমাকে বকে কোনওদিন ওই রকম করে?

ঘনশ্যামবাবু গদিতে থাকত অনেক রাত পর্যন্ত! এক-একদিন সাতটা-আটটা পর্যন্ত। তার জন্যে আমরাও বসে থাকতাম দেরি করে। কাজ করতাম।

দাদা চাকরি করত সওদাগরী অফিসে। অফিস থেকে রাত্রে বাড়িতে ফিরে আমাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ করত।

বলত, এত দেরি যে তোমার?

বলতাম, ঘনশ্যামবাবু আজ অনেক রাত্রিতে বাড়ি গেলেন।

দাদা বলত, গদি থেকে আর কোথাও যাবে না, সোজা বাড়ি চলে আসবে।

সাত টাকাতেই আরম্ভ করেছিলাম চাকরি। ঠিক ছিল দু,এক মাস কাজ করলে মাইনে বেড়ে দশ টাকা হবে! তাই বড় মন দিয়ে কাজ করতাম। আমার কোনও দিকে নজর ছিল না। আমাদের বয়সের ছেলেদের কত দিকে আকর্ষণ ছিল তখন। ভাবতাম সংসারে যার দাদা ছাড়া আর কেউ নেই, তার পক্ষে কোনও বিলাসিতাই শোভন নয়। না খেলা, না বেড়ানো, না পড়াশুনা। পড়াশুনোও যেন আমার কাছে বিলাসিতা। সকাল বেলা হাঁটতে হাঁটতে যেতাম

সেই বড়বাজারে। সেখানে গিয়ে নিজের ডেস্কের সামনে বসে খাতা লিখতাম এক মনে।

সংসারে কেই বা ভালবাসত আমাকে দাদা ছাড়া!

বাংলা দেশে মেয়ের অভাব নেই। একদিন আমারও বিয়ের সম্বন্ধ এল।

দাদা বললেন, তোমার তো ভাবনার দরকার নেই—যা বলছি কর।

আমি একটু ইতস্ততঃ করেছিলাম মনে আছে।

দাদা বললেন, আমি যখন রয়েছি. তোমার ভাবনা কী! তুমি যেমন চাকরি করছ করে যাও, আমি তো মরি নি।

মনে আছে ঘনশ্যামবাবুর কাছে গিয়ে ছুটি চাইতেই বললেন, সাদি? সাদির শখ হয়েছে?

বললাম, দাদা খুব পীড়াপীড়ি করছে, তাই···

—কত দিনের ছুটি?

বললাম, তিন দিন, তিন দিন হলেই চলবে আমার।

ঘনশ্যামবাবু লোক ভাল। হেডমুন্সী ছিল পণ্ডিতজী। পণ্ডিতজীকে বলে আমার তিন দিনের ছুটির ব্যবস্থা করে দিলেন। বিয়ের নামে অন্য সকলের আনন্দ হয় শুনেছি, কিন্তু আমার যেন কেমন আতঙ্ক হল মশাই। সে কতকাল আগের কথা। প্রথম যৌবনের কথা সব। তখনকার দিনে আনন্দ হলেই স্বাভাবিক হত। একটু রোমাঞ্চ কি একটু উত্তেজনা। কিন্তু আমার সে সব কিছুই হয় নি মনে আছে। আমার কেবল মনেহয়েছিল দাদার ঘাড়ে আরও বুঝি বোঝা চাপানো। কেমন করে সংসার চলবে। কেমন করে এতগুলো মুখের অন্ন যোগাবে দাদা? দাদা ছিল আমাদের দেবতুল্য লোক। সংসারের সমস্ত বোঝাটা নিজের মাথায় চাপিয়ে যেন আনন্দ পেত দাদা। আর বউদি? বউদির নিজের বলতে কিছুই ছিল না। দাদার কথাতেই সব চলত। সংসারে এমন এক-একজন মানুষ নিশ্চয় দেখেছেন আপনি

যে সকলের সব দায়িত্বের সব চাপটা নিজের মাথায় নিশ্চিতে চালিয়ে যায়, অন্য লোককে বুঝতে দেয় না কিছু, আমার দাদা ঠিক সেই প্রকৃতির মানুষ ছিল। দাদার ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছিল। তাদের ভাবনাও আছে। তাদের চাকরি, তাদের বিয়ের ভাবনাও আছে। বিধবা বোন ছিল একজন। তখনও দু'বোনের বিয়ে দিতে হবে দাদাকে। তা সত্ত্বেও আমার বিয়ের জন্যে দাদা যে কেন অত পীড়াপিড়ি করেছিল কে জানে।

দাদা সব কথাতেই বলত, তোমরা অত ভাবছ কেন, আমি তো আছি।

দাদা যে আছে তা তো আমরা জানতাম। কিন্তু দাদার সামর্থ্যও তো আমরা জানতাম। তাই সবাই আমরা দাদার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকলেও দাদার মুখের হাসি কখনও থেমে যেতে দেখি নি।

সকাল থেকে সমস্ত সংসারটা দিদি বউদি মিলে যে-ভাবে চালিয়ে যেত—দেখে আমারও কেমন মায়া হত। আমি মাইনেটা এনে দাদার হাতে তুলে দিতাম। দাদা সেই ক'টা টাকা নিয়ে একটা টাকা আমার হাতে দিত।

বলত, তোমার খরচা-পত্তরের জন্যে রাখ এটা।

তা আমার যেন কেমন লজ্জা করত মশাই। মাত্র তো ওই ক'টা টাকা মাইনে! তার মধ্যে দাদাকেই বা ক'টা টাকা দেব, আর চলবেই বা সমস্ত কি করে! হঠাৎ যদি দাদার একটা কিছু ভাল-মন্দ হয় তখন করব কি আমরা, থাকব কোথায়, খাব কী? রাস্তায় চলতে চলতে অনেক দিন এই সব ভাবতে ভাবতে চলেছি। কতদিন গাড়িচাপা পড়বার মত হয়েছে। কোথায় সেই চাউলপটি, আর কোথায় বড়বাজার! জুতোটা ছিঁড়ে গেলেও পয়সার জন্যে দাদার কাছে হাত পাততে লজ্জা করত। ছাতির অভাবে অনেকদিন বৃষ্টিতে ভিজে নেয়ে উঠেছি। তারপর ভিজে জামা-কাপড় আবার গায়েই

শুকিয়ে গেছে। কাউকেই মুখ ফুটে কিছু বলি নি। বলতে আমার লজ্জা করত।

বাড়িতে নতুন যে মানুষটা এল সেও আমারই মতন। আমারই মতন লজ্জায় জড়ো-সড়ো হয়ে থাকত সারাদিন। আমার অবস্থা খারাপ ছিল বলে নিজেকেও যেন সে বড় লুকিয়ে রাখতে চাইত। সংসারের কাজের মধ্যে হারিয়ে যেতে চাইত। আমি যখন অফিস থেকে আসতাম, তখন বাড়িতে ঢুকেই প্রথম আমার দাদার সঙ্গে দেখা করে তবে ঢুকতাম নিজের ঘরে। একদিন আমাদের বংশের নাম জানত সবাই, সে কথাটা যেন ভুলে থাকতে চাইতাম।

দাদা বলত, আজ কী খবর? ঘনশ্যামবাবু ভাল আছেন তো?

বলতাম, হ্যাঁ—

যেন ঘনশ্যামবাবুর ভাল থাকা-থাকির ওপরেই আমার আর আমাদের ভাল থাকা নির্ভর করছে। যেন ঘনশ্যামবাবুই আমাদের ভাগ্য-বিধাতা। নয়ই বা বলি কেন! ঘনশ্যামবাবুর অসুই হলেই সারা গদিবাড়ির লোক-জনের টনক নড়ে উঠত। আমারও ভাবনা হত! এক ঘনশ্যামবাবুর জন্যে এতগুলো লোকের সংসার চলছে, এতগুলো পরমায়ু টিকে আছে। ঘনশ্যামবাবুই তো সব! ঘনশ্যামবাবুর এক-কণা কৃপাদৃষ্টি পেলেই তো আমাদের যে-কোনও জন ধন্য হয়ে যেতাম।

আমার স্ত্রীও বুঝত সব মশাই। গদিবাড়িতে যদি কোন দিন হেডমুন্সীর কাছে বকুনি খেয়ে মনটা বিরস হয়ে থাকত তো আমার স্ত্রী টের পেত সব। সেদিন কিছু জিজ্ঞেস করত না, চুপ করে শুধু আমার দিকে চেয়ে দেখত, চুপ-চাপ পাখাটা নিয়ে বাতাস করত।

বলত, তুমি ঘুমোও, আমি হাওয়া করছি তোমাকে।

বলতাম, আমাকে হাওয়া করতে হবে না, তুমি ঘুমোও।

গরমের চোটে ঘুমই কি আসত আমার। জোরে জোরে পাখা চালালেও ঘুম আসত না। কেবল ভাবতাম জীবনে কী হল। কী-ই

বা আমার জীবনের দাম। সংসারে সচ্ছলতার জন্যে কতটুকু আমি করতে পারি। কতটুকুই বা আমার ক্ষমতা!

আমার স্ত্রী আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করত, তুমি অত ভাব কেন, আমি তো বেশ সুখেই আছি।

দাদাও বলত, যাক্, তোমার চাকরি হল, বাঁচলাম, আর আমার কোনও ভাবনা নেই।

সত্যি যত ভাবনা যেন সব আমার। কেমন করে বড় হব, কেমন করে দশজনের একজন হব, দাদার মুখোজ্জ্বল করব তাই-ই ছিল আমার দিনরাত্রের চিন্তা। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে আশে-পাশের বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম। ওই রকম একটা বাড়ি হলে খুব সুখ হবে মনে হত। ও-সব বাড়ির ভেতরে যারা থাকে তারা কত সুখী! ভেতরে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলত আর আমার মনের সব আলোগুলো যেন নিভে আসত। সকলের চেয়ে আমরা গরীব। আমার বোনের ময়লা শাড়ি, দাদার রোগা শরীর, স্ত্রীর নিরাভরণ চেহারা সব যেন চোখের সামনে ভেসে উঠত।

গদিবাড়িতেও আমার কাজের অন্ত ছিল না। সেখানে গিয়ে কাজের চাপে সব ভুলে যেতাম। চালান, ইনভয়েস, পার্শেল, অর্ডার মুনাফা, হিসেব—সব কিছুরই মধ্যে তলিয়ে যেতাম একেবারে।

ঘনশ্যামবাবুর গদিবাড়িতে বাঙালী বলতে আমি একজন।

হেডমুন্সী বলত, লোকে বলে বাঙালীবাবুদের বুদ্ধি খুব সাফ।

ওপাশ থেকে তিলকচাঁদ বলত, বাঙালীবাবুরা যে মছলী খায় পণ্ডিতজী।

পণ্ডিতজী জিজ্ঞেস করত, আজ মছলী খেয়েছ বাঙালীবাবু?

চতুরাননজী বলত, বাঙালীবাবুরা রোজ মছলী খায়—দিনে ভি খায়, রাতে ভি খায়।

পণ্ডিতজী জিজ্ঞেস করত, ব্রাহ্মণরা কি মছলী খায় বাঙালীবাবু?

আমি ততক্ষণ সব কথা শুনছিলাম। পণ্ডিতজীর প্রশ্নটা কানে

যেতেই মুখ তুলে বললাম, বাঙালীদের সবাই মছলি খায় মুন্সিজী, ব্রাহ্মণরাও খায়।

পণ্ডিতজী কথাটা শুনেই 'ছিয়া' 'ছিয়া' করে উঠলেন।

বললাম, এতদিন বাংলা দেশে আছেন, আপনি তা জানতেন না?

তিলকচাঁদ কাজ করতে করতে মাথা উঁচু করে বললে, বাঙালী ব্রাহ্মণদের জাত নেই মুন্সীজী—তারা গোস ভি খায়—মুর্গার গোস।

চতুরাননজী বললে, মুর্গার গোস্ হাঁসকা গোস্ পঞ্ছিকা গোস্—সব খায় বাঙালী ব্রাহ্মণরা।

পণ্ডিতজী বলত, বাঙালী লোক বড় নোংরা আছে তো।

আমি বিশেষ প্রতিবাদ করতাম না এ-সব কথার।

শুধু মাঝে মাঝে বলতাম, বড়বড় আদমি পয়দা করেছে তো বাংলা দেশ—স্বামী বিবেকানন্দ, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ওরা কিছু বুঝতে পারত না নাম শুনে।

জিজ্ঞেস করত, কারা ওরা? শেঠজী? কীসের কারবার?

বলতাম, কারবার করতেন না পণ্ডিতজী, এমনি বড় লোক ছিলেন সব, মছলির দেশেই জন্মেছিলেন একদিন।

আমার কথা শুনে তিলকচাঁদ চতুরাননজী ওরা খুব হো হো করে হেসে উঠত।

কিন্তু আসলে পণ্ডিতজী মনে মনে ভালও বাসতেন আমাকে। আমাকে যেমন বিশ্বাস করতেন এমন আর কাউকে করতেন না।

আড়ালে আমাকে বলতেন, বাঙালীবাবু মন দিয়ে কাজ শিখে নাও, তোমার তনখা আমি শেঠজীকে বলে বাড়িয়ে দেব।

কাঁদো কাঁদো হয়ে বলতাম, সাত টাকা মাইনেয় আমার কুলোয় না মুন্সীজী। বউ আছে, অবিবাহিতা বোন আছে দু'টো, দাদার ঘাড়েই বসে বসে খাচ্ছি বলে—

আমার কাঁদো কাঁদো ভাব দেখে ধমকে দিত।

বলত, রোতা হ্যায় কেঁও—কাঁদছ কেন! কাম করো, শেঠজী খুশী হলেই তনখা বাড়িয়ে দিতে বলব আমি।'

কিন্তু ঘনশ্যামবাবু ছিলেন আমার নাগালের বাইরে। তাঁর কাছ পর্যন্ত প্রথম প্রথম পৌঁছতেই পারতাম না। বিরাট এক মোটা গদির ওপর বাবু হয়ে বসে থাকতেন ঘনশ্যামবাবু তাঁর নিজের ঘেরা ঘরে। চারদিকে মোটা মোটা খেরো-বাঁধানো খাতার পাহাড়। দু-দুটো টেলিফোন। দিনরাতই টেলিফোন দু'টো বেজে চলেছে। মাঝে মাঝে তাকিয়ে হেলান দিয়ে বসতেন। তার পরেই আবার টেলিফোন বেজে উঠত। সেই সেখানে বসে বসেই লাখ-লাখ কোটিকোটি টাকার লেন-দেন করতেন ঘনশ্যামবাবু। ঘনশ্যামবাবুর লোক সমস্ত কলকাতা-ময় ঘুরে বেড়াত। কেউ যেত গঙ্গার জেটিতে, কেউ রেলের মাল-গুদামে, কেউ শেয়ার মার্কেটে। সব জায়গা থেকে টেলিফোন আসত। আর ঘনশ্যামবাবু গদিতে বসে বসেই নির্দেশ দিতেন, ধমকাতেন। রেলের বাবুরা মাল ছাড়ছে না তো পান খেতে দাও, গঙ্গার জেটিতে পুলিস মোষের গাড়ি আটকে দিয়েছে তো পুলিসের হাতে কিছু দাও। টাকা ফেললে সবাই জব্দ। সোজা আঙুলে ঘি না ওঠে আঙুল বেঁকাও।

ঘনশ্যামবাবু বলতেন, দুনিয়া তো রূপেয়াসে চলে—রূপেয়া ছড়াও, সব কাজ হাঁসিল।

এক-একদিন দেখতাম আমরা যাবার আগেই ঘনশ্যামবাবু গদি-বাড়িতে এসে গেছেন। সব থম্ থম্ করছে। লোকজন এসেই সেদিন আর গল্প-গুজব করা নয়, একেবারে কলম নিয়ে বসে গেছে যে-যার। ঘনশ্যামবাবুর ঘর থেকে তাঁর গলা শোনা যাচ্ছে। সে কি চিৎকার! চিৎকার করে বলেছেন, বেচ্ বেচ্ দে—

কখনও আবার বলছেন, লী—লী—লী—

প্রথম প্রথম আমি কিছুই বুঝতাম না।

পণ্ডিতজীও সেদিন ভয়ে ভয়ে নিজের কাজ নিয়ে বসতেন। তাঁরও

মুখে কথা নেই। আমিও আমার নিজের ডেস্কে বসে হিসেব কষতে বসতাম। তিলকচাঁদের মুখে যে অত ফোড়ন, সে-ও চুপ। চতুরাননজীও ঘষ ঘষ করে কলম চালাচ্ছে।

ওধার থেকে তখনও চিৎকার আসছে জোরে জোরে।

আমার দিকে এক ফাঁকে চেয়ে নিয়ে পণ্ডিতজী বললেন, আজ আপনা মন সে কাম করো বাঙালীবাবু।

আমি কিছু বুঝলাম না।

খানিক পরে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম, আজ কী হয়েছেমুন্সীজী?

পণ্ডিতজী শুধু বললেন, কয়লা পড়ে গেছে।

কয়লা পড়ে যাওয়া মানে ভীষণ ব্যাপার। ঘনশ্যামবাবুর কোম্পানীর অনেক টাকা কয়লার শেয়ারে খাটছে। সেই শেয়ারের যদি দাম পড়ে যায় তো কোম্পানী কোথায় দাঁড়াবে! আর কোম্পানী পড়লে আমরা কোথায় যাব? কোম্পানীর সঙ্গে যে আমাদের ভাগ্য জড়িয়ে আছে। কী ভয়ে ভয়ে যে সেদিন সারাদিন কাটালাম গদিতে। মনে হল—আমার যেন চাকরি চলে গেছে। আমি আবার বেকার হয়ে গেছি। দাদার কাছে গিয়ে দাঁড়াব কী করে! কোন মুখ নিয়ে কথা বলব!

কিন্তু বেশিদিন আর সে-রকম অবস্থা থাকে না। কয়লা আবার একদিন ওঠে। সেদিন ঘনশ্যামবাবু দেরি করে গদিতে আসেন। সেদিন আবার হাসি ঠাট্টা চলে আমাদের।

পণ্ডিতজী আবার বলেন, তোমাদের মোহনবাগান জিৎ গিয়া বাঙালীবাবু—তুমি কোন্ দলে?

তিলকচাঁদ বলে, বাঙালীলোগকে সিরফ্ মোহনবাগান হ্যায় পণ্ডিতজী, ঔর কুছ নেহি হ্যায়।

চতুরাননজী বলে, ঔর মছলি ভি হ্যায়—

পণ্ডিতজী বলেন, আজ কেয়া মছ্লি খায়া বাঙালীবাবু?

আমি হাসি। আমার রাগ হয় না কারোর উপর। কোম্পানীর

অবস্থা ভাল হয়ে গেছে। কয়লার দর উঠছে, ঘনশ্যামবাবুর মেজাজ ভাল হয়েছে, আমার চাকরি আছে। মাস গেলেই মাইনে পাব। মাইনে পেয়ে দাদার হাতে গিয়ে টাকাটা দেব। বোনের শাড়ি কেনা হবে, চাল, ডাল, তেল, নুন, আটা কেনা হবে। রাস্তা দিয়ে যেন রাজার মত বুক ফুলিয়ে হাঁটি। আমিও সুখী। আমার চাকরি আছে। আমার ত সব আছে।

সেদিন স্ত্রীর সঙ্গে হেসে কথা বলি।

স্ত্রী এসে কালীঘাটের প্রসাদ দেয়। বলে, তুমি যে-রকম ভাবিয়ে তুলেছিলে, তাই মায়ের বাড়িতে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছিলাম।

আজ আমার এই বাড়ি দেখছেন। সাত বিঘে জমির ওপর এই বাড়ি। এই চাকর বাকর, এই ঐশ্বর্য—তখনকার দিনে আমি এ-সব ভাবতেও পারতাম না। তখনকার কথা আজ আপনাদের বলতে ভালও লাগছে সেইজন্যে। সে যে কী কষ্টে কী ভাবনায় দিন কাটিয়েছি তা আপনারা হয়ত ঠিক বুঝতে পারবেন না। কিন্তু আপনারা ভাবছেন, করতাম ঘনশ্যামবাবুর খাতা-লেখার চাকরি, তা থেকে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী করে এত টাকা করলামই বা কী করে। আপনি এসেছেন কিরণ চৌধুরী সাহেবের রোগ সারাতে, তাই আপনাকে দেখে সেই সব পুরোন দিনের কাহিনী বলবার একটা লোক পেয়েছি।

বাবা বললেন, বলুন, আমাদের এখন কোনও কাজ নেই, একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম এমনি এদিকে, আলাপ হয়ে গেল আপনারসঙ্গে, ভালই হল—

তিনকড়িবাবু বলতে লাগলেন, রোজই আপনাদের দেখি, প্রায়ই

ভাবি ডেকে একটু আলাপ করব, তা ভাবতে ভাবতেই আপনারা চলে যান, আর ডাকা হয় না, আজ ডাকব বলেই সামনে বসেছিলাম।

একটু থেমে বলতে লাগলেন, তখনকার দিনের কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে কবিরাজ মশাই, কী সস্তাগণ্ডার দিন সব। কিন্তু সেই সস্তাগণ্ডার দিনেও যে কী অভাবের মধ্যে কেটেছে আমার কী বলব! একটা ভাল শাড়ি কখনও কিনে দিতে পারি নি প্রাণ ভরে নিজের স্ত্রীকে। মনে হত ঘনশ্যামবাবুর কোম্পানীর অবস্থা যেন আরও ভাল হয়, তাতে আমাদেরও ভাল কোম্পানীরও ভাল। মাঝে মাঝে হাত জোড় করে অদৃশ্য ঠাকুরকে ডাকতাম কেবল—হে ঠাকুর, কয়লার দাম যেন আর না পড়ে আর।

মাসের শেষে মাইনেটা নিয়ে আগে দাদার হাতে দিয়ে তবে অন্য কথা!

দাদা বলত, মাইনে বাড়াবার কথা আর কিছু বলেছে ওরা?

মাইনে বাড়ানোর কথা দূরে থাক, চাকরিটা থাকলেই বাঁচি!

বলতাম, এখন মাইনে বাড়ানোর কথা আর বলি নি দাদা।

—কেন?

বলতাম, এই সেই সেদিন ঘনশ্যামবাবুর মেজাজ খারাপ গেছে, এর মধ্যে যদি মাইনে বাড়ানোর কথা বললে মেজাজ আবার বিগড়ে যায়!

—কিন্তু ওরা যে বলেছিল বাড়াবে?

—বলে তো ছিল, তারপর যে কয়লার শেয়ারের দাম পড়ে গিয়েছিল, অফিসময় হুলস্থুল কাণ্ড বেধে গিয়েছিল ক'দিন—

দাদা বলত, তা শেয়ার মার্কেটের দর তো ওঠা-নামা করবেই, ঘনশ্যামবাবুর কি একটা কারবার, ওঁর লাখ-লাখ টাকা গেলেই বা কী আর এলেই বা কী?

বললাম, পণ্ডিতজী তো ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, বলছিলেন কয়লা যদি পড়ে যায় তো কোম্পানী উঠে যাবে।

—দূর, তাই কখনও হয়। ঘনশ্যামবাবুর ব্যবসা কি এক

পুরুষের ! আজ সাতপুরুষ ধরে ওই কারবার চালাচ্ছে কলকাতায় বসে, কতবার কী ঘটল ওদের কিচ্ছু হল না, ওরা কি আমাদের মত বাঙালী ? ওদের ওতে কিছু হয় না।

সত্যই ঘনশ্যামবাবুকে যতই দেখতাম ততই অবাক হয়ে যেতাম।

পণ্ডিতজীর কাছে শুনতাম ঘনশ্যামবাবুর গল্প। লেখাপড়া কিছুই শেখেন নি। বাবা শিবশ্যামবাবুর সঙ্গে তখন এক-একদিন এসে বসত গদিতে। কতদিন এই গদিবাড়িতে বসে গল্প করেছে পণ্ডিতজীর সঙ্গে। তখন ছোট ছেলেটি ঘনশ্যামবাবু। শিবশ্যামবাবু নিজের গদিতে বসে এখনকার ঘনশ্যামবাবুর মত টেলিফোন নিয়ে ব্যবসা চালাতেন। ভুররা খেতেন। লম্বা লম্বা কলকে ছিল। একটা ফুরিয়ে গেলে আর একটা। দু'টো হাতের আঙুলে জড়িয়ে ধরে লম্বা লম্বা টান নিতেন আর সঙ্গে সঙ্গে কপালের সবগুলো শিরা ফুলে ফুলে উঠত। বড় কৃপণ ছিলেন শিবশ্যামবাবু। ব্যবসা তখন এমন বিরাট ছিল না। অল্প অল্প মূলধন নিয়ে অল্প অল্প শেয়ার ধরতেন। সাবধানী মানুষ ছিলেন শিবশ্যাম-বাবু। তেরটা ছেলে ছিল বাড়িতে। এক-একজনকে এক-একটা ব্যবসায় ঢুকিয়ে গিয়েছিলেন।

শিবশ্যামজী বলতেন, বেশি টাকা রাখব না, ছেলেরা নবাব হয়ে যাবে।

এক ছেলেকে দর্মাহাটায় লোহালক্কড়ের দোকান করে দিয়েছিলেন, এক ছেলেকে বেনে-মসলার কারবার। এমনি সবাইকে। কেউ বসে নেই। সব কারবারই ভাল চলছে। কিন্তু বড়ছেলে ঘনশ্যামকে দিয়েছেন নিজের পৈতৃক কারবারটা।

শিবশ্যামবাবুর আদি পূর্বপুরুষ এসেছিলেন পাটনা না গয়া না ছাপরা—কোন্ একটা জেলা থেকে। তখন সবে কলকাতার পত্তন হচ্ছে। সে সব অনেক দিনের ব্যাপার। একটা গামছার দোকান করে-ছিল ফুটপাতের উপর। ঠিক দোকান নয়। কাঁধে নিয়ে ফেরি করতেন গামছা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে। হ্যারিসন রোডের মোড়ের

মাথায় ডেলি প্যাসেঞ্জারদের ডেকে ডেকে সস্তায় গামছা বেচতেন অল্প লাভে। সেই গামছা-বেচা পয়সায় একটা ছোট দোকান হল দই-হাটায়। তারপর সেই ছোট দোকানটুকুই দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে এই এত পুরুষে মস্ত কোম্পানী হয়েছে। কটন স্ট্রীটে বাড়ি হয়েছে। সে-বাড়িও যে-সে বাড়ি নয়। সাত ছেলের একসঙ্গে হয়েছিল। এখন এক একজন আলাদা বাড়ি করে আলাদা জায়গায় উঠে গেছেন। এখন ঘনশ্যামবাবুর দর্মাহাটার গদিবাড়িতে সারা ভারত-বর্ষের লোক এসে বসে। ব্যাপারী যারা আসে, এসে ওঠে তাদের গদিতে, তাদের জন্যে থাকবার খাবার বন্দোবস্ত আছে। গদিবাড়ির পশ্চিম দিকে ব্যাপারীদের মুনিমরা এসে থাকে। সেখানে ঠাকুর-চাকর আছে। রসুই-ঘর আছে। মুনিমরা সকালে উঠেই গঙ্গায় গিয়ে স্নান সেরে নেয়। তারপর নিচের চায়ের দোকানে ভাড়ে করে চা খেয়ে আসে গিয়ে। যে-যার কাজ-কর্মে বেরিয়ে যায়। বড়বাজার, ডালহৌসি স্কোয়ার, অফিস-পাড়ায় ঘুরে দুপুরবেলা খেতে বসে রসুই-ঘরে। বিরাট রসুই-ঘর।

লম্বা একখানা শোবার ঘর। খাটিয়া পাতা আছে সার-সার। সেইখানেই শোয় সব। ঘনশ্যামবাবুর পুরোন খদ্দের তারা। বহুদিন থেকেই এমনি হয়ে আসছে। হাওড়া স্টেশনে নেমে সোজা এসে ওঠে ঘনশ্যামবাবুর গদিবাড়িতে।

চেনা-জানা লোক সব।

ঠাকুর চিনতে পারে সবাইকে।

—আজকে কি খানা হয়েছে চৌবেজী?

ঠাকুর বলে, রহড় ডাল ঔর ভিণ্ডিকা ভাজি আর চাপাটি।

—রাতমে কেয়া বানায়গা?

—খিচড়ি।

—খিচড়িমে থোড়া মিরচা জেয়দা ডাল্না। বাংলা দেশে থেকে তুমি বাঙালী হয়ে গেছ চৌবেজী, একদম বাঙালী বন্ গয়া।

ঠাকুরও হাসে, নোকরও হাসে, মুনিমজীও হাসে।

বলে, কলকাত্তা আজব ছুনিয়া চৌবেজী, ছাপ্পান সাল ধরে কলকাত্তায় আসছি চৌবেজী, য়্যায়সা শহর ম্যায় কভি নেহি দেখা— তোমার শিবশ্যামবাবু বড় ভাল আদমী থে, রাজা আদমী থে। উ জমানা মে...

তারপর জিজ্ঞেস করে, ঘনশ্যামবাবুর তবিয়ৎ তো আচ্ছা ?

—নেহি হুজুর।

ঘনশ্যামবাবুর তবিয়ৎ কদিন ধরে ভাল যাচ্ছে না। গদিবাড়িতে আসতে পারেন নি ক'দিন। পণ্ডিতজী হেড মুন্সী আসে। চতুরাননজী আছে, তিলকচাঁদজী আছে,—ঔর একঠো বাংগালীবাবু ভি আছে—

সকাল থেকেই হৈ চৈ পড়ে যায় গদিবাড়িতে। যারা বাইরের লোক আসে স্টেশন থেকে, তারা কলতলায় গিয়ে ভিড় করে। রসুই-ঘর ধোয়া মোছা হয়। জমাদার এসে সমস্ত বাড়িখানা ঝাড়পোঁছ করে। আটা মাখতে বসে যায় সুখলাল। বিরাট কাঠের বারকোশের ওপর আটা ঢেলে জল দিয়ে তাল পাকায়। সেই আটাই ছুই হাতের তালুতে ফেলে চাপাটি বানায় চৌবেজী। তারপর চৌকিতে এক-একখানা করে ফেলে আর পাতে দেয় ঘি মাখিয়ে। ভিণ্ডির ভাজি দেয়, রহঢ় ডাল দেয় বাটিতে। গরমে চৌকির সামনে বসে চৌবেজী দর-দর করে ঘামে। ঘামে পৈতে ভিজে যায়।

যারা খেতে বসে তারা বলে, বাস্ বাস্ চৌবেজী—ঔর নেহি—

—চাটনী দেব না মুনিমজী ?

থোড়া আচার দেও চৌবেজী, নিম্বুকা আচার।

রসুই-ঘরে যখন মুনিমজীদের খাওয়া-দাওয়া চলে তখন বড়-বাজারের পাড়ায় তুমুল হৈ-চৈ। নিচের চা-ওয়ালা আসে কেটলি আর ভাঁড় নিয়ে গদিবাড়ির ভেতরে। চা-ওয়ালার অনেক কাজ। দশটা গদিতে চা দিয়ে আসতে হয়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই হাঁকে, গরম চায়।

তার হাঁটার শব্দ শুনেই বোঝা যায় চা-ওয়ালা আসছে। কাঠের সিঁড়িতে দপ্ দপ্ করে আওয়াজ হয়। পণ্ডিতজী চা নেয়, চতুরাননজী চা নেয়। তিলকচাঁদজীও চা নেয়।

তিলকচাঁদ বলে, বাঙালীবাবু চা খাবেন না?

বললাম, আমি চা খাই না।

চা খাব আমি! বরং সে-ক'টা পয়সা বাঁচলে সংসারের মাস-কাবারি সাশ্রয় হবে। চা খেতে গেলেই মনে পড়ত দাদার মুখটা, মনে পড়ত দিদির মুখ, বোনদের মুখ, স্ত্রীর মুখ। সকলেই যেন আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। আমি অপরাধের ভয়ে মাথা নিচু করে সমস্ত ঐশ্বর্য সমস্ত বিলাস থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে ফেলতাম নিজেকে। আমার জন্যে ও-সব কিছু নয়, আমার জন্যে ও সব নিষিদ্ধ। চিরজীবনের মত নিষিদ্ধ।

এমন করেই হয়ত সারা জীবনটা আমার ঘনশ্যামবাবুর গদি-বাড়িতেই কেটে যেত। এমনি করেই হয়ত সারা-জীবন ঘনশ্যামবাবুর গদিবাড়ির উত্থান-পতনের সঙ্গে নিজের ভাগ্যের ওঠা-পড়া মিশিয়ে ফেলতাম। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ভীষণ দুর্ঘটনা! আর আমার জীবনের সব লেন্-দেনের হিসেব এক মুহূর্তে আমূল বদলে গেল। আমি অন্যরকম হয়ে গেলাম।

দুর্ঘটনাটা যদি না ঘটত সেদিন তো আজ আপনারা আর আমাকে এই দেওঘরের বাড়িতে দেখতে পেতেন না। এই বাড়িও

দেখতে পেতেন না আমার। এই আরাম আর শান্তির মধ্যেও শেষ জীবনটা কাটাতে পারতাম না।

তবে শুনুন।

ঘনশ্যামবাবুর একদিন অসুখ হল। তিনি আসতে পারলেন না গদিতে।

আমি যথারীতি হাঁটতে হাঁটতে গদিতে গেছি। সেদিন খুব বৃষ্টি। বৃষ্টিতে অর্ধেক ভিজে গেছে আমার শরীর। গদিতে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন আর কেউ আসে নি। অন্যদিন ঘনশ্যামবাবু একলাই সকলের আগে এসে কাজ আরম্ভ করে দেন। নিজের ঘরটাতে বসে টেলিফোন করেন দশজনকে—খাতাপত্র নিয়ে নিজের কাজে লেগে যান। পণ্ডিতজী এসেই তাঁর ঘরে গিয়ে 'জয়রামজীকি' করে আসে। তারপর কাজের তাড়া। কাজের যুদ্ধে লেগে যায় তখন। তখন আর জ্ঞান থাকে না কারো। রসিদ, ভাউচার ডেলিভেরিখাতা, আমদানি-রপ্তানি, লোক-লস্কর, খদ্দের, পাওনাদার সবাই আসে। গোলমাল হয়। চতুরাননজী একমনে কলম পিষতে পিষতে ঘাড় ব্যথা করে ফেলে। তিলকচাঁদজীরও তখন অন্য কথায় মন দেবার ফুরসত থাকে না। আর আমি একমনে কাজ করে যাই, পণ্ডিতজীকে খুশী করতে চেষ্টা করি। পণ্ডিতজী খুশী থাকলেই আমার ভাগ্য ফিরবে।

সেদিন গদিতে যেতেই পণ্ডিতজী বললেন, বাঙালীবাবু!

ডাক শুনেই কাছে গেল্যাম।

দেখলাম পণ্ডিতজী খুব ব্যস্ত।

পণ্ডিতজী বললেন, কটন ষ্ট্রীটে যেতে হবে তোমাকে একবার।

—কটন ষ্ট্রীটে। কখন ?

পণ্ডিতজী বললেন, আজ সন্ধ্যাবেলা। ঘনশ্যামবাবুর অসুখ,

টেলিফোন করেছিলেন বাবুজী। তিনখানা খাতা নিয়ে যেতে হবে সই আনতে।

বললাম, এখন দিন না, যাই।

পণ্ডিতজী বললেন, এখন কি খাতা তৈরী হয়েছে? ভাউচার জমা হবে তবে তো।

ভাউচার জমা হবে খাতায় তবে নিয়ে যেতে পারব। গদির কাজ শেষ করে খাতাগুলো নিয়ে কটন স্ট্রীটে গিয়ে ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে সই করবার জন্যে নিয়ে যাব। খাতা সেইখানেই থাকবে। পরের দিন আবার আনতে হবে আমাকেই।

চাকরি যখন, তখন যা হুকুম হবে তাইই করতে হবে। না বললে কে শুনবে!

গদিবাড়ি বন্ধ হয়ে গেল সকাল-সকাল। চতুরাননজী আর তিলকচাঁদজী সকাল সকাল ছুটি পেয়ে গেল। আমার কপালেই ছুটি নেই। আমাকে ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে গিয়ে তখন সব বুঝিয়ে দিতে হবে। ভয়ে আমার বুকটা কাঁপতে লাগল। কেন আমাকে এই বিপদের মধ্যে ফেলা! আমি তো নিরিবিলিতে গদিতে কাজ করেই সন্তুষ্ট। আমি পারতপক্ষে ঘনশ্যামবাবুর কাছে যেতে চাই না। চিরকালের ভীরু গো-বেচারা মানুষ আমি। জীবনে আমাদের মতন লোকেরা হেরে যেতেই যেন জন্মেছে। আমরা জয় চাই না, কোনও রকমে টিকে থাকতে চাই। যেন কোথাও কোনও বিপর্যয় না ঘটে, কোনও ব্যতিক্রম না ঘটে। যেন অব্যাহত শান্তিতে নিশ্চিন্তে জীবনটা কেটে যায়। কারোর ক্ষতি করব না আমরা, আমাদেরও যেন কেউ ক্ষতি না করে। এমনি মানুষই আমরা। এই মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি নিয়েই আমি জন্মেছিলাম সংসারে। ভেবেছিলাম এই রকম দুঃখ কষ্ট আর পরের চাকরি করেই দিন কাটবে আমার। এর বেশি কিছু চাইও নি—চাইবার সাহসও কখনও হয় নি আমার। সাহস হবেই বা কী করে! আমরা সত্য পথে থাকি বটে; কিন্তু সত্যি কথা

ফুলিয়ে দশজনের সামনে বলার সাহসও নেই আমাদের। আমরা মনে মনে গর্জাই, মনে মনে আমরা অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার সংকল্প নিই, কিন্তু মুখ ফুটে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে ভয়ে পেছিয়ে আসি। আসলে আমি ভীরু, আমি ভীতু প্রকৃতির মানুষ। চাকরির জন্যেই আমি যেন তৈরী, আর সে-চাকরি তেমন কোনও চাকরি নয়, একটা অশ্রদ্ধার অবজ্ঞার আর অবহেলার চাকরি আমার। আমার অভাবে ঘনশ্যামবাবুর গদি অচল হয়ে যাবে না, আমার অনুপস্থিতিতে কিছু আটক থাকবে না। আমি বাড়িতেও একটা বোঝা, গদিতেও তাই। আমার অভিমান দুর্জয়, অনুভূতি তীব্র, কিন্তু ক্ষমতা সামান্য। দরকার হলে ভাল করে প্রতিবাদ করতেও আমি পারি না। এই এমনি লোককেই পাঠানো হল কটন ষ্ট্রীটে ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে তখন।

কটন ষ্ট্রীটটা আমার জানা ছিল। ওই সব রাস্তা দিয়েই আমি হাঁটতে হাঁটতে গদিতে যেতাম। তখনও সে-রাস্তায় ভীড় খুব। ও-সব পাড়ায় অনেক রাত পর্যন্ত ভীড় থাকে।

পণ্ডিতজীকে আসবার সময় জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঘনশ্যামবাবুকে কী বলতে হবে ?

পণ্ডিতজী বলেছিলেন, কিছু বলতে হবে না, স্রেফ খাতা ক'টা দিয়ে চলে আসবে তুমি।

বলেছিলাম, ঘনশ্যামবাবু কি একতলায় থাকেন ?

পণ্ডিতজী বলেছিলেন, এই সামান্য কাজটুকুও করতে পারবে না ?

একতলায় থাকেন কি দোতলায় কি তিনতলায় তা-ও আমাকে বলে দিতে হবে ? বাড়িতে কি দারোয়ান চাকর কেউ নেই ?

একটু লজ্জায় পড়েছিলাম। বড়লোকের বাড়ি—সামনেই চাকর বাকর দারোয়ান মুন্সী কেউ না-কেউ থাকবেই। তাদের জিজ্ঞেস করলেই চলবে।

নম্বর খুঁজে গিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই দেখি বিরাট বাড়ি, রাস্তার ওপর বাড়িটা সোজা চার-পাঁচতলা ওঠে গেছে। ওপরে সাদা সবুজ রেলিঙের সার। নিচে একটা দরজা। দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই। লোক যাতায়াত করছে সেই দরজা দিয়ে। কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে না কিছু। ভেতরে ঢুকেই দু'পাশে ঘর—আর তারপর একটা উঠোন। উঠোনের চারদিকে সরু সরু লাল-নীল থাম। পাশেই যেন কাঁসর-ঘণ্টা বাজার শব্দ হচ্ছে। মনে হয় যেন কী পুজো হচ্ছে।

আস্তে আস্তে ঢুকলাম ভেতরে।

দেখি সত্যিই পুজো হচ্ছে। বোধহয় বাড়ির কোনও বিগ্রহ। ধূপ-ধুনোয় ঘরটা ঝাপসা হয়ে আছে। একজন কাঁসর বাজাচ্ছে ঝাঁই-ঝাঁই করে। বড়লোকের বাড়ি, নিত্য-পুজোর ব্যবস্থা আছে হয়ত। চারদিকের দেয়ালে নানান ধরনের পট ঝুলছে। হনুমানের লঙ্কাদহন, সীতাহরণ, হনুমান পেট চিরে রামের ছবি দেখাচ্ছে। অনেকক্ষণ খাতা তিনটে নিয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে আছে, একবার ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে প্রণামও করলুম। হাজার হোক, না-ই বা হল বাঙালীদের ঠাকুর—কিন্তু যে-কোনও ঠাকুরই হোক, ভগবান ছাড়া আমার ভরসাই বা কী! অনেকক্ষণ মাথাটা নুইয়ে প্রণাম করলাম। তারপর এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম, কেউ আমার দিকে ফিরেও দেখে না। দু'একজন চাকর-বাকর শ্রেণীর লোক উঠোনের দিক থেকে বাইরে আসছিল, যাচ্ছিল। কার সঙ্গে কথা বলব বুঝতে পারলাম না। আমি স্বভাবভীরু বাঙালী, আর সকলেই হিন্দুস্থানী গোছের লোক। আমাকে যেন তারা দেখেও দেখে না। আমি যেন একটা

মানুষই নই। ভেতর দিকে চেয়ে দেখলাম, বিরাট বাড়ি। চক-মিলানো বাড়ি। চারদিকে রেলিং-ঘেরা বারান্দা—তার পরেই সার সার ঘর সব।

একজন লোক বাইরের দিকে আসছিল।

কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, বাবুজী কোথায়?

লোকটা আমার দিকে ভালো করে না-চেয়েই বললে, ভিতরে যাও।

বলেই লোকটা যেমন যাচ্ছিল তেমনি চলে গেল।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেতরে কোথায় যাব বুঝতে পারলাম না। বারান্দার ধারে একটা আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু তাতে উঠানে আলো বেশি হয় নি। ঝাপ্সা ঝাপ্সা অন্ধকার। অন্ধকারে কেউ কোথাও বসে আছে কি না দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পুজোর কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে আর কোনও শব্দ কানে আসার কথা নয়।

আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকলাম। এদিক-ওদিক চারদিকে চেয়ে দেখলাম। আকাশ পর্যন্ত উঁচু বাড়ি। একটা চৌকা অন্ধকার আকাশ শুধু মাথার ওপর দেখা যায়। আর চারপাশে রেলিং ঘেরা বারান্দা, আগা-গোড়া দোতলা-তেতলা চারতলার বারান্দাতেও কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে টিম্ টিম্ করে। লোকজন কোথাও যদি থাকে তা-ও দেখতে পাবার উপায় নেই। বলতে গেলে অত ঘর—সেই হিসেবে বাড়িতে অনেক লোক থাকবারই কথা। বাড়িটা দেখে মনে হয় যেন গিজ্‌গিজ্ করছে লোক ভেতরে। কিন্তু তা নয়—যত লোক তার চেয়ে বেশি চাকর-বাকর। যত চাকর-বাকর তার চেয়ে যেন বেশি ঘর বাড়িটার মধ্যে।

খাতা তিনটে বগলে নিয়ে কী করব ভাবছি। কাকে জিজ্ঞেস করলে ঘনশ্যামবাবুর সন্ধান পাওয়া যাবে।

আর একজন পাগড়িপরা লোক হন্ হন্ করে আসছিল। হাতে তার একটা বালতি।

বললাম, বাবুজী কোনদিকে থাকেন?

লোকটা আমার দিকে চেয়ে বললে, ভিতরমে যাইয়ে।

বলে সে-লোকটাও যেমন হন্ হন্ করে আসছিল তেমনি হন্ হন্ করে চলে গেল আমাকে পাশ কাটিয়ে।

মুস্কিলে পড়লাম।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। মনে আছে কী বিপদেই যে পড়েছিলাম সেদিন। আজও ভাবলে আমার গাটা কাঁটা দিয়ে ওঠে। চাকরির জন্যে অবশ্য তখন সব করতেই প্রস্তুত আমি। চাকরির জন্যে মান অপমান সবই সহ্য করতে রাজি আছি। চাকরির জন্যেই সেদিন সেই মধ্যবিত্ত সমাজের তিনকড়ি ভঞ্জ সব কিছুর জন্যেই বুঝি প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তখনও কি জানি যে মাথার ওপর সেদিন আমার খাঁড়া ঝুলছে! তখনও ভাবছি কী কুক্ষণে গদি থেকে বেরিয়েছিলাম ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি যাবার জন্যে। কাজটা আর কাউকে দিলেই হত। তিলকচাঁদ কি চাতুরাননজী—ওদের মধ্যে যে-কেউ কাজটা করতে পারত। পণ্ডিতজী নিজেও কাজটার ভার নিতে পারতেন। কিন্তু হয়ত আমার ভালর জন্যেই পণ্ডিতজী আমাকে পাঠিয়েছিলেন ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি। যাতে ঘনশ্যামবাবুর নজরে পড়ি আমি—যাতে আমার মাইনে বাড়ে—যাতে ঘনশ্যামবাবুর কাছে প্রমাণ হয় আমি কাজের লোক।

সিঁড়ির ধারে একটা লোক বসে বসে বোধহয় আফিমের নেশায় ঝিমোচ্ছিল।

তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বাবুজী কোথায় থাকেন?

লোকটা আমার দিকে ভালো করে চাইলে না পর্যন্ত। বললে, উপর—

কোথাকার জল কোথায় গড়ায় মশাই, কেউ কি বলতে পারে! দেখুন না, চাকরি করি সাত টাকা মাইনের, কাজ করব গদিতে আর বাড়ি আসব ছুটির পর। এই-তো নিয়ম। নইলে আমার কপালে কী বিপদ ঘটল তাই বলি। আর সেই একদিনের এতটুকু ঘটনাই আমার

জীবনে এক চরম দুর্ভাগ্য ডেকে আনল। আর দুর্ভাগ্যই বা বলি কী করে আজ? আজ তাকে সৌভাগ্যই বলতে হবে। নইলে সারা জীবন সেই সাত টাকা মাইনেতেই জীবন কাটিয়ে দিতে হয় গদিবাড়ির ভেতরে।

অন্ধকার অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। ঠিক পুরো অন্ধকার নয়—আলো-আঁধারি বলা যায়। টিম্‌টিমে একটা আলো জ্বলছিল সিঁড়ির মাথায়, তার আলোয় সিঁড়িটা যেন আলোর চেয়ে অন্ধকারই হয় বেশি।

সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা লম্বা বারান্দা। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত লম্বা।

এধার-ওধার চেয়ে দেখলাম। মনে হল পশ্চিম দিকের একটা ঘর থেকে কে যেন বেরিয়ে আবার পুব দিকের ঘরে চলে গেল।

মনে হল ডাকি তাকে। ডেকে জিজ্ঞেস করি, ঘনশ্যামবাবু কোন্ ঘরে থাকেন। কিন্তু লোকটা এক-মুহূর্তের মধ্যে যে কোথায় চলে গেল তা ঠিক করতে পারলাম না। আন্দাজ করে বারান্দাটার একটা দিক ধরে চলতে লাগলাম।

এ-কোথায় এলাম আমি? এ কেমন বাড়ি! এত ঘর, এত বড় লম্বা বারান্দা, ঘরের ভেতর নিশ্চয় অনেক লোক আছে। কিন্তু কাকে ডাকি!

বারান্দাটা ধরে বরাবর সোজা চলতে লাগলাম। পাশে এক একটা করে ঘর। ঘরগুলোর দরজা ভেজানো। কোন্ ঘরে ঢুকবো বুঝতে পারছি না। অনেকখানি যেতে একটা বাঁকের মুখে এসে আবার ডানদিকে ঘুরলাম। সেখানেও সোজা লম্বা বারান্দা।

একবার পেছনের দিকে চেয়ে দেখলাম।

কতদূর এসেছি বুঝতে পারলাম না।

মনে হল ফিরে যাই। কোথায় না বলে কয়ে ঢুকছি কে জানে। হয়ত এটা অন্দর-মহল। হয়ত এদিকে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ।

কিন্তু ফিরে যেতেও মন চাইল না। সবাই-ই তো সোজা ভেতরে আসতে বললে। দু'তিন জনকে জিজ্ঞেস করেছি সবাই-তো বলেছে সোজা ভেতরে যাও। তবে কি ভেতরে আসবার আরও সিঁড়ি আছে!

আর একবার দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলাম।

এখানে রাস্তার ট্রামের ঘড়-ঘড় আওয়াজ আর শোনা যায় না। বহু দূর থেকে যেন পুজোর কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। এতবড় বাড়ি—কোন দিক দিয়ে ঢুকে কোন পথে এতদূর এসেছি! এখন ফিরে যেতে চেষ্টা করলেও হয়ত আর ফিরে যেতে পারব না। পথ না দেখিয়ে দিলে হয়ত রাস্তাই চিনতে পারব না।

পাশেই দেখলাম একটা ঘর। দরজাটা ভেজানো।

ভাবলাম যদি সেখানে কেউ থাকে দেখা যাক। জিজ্ঞেস করব তাকেই।

দরজার পাল্লাটা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল।

দেখি ঘরটা বড়। বসবার ঘর। দেওয়ালের গায়ে কিছু ছবি টাঙানো আছে। বেশির ভাগই ঠাকুর দেবতার ছবি। তিনটে সোফা—কয়েকটা চেয়ার। একটা টেবিল। মেঝের ওপর কার্পেট পাতা।

মনে হল ঘরে যেন এখনি কেউ ছিল। একটু আগেই কোথাও চলে গেছে।

ভাবলাম এখানে অপেক্ষা করলেই হয়ত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কোনও চাকর বাকর। দেখে তো মনে হয় এটাই ঘনশ্যাম বাবুর বসবার ঘর। এখনি হয়তো কেউ এসে পড়বে।

কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল।

পাশের ঘরেই যেন কার গলা শুনতে পেলাম। মেয়েমানুষের গলা।

হিন্দুস্থানী ভাষাটা বলতে আমি ভাল পারতাম না। কিন্তু হিন্দুস্থানীদের গদিতে কাজ করে করে বুঝতে পারতাম ভাল।

কে যেন বলে উঠল, লজ্জা করে না তোমার ? শরম লাগে না তোমার ?

অদ্ভুত মিষ্টি মেয়েলি গলা। হিন্দি ভাষায় কথা বলছে। খুব রাগ-রাগ ভাব।

আর একজন পুরুষের গলা পেলাম।

বলছে, তুমি বিশ্বাস কর জয়ন্তীয়া, আমার কথা শোন।

মেয়েটি বললে, থাম, বেওকুফ কোথাকার!

—ছিঃ, অত চেঁচিও না, কেউ শুনতে পাবে।

মেয়েটি বললে, কেউ শুনতে পাবে না, আজ কেউ নেই বাড়িতে, সব সাদির নেমন্তন খেতে গেছে—তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি।

পুরুষটা বললে, কেন, আমি তো আসি, আমি তো না ডাকতেই আসি।

—থাম তুমি, একটা লম্পট কোথাকার, কোথায় যাও তুমি আজকাল তা জানি না ভেবেছ!

পুরুষটা বললে, আমি আবার কোথায় যাই। আমি তো নিজের কাজ ছাড়া আর কোথাও যাই না।

মেয়েটি যেন খুব রেগে উঠল।

বললে, তুমি কোথায় যাও তা আমি জানি না ভেবেছ! পরশু রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে ? সারারাত বাড়িতে আসো নি তুমি। সারারাত বাইরে কার কাছে কাটাও তা আমি জানি না ভেবেছ ? আমি সব খবর পাই, আমার কাছে ঢাকতে চেষ্টা করো না।

আমি খানিকটা অবাক হয়ে গেলাম কথা-বার্তা শুনে। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। এ কি স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া! স্ত্রী স্বামীকে বকছে ? আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মধ্যে আমি কেন কান দিই ? আমার কী অধিকার আছে পরের গোপন কথা শোনবার!

একবার ভাবলাম চলে যাই, কিন্তু শোনবার লোভও হচ্ছিল। আমাদের মতন মধ্যবিত্ত লোক যারা, তাদের স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হয় জানি। ঝগড়া হয়, কথা বন্ধ হয়ে যায় কিছু দিন। তারপর আবার ভাব হয়ে যায়। কিন্তু বড়লোকদের মধ্যে ?

বড়লোকদের তখন দূর থেকেই দেখছি কেবল। গাড়ি চড়ে যেতে দেখেছি তাদের। বিরাট গাড়ি—তার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসে চলেছে। তাদের সাজ-পোশাকের বাহার, তাদের গয়না-গাঁটি, তাদের হাব-ভাব চাল-চলন দূর থেকে দেখে মনে মনে হিংসে হয়েছে।

ভেবেছি ওদের বোধহয় কোনও সমস্যা নেই জীবনে। তাদের যত দেখেছি, নিজের জীবনের ওপর তত ঘৃণা জন্মেছে। ওদের মধ্যে বোধহয় এমন ঝগড়া হয় না আমাদের মত। ওদের জীবনে কেবল সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য, কেবল বিলাস আর বৈভব।

রাস্তায় একলা হাঁটতে হাঁটতে বড়লোকের দোতলা-তেতলা বাড়ির জানলায় কোনও বউকে দেখে নিজের বউ-এর কথা মনে পড়েছে। কী প্রশান্ত চেহারা সব—কী রূপ। কী বাহার! ভিজে চুল এলিয়ে দিয়েছে, কপালে সিঁদুরের টিপ, ঠোঁট দুটো পান খেয়ে লাল টক্ টক্ করছে। হয়ত স্বামী অফিসে গেছে, তারই পথ চেয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে।

আমার স্ত্রীকেও যদি এমনি বাড়ি দিতে পারতাম, অমনি গয়না-শাড়ি দিতে পারতাম, অমনি বিলাস আর অবসর দিতে পারতাম! বাড়িতে এসে কতবার দেখি স্ত্রী ময়লা শাড়ি পরে তখনও সমানে খেটে চলেছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পর্যন্ত সে-খাটার আর বিরাম নেই। ক্ষারকাচা, বাড়ির লোকের রান্না-বান্না, ঘর-মোছা, বাসন মাজা, কী নয়। দুই বোন, বউদি, আমার নিজের বউ—সকলেই খেটে খেটে পরিশ্রান্ত। তবু একটু সচ্ছলতা আসে না। তবু একটু শান্তি পায় না। আর ওরা: কেমন আছে! কেমন গাড়ি করে

বেড়াতে যায়। কেমন হাসি-হাসি মুখ। কেমন পরিচ্ছন্ন, কেমন প্রশান্ত রূপ!

একদিন বড়লোকদের সম্বন্ধে এই ধারণাই ছিল।

হঠাৎ যেন সব গোলমাল হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে তখনও কথা কাটাকাটি চলছে।

মেয়েটি হঠাৎ বললে, আমার সঙ্গে তুমি এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারলে? [illegible] আমি তোমার জন্যে কী করেছি তুমি ভুলে গেছ?

লোকটি বললে, না না, [illegible] আমার জন্যে অনেক করেছে জয়ন্তীয়া, আমার সব মনে আছে —সব।

মেয়েটি বললে, ছাই মনে আছে, টাকার জন্যে যখন তোমার কারবার বন্ধ হচ্ছিল, তখন বাবুজীকে বলে তোমায় আমি পাঁচ হাজার টাকা পাইয়ে দিই নি? তোমার যখন অসুখ করেছিল, রাত্রিতে যন্ত্রণার চোটে ঘুমুতে পারতে না, তখন কে ডাক্তার-ওষুধের খরচ দিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছিল?

লোকটা কিছু কথা বলল না এবার।

মেয়েটি আবার বলতে লাগল, যখনই তোমার টাকার দরকার হয়েছে, তখনই আমি তোমায় তা দিয়েছি, যখনই তোমার কারবারে লোকসান হয়েছিল আমিই জুগিয়েছি টাকা, বাবুজীকে না বলে তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা দিয়েছি। সব তুমি ভুলে গেলে?

লোকটা বললে, আমাকে কি তুমি এই বলতেই এখানে ডেকে নিয়ে এসেছ আজ?

মেয়েটি বললে, আমার টাকায় তুমি অন্য মেয়েকে গয়না কিনে দেবে, আর আমি চুপ করে থাকব—না ?

কথাগুলো কানে আসতেই আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সংসারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তো ঠিক এরকম হয় না। শুধু আমাদের মতন গরীব লোকেদের মধ্যেই নয়, কোনও সমাজেই হয় না। তবু কি জানি, সব সমাজের খবর তো তখন জানতাম না। বড়লোকদের দূর থেকেই দেখেছি, তাদের সঙ্গে কখনও তো ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার সুযোগ পাই নি। তাদের বাড়ির মধ্যেও কখনও ঢুকি নি তার আগে। সেখানে তারা কী ভাবে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে তার পরিচয় জানতাম না তখন। আমাদের সংসারে সারাদিন খাটুনির পর দেখেছি যখন বাড়িতে ফিরে গিয়েছি, আমার স্ত্রী এসে হাত মুখ ধোবার জল দিয়ে গেছে। সারাদিন কাজের খবর নিয়েছে। বলেছে আজ এত দেরী হল যে আসতে ? কিম্বা হয়ত বলেছে, ভাত হয়েছে—দেব ?

কিন্তু এ-সব সংসারের কথাই আলাদা। বিশেষ করে আবার যখন বাঙালী নয়। এদের স্বামী-স্ত্রী হয়ত অন্য ধরনের।

কিন্তু তখনও তো আসল ব্যাপার জানতাম না। কে সরযূপ্রসাদ, কে জয়ন্তীয়া—সরযূপ্রসাদের সঙ্গে জয়ন্তীয়ার সম্পর্কটা যে কী, তা-ও তখন জানতাম না। কেন যে সরযূপ্রসাদ এ-বাড়িতে আসে, কেন জয়ন্তীয়া তাকে ডেকে পাঠায়—কিছুই জানতাম না। আমি শুধু তখন অবাক হয়ে ভাবছি এ-কোথায় এলাম। কোন্ রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম নিজে। এখান থেকে যেতেও পারি না অথচ আবার এখানে থাকাও অন্যায়! বুঝুন আপনি তখন আমার অবস্থাটা! আজ এই ঘরে বসে এতদিন পরে সেদিনকার সেই ঘটনার কথা ভাবলেও যেন আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু সেদিন সে-বাড়ি ছেড়ে আমার চলে আসার ক্ষমতা ছিল না। আমাকে ঘনশ্যামবাবুর গদিতে চাকরি করতেই হবে। না করলে আমার চলবে না।

না-করলে আমাদের সংসার অচল হয়ে যাবে। না করলে আমি আমার স্ত্রী আমাদের সমস্ত পরিবার উপোষ করবে।

সেইজন্যেই খাতা তিনটে বগলে নিয়ে ঘরের মধ্যেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার পা দু'টো তখন থর থর করে কাঁপছে। ঘরের বাইরে কাউকে দেখছি না যাকে জিজ্ঞেস করব যে ঘনশ্যামবাবু কোন ঘরে থাকেন।

একবার ঘরের বাইরে তাকাচ্ছি, আর একবার কি করব ভাবছি।

মনে হল দাঁড়িয়ে ওই কথাগুলো শোনাও যেন অন্যায় আমার পক্ষে। বাড়িসুদ্ধ লোক সবাই বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গেছে তো জয়ন্তীয়া যায় নি কেন? সরযূপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করবে বলে?

কে সরযূপ্রসাদ? কীসের জন্যে তাকে জয়ন্তীয়া এই সন্ধ্যেবেলা ডেকে পাঠিয়েছে?

আপনি হয়তো ভাবছেন আমি সরযূপ্রসাদের নাম জানলাম কেমন করে! সত্যিই, লোকটার নাম যে সরযূপ্রসাদ তা আমি তখনও জানতাম না।

জানতাম ওরা স্বামী-স্ত্রী, দুজনের মধ্যে দাম্পত্য-কলহ হচ্ছে। স্ত্রী হয়ত স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতার জন্যে অনুযোগ করছে। কিন্তু আমার সে-সব কথায় তখন থাকবার দরকার ছিল না—আগ্রহও ছিল না।

আগ্রহ ছিল না ভয়ের জন্যে। মালিকের বাড়ির মেয়ে-বউ-জামাই-এর ব্যাপারে থাকা অন্যায়। তাতে চাকরি চলে যেতে পারে জানা-জানি হলে।

হঠাৎ ভেতর থেকে যেন কথা কাটাকাটি আরও বেড়ে উঠল।

লোকটা বলে উঠল, তুমি কি চাও যে তোমার কথামত আমি চলব?

মেয়েটি বললে, হ্যাঁ, আমার কথামতই তোমাকে চলতে হবে।

—কখনও নয়।

—আমার কথা না-শুনলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

—আমাকে ভয় দেখাচ্ছ নাকি তুমি?

—আমাকে তুমি তেমন মেয়ে পাও নি যে আমি তোমার কথাই মেনে নেবো।

লোকটা বললে, আমিও বলছি তোমার কথা আমিও মেনে নেব না।

—মানবে না? আলবৎ মানবে! মানতে তোমাকে হবেই। তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার এইসব কাণ্ড সহ্য করব?

লোকটা বললে, সহ্য আমিও করব না আর।

মেয়েটা বললে, সহ্য করবে না মানে? কে তোমার কারবার দাঁড় করিয়ে দিয়েছে? ছিলে তো পথের ভিখারি, খেতে পেতে না, ফুটপাতে গামছা বিক্রি করতে, এখন যে আপিস করেছ, টেলিফোন করেছ, শেয়ার কেনা-বেচা করছ—কার টাকায় শুনি? কত টাকা বাবুজীর কাছে ধার নিয়েছিলে? কত সুদ দিয়েছ তার? হিসেব রেখেছ?

—কে চেয়েছিল তোমার টাকা?

মেয়েটি বললে, কে চেয়েছিল? শরম লাগে না তোমার কথা বলতে? আবার বলছ—কে চেয়েছিল তোমার টাকা?

লোকটা বললে, জামা ধরে টানছ কেন?

মেয়েটি বললে, খুব সিল্কের জামা পরেছ? কেন, জান না তোমার সব তেল ভেঙে দিতে পারি? জান, তোমার সব জারিজুরি বার করে দিতে পারি। তুমি ভেবেছ কি আমাকে।

লোকটি বললে, ছাড় পথ ছাড়, আমার কাজ আছে, আমি যাই।

মেয়েটি বললে, কেমন করে যেতে পার যাও দিকি নি, দেখি।

—কেন, তুমি যেতে দেবে না আমাকে?

মেয়েটি বললে, আমার কথার জবাব না দিয়ে যেতে পারবে না।

—কী তোমার কথা বল।

মেয়েটি বললে, তুমি ভেবেছ কি? তুমি ভেবেছ আমাকে ঠকিয়ে তুমি পার পাবে? আমার চোখে ধুলো দিয়ে তুমি রেহাই পাবে?

লোকটি বললে, আমাকে তোমার এই প্যান্‌প্যানানি শোনাবে বলে ডেকেছিলে নাকি?

মেয়েটি বললে, প্যান্‌প্যানানি?

লোকটি বললে, না তো কী! তোমার কাছে এলেই তুমি তো কেবল ওই সব আরম্ভ কর আজকাল! তোমার মুখে তো অন্য কথা নেই কিছু।

মেয়েটি বললে, আজ তুমি এই কথা বলছ। একদিন তুমিই না আমার একটুকরো হাসির জন্যে জীবন দিতে পারতে বলেছিলে! একদিন : আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে বলে আমাদের বাড়ি এসে ঘুর-ঘুর করতে!

লোকটি বললে, হ্যাঁ তা করেছি—কিন্তু তুমি আর সে-রকম নেই—তুমি বদ্‌লে গেছ!

মেয়েটি বললে, বদলে গেছি? আমি বদলে গেছি, না তুমি বদলে গেছ?

লোকটি বললে, আমি যদি বদ্‌লেও থাকি, সে তো তোমার জন্যে!

মেয়েটি হঠাৎ রেগে উঠল আরও।

বললে, নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী কোথাকার।

—গালাগাল দিয়ো না—সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে।

মেয়েটি বললে, শুধু গালাগালি! তোমাকে খুন করে ফেললেও আমার শান্তি হবে না।

লোকটি বললে, পথ ছাড়, আমি যাব, আমার কাজ আছে।

মেয়েটি বললে, থাম, এত সহজে তোমায় আমি ছাড়ব না।

আপনি তখনকার মনের অবস্থা আমার কল্পনা করতে পারবেন না, কবিরাজ মশাই। আজ আমার বয়েস হয়েছে, আরও অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু জেনেছি, অনেক কিছু শিখেছি। কিন্তু সেদিন আমার কম বয়স, সেদিন আমার নতুন বিয়ে হয়েছে—সেই অবস্থায় আমি সেখানে আর কী করতে পারতাম! আমি এইটুকু বুঝেছিলাম যে যারা কথা বলছে তারা স্বামী-স্ত্রী নয়। তাদের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরেছে তা-ও বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমি যেন কীরকম হয়ে গিয়েছিলাম! সেখান থেকে চলেও আসতে পারছিলাম না যেন। যেন আমার পা দু'টো কেউ পেরেক মেরে ঘরের মধ্যে আটকে দিয়েছে। আমার আর নড়বার ক্ষমতা নেই যেন। আর তা ছাড়া আমি সে-ঘর থেকে বেরিয়েই বা কোথায় যাব? অতবড় বাড়ির মধ্যে হারিয়েই যাব হয়ত। কোথা দিয়ে ঢুকে কোন্ সিঁড়ি দিয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম তা-ও ঠিক করতে পারার কথা নয়। যদি সেই অবস্থায় কেউ আমাকে দেখে ফেলত তা-হলেও আমার অপরাধের মাত্রা কিছুই কমত না। কোথাকার বাইরের একটা পুরুষ মানুষ ও-বাড়ির অন্দরমহলের ভেতর ঢুকে পড়েছিই বা কী করে। কী কৈফিয়ৎ আমি দেব।

আপনি হয়তো বলবেন আমারও কিছু দুর্বলতা ছিল নিশ্চয়ই। আমারও কৌতূহল ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার পারিবারিক অবস্থা, আমার মানসিক গঠন, আমার আর্থিক সঙ্গতির কথা ভাবলে আর সে-কথা আপনি বলবেন না। যার চাকরি যাবার ভয় দিনরাত, তার কাছে ও-রকম কৌতূহল হওয়া তো বিলাস। বিশেষ করে আমার

মালিকের যে বাড়ি ওটা। সেখানে কোনও বেসামাল কাজ করার কথা যে ভাবাই যায় না।

ভাবলাম ঘর থেকে থেকে বেরিয়ে পড়ি একবার। তারপর যেমন করে পারি সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা যে-দিক দিয়ে ঢুকেছিলাম সেইখানে গিয়ে আবার ভাল করে জিজ্ঞেস করি। কিংবা কাউকে বলি ঘনশ্যাম-বাবুর কাছে পৌঁছিয়ে দিতে। এমনি ভাবে একলা বাড়ির অন্দর-মহলে ঢুকে পড়া উচিত হয় নি।

ঘর থেকে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়লাম। তারপর আন্দাজ করে যেদিক দিয়ে এসেছিলাম সেইদিকেই চলতে লাগলাম। কোথাও কোনও লোকের সাড়াশব্দ নেই। পাশাপাশি সার সার ঘর। সব ঘরগুলোর দরজা বন্ধ। হাঁ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেই বারান্দার ওপর। ওপরে চেয়ে দেখলাম। কোনও কোনও ঘরে আলো জ্বলছে। নিচের একতলাটা পুরোপুরি অন্ধকার, সেখানেও জন-মানুষের চিহ্ন নেই। বাইরের পুজোর দালানে তখন আরও জোরে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। ঠিক কোন্ দিক দিয়ে গেলে যে সেখানে পৌঁছানো যাবে ঠাহর করতে পারলাম না। কোন্ সিঁড়ি দিয়ে নামলে যে সেদিকে গিয়ে পৌঁছতে পারব তা-ও বুঝতে পারলাম না। হয়ত যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আরো অন্দর মহলের ভেতর ঢুকে পড়ব—তখন আরও বিপজ্জনক।

আস্তে আস্তে আবার যে-ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম সেই ঘরের দিকেই এলাম। তখন ভেতরে আলো জ্বলছে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর মনে হল আর কেউ-ই সে ঘরে ঢোকে নি। হতাশ হয়ে আবার চারদিকে চাইতে লাগলাম—যদি কারো দেখা পাওয়া যায়। এক-একবার মনে হয় হয়ত একজন লোক এ-দিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে—কিন্তু ডাকবার আগেই সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়, তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। চিৎকার করে যে কাউকে ডাকব তারও সাহস পেলাম না। সামান্য গদিবাড়ির চাকরে, মালিকের

বাড়ির ভেতরে এসে চিৎকার করে ডাকবার সাহস কেমন করে পাব বলুন।

শেষ পর্যন্ত ভাবলাম চলেই যাব। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক।

বারান্দাটা দিয়ে বরাবর হাঁটতে লাগলাম সোজা। এঁকে বেঁকে এদিক থেকে ওদিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। একজায়গায় এসে রাস্তা বন্ধ। সেখানে মাথার ওপর বাতি জ্বলছে টিম্ টিম্ করে।

আশ্চর্য বটে! এত বড় লোকের বাড়ি। একটা লোকজনও থাকতে নেই! বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গেছে কি সকলেই? আর চাকর বাকর তারাও সব পুজোর দালানে গিয়ে জড়ো হয়েছে! এত ভক্তি তো ভাল নয়। যদি চোর আসত! বড় লোকের বাড়িতে নিশ্চয় গয়না-গাটি-টাকা-কড়ি আছে সিন্দুকে। যদি আমি না হয়ে চোর ডাকাত কেউ আমার মত ঢুকে পড়ত এমনি করে।

আর ঘনশ্যামবাবু? তিনিই বা কোথায়? তাঁর অসুখ। অসুখের জন্যই তিনি গদিতে যেতে পারছেন না। তাঁর অসুখের জন্যেও তো কেউ থাকবে। তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করবার লোকও তো দরকার।

আজ এতদিন পরে সেইসব কথা শুনতে আপনাদের ভাল লাগছে কি না জানি না। আপনারা এসেছেন, তাইআপনাদের শুনিয়েই আমি আবার যেন সেই সব দিনে ফিরে যেতে পারছি। সে-সব দিন আমার খুব সুখের নয় জানি; অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যেই আমার সে-সব দিন কেটেছে অবশ্য। এখন নিশ্চয়ই খুব সুখে আছি, কিন্তু অতীত যত দুঃখেরই হোক, তার বোধ হয় একটা মোহ আছে। সেই মোহ

যত বয়স বাড়ে ততই বেড়ে চলে। নইলে আপনাদের ডেকে বসিয়ে কেন আমি সেই সব দিনের কথা বলছি। আপনি বুড়ো হয়েছেন আপনি নিশ্চয়ই আমার কথা বুঝতে পারবেন।

বাবা বললেন, না না, আপনি বলুন, আমার তো শুনতে খুবই ভাল লাগছে।

তিনকড়িবাবু বললেন, ভাল না লাগলেও আমি আপনাদের সে-সব কথা শোনাব—সকলে তো সব বোঝে না! সকলকে সব কথা বলেও আনন্দ পাওয়া যায় না, আপনি প্রবীণ লোক, চিকিৎসক, আর একজন প্রবীণ চিকিৎসকের ব্যাথাটা বুঝবেন।

বাবা বললেন, কিন্তু আপনি চিকিৎসকই বা হলেন কী করে?

তিনকড়িবাবু বললেন, সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছি আমি। সেই ঘনশ্যামবাবুর গদিবাড়ির সামান্য কেরানী থেকে আমার ডাক্তার হওয়ার কাহিনীটাই আপনাকে বলছি। সেদিন যদি ঘনশ্যামবাবুর অসুখ না হত, আর আমি যদি খাতা সই করাতে ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে না যেতাম তো আমার চিকিৎসক হওয়াও হত না, আর এই এত সম্পত্তি, এই বাড়ি এই ঐশ্বর্যের মালিক হওয়া যেত না। আমার দুই ছেলে, তারা মোটা মাইনের চাকরি করে পঞ্চকোট স্টেটে। পঞ্চকোটের রাজা তাদের ডেকে চাকরি দিয়েছেন। সবই সেই রাত্রের ঘটনার জন্যে। সেই রাত্রে যদি আমি অমন বিপদে না পড়তাম, তাহলে সারাজীবন বোধহয় যেন তিলকচাঁদ আর চতুরাননজীর মত খাতা লিখেই সেই গদিবাড়িতেই কাটাতে হত আমাকে।

—তারপর?

তিনকড়িবাবু বলতে লাগলেন, মানুষের সংসার সম্বন্ধে আমার আগে কিছু অভিজ্ঞতা ছিল না। বাইরে থেকে যা দেখতাম সেই-টেকেই সত্য বলে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু চোখের দৃষ্টির আড়ালে যে আর একটা সংসার আছে যেখানকার আইনকানুন সম্পূর্ণ আলাদা, সেটা চোখে দেখতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তার যে সবখানিই

সত্যি তাতেও তো সন্দেহ নেই। বড়লোকদের আগে আমি যে-চোখ দিয়ে দেখতাম সেই ঘটনার পর থেকে তা সম্পূর্ণ বদলে গেল।

মনে আছে আদালতে সেদিন ভীষণ ভীড়। চারদিকে চোখ চেয়ে চাইতেও আমার লজ্জা হচ্ছিল। আমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রেলিংটা ধরে থর থর করে কাঁপছিলাম।

ওদের উকীল জিজ্ঞেস করছিল, তুমি আসল ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে না ঢুকে যে তার পাশের বাড়িতে ঢুকেছিলে, সেটা কি ইচ্ছে করে?

আমার তখন বুক-পা-হাত শরীর সমস্ত কাঁপছিল।

বলেছিলাম, আমি জানলে ও-বাড়িতে ঢুকতাম না।

—সরযূপ্রসাদের কাছে কখনও তুমি টাকা ধার নিয়েছিলে?

বলেছিলাম, সরযূপ্রসাদের নামই কখনও শুনি নি আমি—দেখা বা টাকা ধার করা দূরের কথা।

—কত টাকা মাইনে পাও তুমি ঘনশ্যামবাবুর গদিতে?

—সাত টাকা।

—সাত টাকায় তোমার চলে কী করে? নিশ্চয় টাকা ধার করতে হত?

—দাদা চাকরি করেন, দু'জনে মিলে অতি কষ্টে-স্বষ্টে সংসার চালাই আমরা।

—কখনও বড়লোক হতে ইচ্ছে হয় নি তোমার? বড়লোকদের মত গাড়ি চড়তে ইচ্ছে হয় নি?

—ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু ভগবানের ওপর ভরসা করে বেঁচে আছি, তিনি যদি দেন তো বড়লোক হব।

—বড়লোক হবার জন্যে কখনও বড়লোকদের টাকা সরিয়ে নেবার মতলব হয় নি তোমার ?

—আমরা নিম্ন মধ্যবিত্ত লোক, আমাদের অত সাহস নেই।

—সাহস থাকলে পারতে ?

এ-প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব বলুন! সাহস থাকলে তো সবই পারতাম। সাহস থাকলে কি আর সাত টাকা মাইনের চাকরিই করতাম গদিবাড়িতে!

আপনি হয়ত ভাবছেন কোর্টের ব্যাপার কীসে এল—আমিই বা কাঠগড়ায় আসামী হতে গেলাম কেন ?

আমার দাদাও তাই ভেবেছিল। শুধু দাদা নয়। জানা-শোনা পরিচিত বন্ধুবান্ধব সবাই সেদিন সেই কথাই ভেবেছিল। সারাজীবন ধরে চাকরি করব আর শান্তশিষ্টের মত মাসকাবারে মাইনেটা এনে বাড়িতে দেব, এইটেই চিরাচরিত জীবনযাত্রার আদর্শ চিত্র। এই মানুষকেই সবাই সম্মান করে প্রশংসা করে। এমন লোককেই মানুষ জামাই করতে চায়—এমন পরিচয় দিতে আনন্দ হয়। কিন্তু খুনের আসামী ?

উকীল আরও জিজ্ঞেস করেছিল, সরযুপ্রসাদকে তুমি অনুসরণ করেছিলে কোথা থেকে ?

বললাম, আমি তাকে অনুসরণ করি নি।

—তাহলে এত বাড়ি থাকতে, ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি কাছে থাকতে ওই জয়ন্তীয়াদের বাড়িতেই বা তার পেছন-পেছন ঢুকেছিলে কেন ?

বললাম, তার পেছন-পেছন তো ঢুকি নি।

—তাহলে কী করে সদর উঠোন পেরিয়ে একেবারে ভেতর-বাড়ির অন্দরমহলে, একেবারে মেয়ে-মহলে ঢুকেছিলে ?

বললাম, ভুল করে।

—আচ্ছা ধরে নিলাম ভুল করে। কিন্তু বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে তখন বাড়ির সবাই চলে গিয়েছিল এ-কথা জানলে কী করে ?

—আগে জানতাম না। দু'জনের কথাবার্তায় জানতে পারলাম।

—তখন বুঝি ঠিক করলে যে সরযূপ্রসাদের ওপর চরম প্রতিশোধ নেবার ওই-ই সুযোগ?

—আপনি কী বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আচ্ছা আমি ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোমার আসল উদ্দেশ্য ছিল সরযূপ্রসাদের উপর চরম প্রতিশোধ নেওয়া, তাই সন্দেহ এড়াবার জন্যে তুমি ঘনশ্যামবাবুর হিসেবের খাতা নিয়ে ও-বাড়িতে গিয়েছিলে—এই না?

বললাম, আমাকে পণ্ডিতজী ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি যেতে বলেছিলেন বলেই গিয়েছিলাম—আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না আমার।

—কিন্তু কী করে জানলে যে তোমার মহাজন সরযূপ্রসাদও ঠিক সেই সময় ওবাড়িতে যাবে?

বললাম, সরযূপ্রসাদ তো আমার মহাজন নয়।

এ-সব আইনের কূট তর্ক শুনিয়ে আমি আপনাদের বিরক্ত করব না। এ-সব পরের ঘটনা। কিন্তু জীবনের পরে ঘটলেও আগেই তো তার বীজ পোঁতা হয়ে যায়। কবে আমার ভাগ্যদেবতা আমাকে নিয়ে কী খেলা খেলবেন বলে যে ভিত তৈরী করছিলেন তা তো কারও জানবার কথা নয়। আমরা মানুষ তাই হঠাৎ দুর্ঘটনায় আমরা বিচলিত হয়ে উঠি। কিন্তু সেদিন কী জানতাম সে রাত আমার একদিন পোহাবে, সে বিপদ থেকেও একদিন উদ্ধার পাব। সেদিনের দুর্ভাগ্যের সময়ে কিন্তু মনে হয়েছিল এর থেকে কোনও দিনই আর মুক্তি পাব না। সে-সব দিনের আমার মনের অবস্থা যদি বর্ণনা দিই তো ভাববেন আমি পাগলই বা হয়ে যাই নি কেন! মাথার ওপর অতবড় সংসার, বাড়িতে অবিবাহিতা বোন, স্ত্রী—তারপর আছে লোক-লজ্জা, সমাজের চোখে—সমস্ত!

যা'হক পরের কথা পরে হবে। আগে সেই রাত্রের কথা বলি।

আবার সেই ঘরে এসে দাঁড়ালাম। ভাবলাম যাদের গলা শুনতে পাচ্ছি তাদের দু'জনের মধ্যে কেউ-না-কেউ হয়ত আমাকে দেখতে পাবে। যদি ঘরের বাইরে আসে একবার জিজ্ঞেস করব ঘনশ্যামবাবুকে কোন ঘরে গেলে পাব।

ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ যেন একটা চাপা গোঙানির শব্দ কানে এল।

সেই দু'জনের কথাবার্তা যেমন চলছিল তা আর নেই।

আমি কি করব বুঝতে পারছিলাম না।

খানিক পরে গোঙানির শব্দ আস্তে আস্তে থেমে এল। মনে হল সমস্ত বাড়িটা যেন হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। ঘনশ্যামবাবুর গদিবাড়িটায় সাত টাকা মাইনের খাতা-লেখা কেরানী সেই টিম্‌-টিমে আলোর নিচে নিঃসঙ্গ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ ধরে। তার মাথাটা ঘুরতে লাগল হঠাৎ। কী হল ভেতরে! এতক্ষণ এত ঝগড়া চলছিল—সব তো এমন করে থেমে যাবার কথা নয়। কী হল হঠাৎ! সব নিস্তব্ধ। বাইরে পুজো-বাড়িতে কাঁসর-ঘণ্টা বাজলেও তা তখন সেখান থেকে আর শোনা যাচ্ছে না। কিংবা হয়ত তখন আর তা কানে পৌঁছোবার মত অবস্থা নয়।

হঠাৎ ভেতরের দিকে একটা দরজা দড়াম করে খুলে গেল।

আর দরজা খুলে একটা মেয়ে বেরিয়ে আসছিল।

তিনকড়িবাবু অবাক হয়ে চেয়ে দেখলেন। দেখলেন মেয়েটার ভয়ার্ত চোখ দু'টো তাকে দেখেই হঠাৎ চমকে উঠেছে।

—কে?

তিনকড়িবাবু বললেন, মেয়েটার চোখে মনে হল সুর্মা আঁকা। কিংবা চোখ দু'টোতে যেন কে কালি লেপে দিয়েছে। ঠিক বুঝতে পারলাম না কোন্‌টা ঠিক। ফরসা টক্‌ টক্‌ করছে গায়ের রঙ। সে রঙ কী-রকম কী করে বলব। পাকা আমের এক-একটা রঙ থাকে যা হলদেও নয় লালও নয় - অথচ সাদাও নয়। তিনটে রঙ মিলে একরকম রঙ হয়—এ-ও ঠিক তেমনি। আর কত রকম যে গয়না গায়ে সব নামও তার জানি না। কানে গলায় নাকে হাতে সব জায়গাটা সোনায় মোড়া। আমি নিজে গরীব হলেও দূর থেকে তো অনেক মেয়েদেরই দেখছি। জানলার ফাঁক দিয়ে কত বউকেও দেখেছি। অত ফরসা রঙও দেখি নি কখনও আগে—অত গয়নাও দেখি নি। মনে হল মেয়েটা যেন এতক্ষণ কথা বলে বলে ঝগড়া করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর আমাকে দেখেই চমকে উঠেছে। ভাবলাম—চমকানোটাই স্বাভাবিক। একেবারে অন্দর-মহলের মধ্যে অচেনা অজানা পুরুষমানুষ দেখলে আজকালকার বাঙালী মেয়েরাও চমকে উঠত! ওর আর অপরাধটা কী! অপরাধ তো আমারই। আমি না বলে কয়ে ঢুকে পড়েছি এখানে।

—কে? কোন্‌ হ্যায়? কে আপনি?

কিছুক্ষণ কোনও কথাই আমার মুখ দিয়ে বেরোল না। আমি ভাবছিলাম যদি তখন কোনও পুরুষমানুষ ঢুকে পড়ে আমাকে সেই অবস্থায় দেখতে পায় তো আমার কী দশা হবে। কী কৈফিয়ৎ দেব তাকে? এতক্ষণ যে-পুরুষটার গলা শুনছিলাম সেই-ই যদি বেরিয়ে এসে হঠাৎ দারোয়ান ডাকে। এসেছি ঘনশ্যামবাবুর কাছে গদির কাজে, এ-কথা বললে কেউ-ই শুনবে না। ভাববে নিশ্চয় কোনও মতলব ছিল আমার। নইলে সদর ছেড়ে অন্দরে ঢুকিই বা কেন? এত লোক-লস্কর, এই সদর গেটের পুজো-বাড়িতে জিজ্ঞেস করে অন্তত আসতে পারতাম! তারাই বলে দিতে পারত ঘনশ্যামবাবুর ঘর কোন্ দিকে। কিংবা বললেই তারা সঙ্গে করে নিয়ে আসত

আমাকে। আমি কোন্ সাহসে ভেতরে ঢুকে পড়েছি! আমাকে তারা গলা-ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে পারে। কিংবা পুলিস ডেকে ধরিয়ে দিতে পারে। ঘনশ্যামবাবুই কি আমার কথা বিশ্বাস করবেন? হয়ত আমার চাকরিই চলে যাবে এই অপরাধে।

কিন্তু মেয়েটা তখনও আমার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে।

অনেক কষ্টে বললাম, ঘনশ্যামবাবুর কাছে এসেছি।

—কোন্ ঘনশ্যামবাবু?

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। ঘনশ্যামবাবুর নামটাই তো যথেষ্ট। মেয়েটি হয়ত ঘনশ্যামবাবুরই মেয়ে। অথচ ঘনশ্যামবাবুর নাম বললেও চিনতে পারছে না।

বললাম, দর্মাহাটায় যে-ঘনশ্যামবাবুর গদি আছে—

মেয়েটি যেন নিজেকে হঠাৎ সামলে নিলে। এক মুহূর্তে তার চোখ-মুখের ভাব বদলে গেল। মনে হলো তার মুখ-চোখ যেন আরও লাল হয়ে উঠেছে। যেন এতক্ষণে চিনতে পেরেছে। যেন এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে আমি একেবারে অনাহূত নই। একেবারে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার মত লোক আমি নই। বিশ্বাস করা যায় যেন আমাকে।

আবার বললাম, ঘনশ্যামবাবুর কাছেই এসেছি—এই পাতাগুলো সই করাতে।

মেয়েটি বললে, ও আপনি বসুন।

বসবার অবস্থা তখন আমার নয়। অত সাহস তখন আমার নেই। পা দু'টো ব্যথা করছিল—টন টন করছিল—থর থর করে কাঁপছিল। বসে পড়তে পারলেই যেন বাঁচতাম। বসতে পারলেই শান্তি পেতাম, স্বস্তি পেতাম।

বললাম, ঘনশ্যামবাবুর ঘরটা আমায় দেখিয়ে দেবেন?

মেয়েটি হেসে উঠল। তার হাসিটাও খুব চমৎকার লাগল।

বললাম, হাসছেন যে?

সত্যিই বলছি, মেয়েটির মুখে হাসি দেখে তখন অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম। এমন ভাবে আপ্যায়িত হব আশা করি নি। এত বড়লোকের মেয়ে—আমার দিকে চেয়ে এমন করে হেসে কথা বলবে এতো ভাবতেই পারা যায় না।

বললাম, বাইরের লোকজনদের জিজ্ঞেস করতে তারা ভেতরে আসতে বললে।

নিজের অপরাধের মাত্রাটা কমানোর জন্যেই বোধহয় কিছু ওজুহাত দিতে যাচ্ছিলাম।

মেয়েটি বললে, আপনি কতক্ষণ এসেছেন ?

বললাম, অনেকক্ষণ।

—অনেকক্ষণ ?

বললাম, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ! বাড়িতে কেউ নেই বোধ হয় এখন, তাই কাউকেই দেখতে পেলাম না ভেতরে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে চারিদিকে ঘোরাফেরা করতে করতে দেখলাম এই ঘরে আলো জ্বলছে. তাই ঢুকেছিলাম।

মেয়েটি এবার যেন কী ভাবলে।

বললে, কতক্ষণ ঢুকেছেন আপনি—আধঘণ্টা হবে ?

বললাম, তা হবে—আধঘণ্টার বেশিও হতে পারে।

—ঘরের মধ্যে আমরা কথা বলছিলাম, শুনতে পেয়েছেন ?

বললাম, হ্যাঁ শুনতে পেয়েছিল।

কথাটা শুনে মেয়েটি যেন কী-রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেল। যেন আমার কথা শুনে চমকে উঠল একটু। যেন ভয় পেলে।

আবার জিজ্ঞেস করলে, কী শুনেছেন ?

বললাম, তা জানি না—আপনারা কথা বলেছিলেন। মনে হল আপনাদের কাউকে দেখতে পেলে ভাল হয়।

—আপনি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন ? ডাকলেন না কেন ?

বললাম, আমার ভয় করছিল খুব।

মেয়েটি বললে, আমাদের কথা শুনে ভয় করছিল ?

বললাম, না।

—তবে ?

—ভাবছিলাম, বাইরের পুরুষমানুষ হয়ে একেবারে আপনাদের অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছি।

—কে আপনাকে ঢুকতে দিলে ?

বললাম, কাউকে তো সামনে পেলাম না—একজন-দু'জনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তারা ভেতরে আসতে বললে ?

—সদরের সিঁড়ি পেলেন না ?

বললাম, অন্ধকারে কোন্‌টা সদর, কোন্‌টা অন্দর ঠিকঠাহর করতে পারি নি।

—তাই সোজা অন্দরে চলে এলেন ?

বললাম, আমাকে মাফ করবেন—আমি জানতাম না।

—কী জানতেন না ? কোথায় থাকেন আপনি ? কোথায় চাকরি করেন ? কী করতে এসেছেন ?

একসঙ্গে পর পর এতগুলো প্রশ্নে আমি আরও ভয় পেয়ে গেলাম। এখন যদি চিৎকার করে দরোয়ান ডাকে! পুলিসে ধরিয়ে দেয়! আমি কী জবাবদিহি করব! পুলিসে ধরিয়ে দিলে সারা রাত সারা দিন হয়ত হাজতে আটকে থাকব! দাদাকে খবর দেবে কে ? কী করবে তারা ? আমি বাড়িতে না গেলে দাদা যে ভাববে! স্ত্রীও যে ভাববে! সবাই-ই ভাববে। তারপর যদি বা খবরই পায় তো উকীল মোক্তার—কাছারি কে করবে। টাকা আসবে কোথা থেকে ? আর বদনাম। আমি সকলের অসাক্ষাতে বাড়ির মেয়েদের মহলে ঢুকে পড়েছি কোন্ মতলবে-তা কারো জানতে বাকি থাকবে না। পাড়ার লোকের কাছে, সমাজে, শ্বশুরবাড়িতে, বাড়িতে মুখ দেখাব কেমন করে ? গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া যে আমার কোনও গতিই থাকবে না। আমি সকলের চোখে ছোট হয়ে যাব। আমার কোনও সম্পদ

নেই। কোনও ঐশ্বর্য নেই। বলবার মত, ঘোষণা করার মত কোনও কিছু নেই। আছে কেবল আত্মমর্যাদা জ্ঞান। মধ্যবিত্ত মানুষের আর কী থাকতে পারে সমাজে? উপোষ করে থাকলেও বাইরে তা প্রকাশ করতে আমার বাধে। আমার অভাবের কথা দশজনকে বলতে আমার গলায় আটকে যায়। আমি আমার দুর্বলতা ঢেকে রাখি—আমার দারিদ্র, ফরসা জামা-কাপড়ে চাপা রাখতে চেষ্টা করি। কেউ যেন আমার কোনও ত্রুটি জানতে না পারে, কোনও ফাঁক টের না পায়।

কিন্তু এর পরে তো সব প্রকাশ হয়ে পড়বে, সব জানাজানি হয়ে যাবে। রাস্তায় পাড়ায় সবাই তো আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাবে। বলবে, ওই সেই লোকটা যাচ্ছে—ওই সেই লোকটা চলেছে।

তখন টিট্‌কিরি দেবে সবাই। হাসি ঠাট্টা তামাশা করবে চার দিক থেকে। কেউ আর বাকি থাকবে না তখন। যে চিনত না এতদিন, সে-ও চিনে ফেলবে।

মেয়েটির মুখের চেহারা তখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। একটু আগেই যেমুখের চেহারা দেখে একটু আশা হয়েছিল, সে মুখখানাই আবার দেখে ভয় পেতে লাগল। যেন আমার এই অনধিকার প্রবেশে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

মেয়েটি ধমকের সুরে বললে, বলুন—কোথায় থাকেন আপনি? কোথায় চাকরি করেন?

বললাম, ঘনশ্যামবাবুর গদিতে।

মেয়েটি বললে, ঘনশ্যামবাবুর গদিতে চাকরি করেন তো এ-বাড়িতে কী? এ-বাড়িতে কেন? বলুন, কী মতলবে এসেছেন?

বললাম, ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি এটা নয়?

আমি যেন অবাক হয়ে গেলাম। তবে এ কোথায় এসেছি? পণ্ডিতজী তো আমাকে ঠিকানা বলেই দিয়েছিল। সেই ঠিকানা দেখেই তো ঢুকেছি! বাড়িতে ঢোকবার আগে তো ঠিকানাটা ভাল করে দেখে

নিয়েছিলাম। অন্ধকারে অবশ্য ভাল দেখা যায় নি। কিন্তু যতটা দেখা গিয়েছে তাতে তো কোনও ভুল হবার কথা নয়। শেষকালে এমন ভুল করব! কটন স্ট্রীট দিয়ে ঢুকে একে তো সব বাড়ির নম্বরগুলোই দেখতে দেখতে এসেছিলাম। লাল রং-এর বাড়ি। পঁচাত্তরের ছুই নম্বর। চারতলা বাড়ি, সামনে সবুজসাদা রেলিং। কোনও বিষয়েই তো ভুল হবার কথা নয়।

ভয়ে আমার সমস্ত শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল। মনে হল সেখানেই হয়ত অচৈতন্য হয়ে হয়ে পড়ব।

আবার বললাম, ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি এটা নয়?

মেয়েটি বললে, না।

তা হলে! আমি তো ভুল করেছি! কিন্তু কে বিশ্বাস করবে আমি ভুল করেছি। সবাই বলবে আমি জেনে শুনে ইচ্ছে করে এখানে এই বাড়িতে এসেছি।

বললাম, তাঁর বাড়িটা কোথায় তবে?

মেয়েটি বললে, তা আমি জানি না।

ভাবুন, সেই অবস্থায় আমার মনটা কেমন হতে পারে। মনে হল ছু'হাতে মুখ ঢেকে পালিয়ে যাই। কিন্তু পালাবার পথও যে তখন বন্ধ।

মেয়েটি বললে, আপনার নাম কী?

নাম বললাম।

মেয়েটি বললে, আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

বললাম, অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে ভেতরে আপনাদের কথা শুনছিলাম।

মেয়েটি বললে, কী কথা শুনেছেন?

বললাম, সব কথা তো বুঝতে পারি নি। ছু'জনে কথা হচ্ছিল আপনাদের, একজন আর একজনকে বকছিলেন।

মেয়েটি বললে, বকাবকি কেন হচ্ছিল বুঝতে পেরেছেন কিছু?

বললাম, আমি কী করে বুঝব? আমি তো আপনাদের চিনি না। চিনলে হয়ত আপনাদের কথা বুঝতে পারতাম।

মেয়েটি বললে, পরের বাড়ির ভেতরে ঢুকে পরের কথা কান পেতে শুনতে আপনার লজ্জা করে না?

বললাম, আমি তো জানতাম না—আমি না-জেনে এখানে ঢুকে পড়েছিলাম।

মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু আপনি সাড়া দেননি কেন?

বললাম, আমি তো আপনাদের কাউকেই চিনি না, কাকে ডাকব বুঝতে পারছিলাম না।

মেয়েটি বললে, দরোয়ানকে ডাকলেন না কেন? দরোয়ান তো নিচেই ছিল।

বললাম একবার ভেবেছিলাম ডাকব—কিন্তু—

মেয়েটি বললে, কেন ডাকেন নি তা হলে?

বললাম, রাস্তা ভুলে গিয়েছিলাম। নিচে যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না, অনেক ঘুরলাম, ঘুরে ঘুরে শেষে আবার এই ঘরে ঢুকে পড়লাম।

মেয়েটি বললে, আবার এই ঘরে ঢুকতে আপনার ভয় করল না?

বললাম, কিন্তু কী করব বলুন, আমার যে আর কোনও উপায় ছিল না। এই একটা ঘরেই শুধু আলো জ্বলছিল, এই একটা ঘরেই শুধু লোকের কথাবার্তা চলছিল।

মেয়েটি বললে, আমাদের কথাবার্তা কতটা শুনেছেন?

বললাম, যতটা কানে এসেছিল সবই শুনতে পেয়েছি, মনে হল কারো সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যেত খুব ভাল হত, আমি দেখা করবার জন্যে ছটফট করছিলাম মনে মনে।

মেয়েটি আবার বললে, কিন্তু ডাকেন নি কেন কাউকে?

আমি বললাম, ডাকবার যে সাহস হচ্ছিল না? আর, কাকে ডাকব, কাউকে যে চিনি না।

মেয়েটি বললে, যদি আমি বলি, ইচ্ছে করে আপনি ঢুকেছিলেন এই ঘরে।

বললাম, ইচ্ছে করে ঢুকব অত সাহস আমার কী করে হবে। আমি সামান্য মাইনের চাকরি করি ঘনশ্যামবাবুর গদি-বাড়িতে। সাত টাকা মাইনে পাই, আবার বাড়িতে অনেকগুলো লোক, দাদার আর আমার মাইনেতে সংসার চলে।

বলতে বলতে বোধহয় আমার কান্না বেরিয়ে গিয়েছিল চোখ দিয়ে। শুধু চাকরির ভয় নয়, শুধু সংসার অচল হওয়ার আশঙ্কা নয়, অন্য ভয়ও ছিল। মেয়েটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল—খুব তেজ যেন চেহারায়। এতক্ষণ এই মেয়েটির গলাতেই তেজ ফুটে উঠছিল। সরযূপ্রসাদকে এই মেয়েটিই তেজের সঙ্গে বকাবকি করছিল। যার এত তেজ সে-মেয়ে সব করতে পারে। আমাকে পুলিসের হাতেও দিতে পারে।

বললাম, এবার দয়া করে আমাকে যেতে দিন।

মেয়েটির চোখ দু'টো যেন জ্বলে উঠল।

বললে, না।

আমি আরও ভয় পেয়ে গেলাম।

মেয়েটি বললে, আপনি কোথায় থাকেন?

বললাম, ভবানীপুরে, চাউলপটিতে—এখান থেকে অনেক দূরে। আমাকে আবার হেঁটে যেতে হবে।

মেয়েটি বললে, কেন? হেঁটে কেন?

বললাম, ট্রামে যেতে গেলে অনেক পয়সা লাগে।

মেয়েটি বললে, পয়সা নেই কিন্তু সাহস তো খুব আছে।

একটা কড়া বিদ্রূপ তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল।

মেয়েটি বকতে লাগল, এত বড় বিরাট বাড়ির ভেতরে, লোক-জন

গম্ গম্ করছে, একেবারে বলা-কওয়া নেই, ভেতরে ঢুকে পড়েছ? বেয়াদব, বেতমিজ, বেওকুফ্ কোথাকার!

মেয়েটির সমস্ত গালাগালি মাথা পেতে সহ্য করতে লাগলাম! আমি এর কী প্রতিবাদ করব। আমি এর উত্তরেই বা কী বলব। আমাকে তখন দু'ঘা জুতো মারলেও আমার কিছু বলবার ছিল না। আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম শুধু!

মেয়েটি আবার বলে যেতে লাগল, লজ্জা করে না পরের বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকতে। লজ্জা করে না পরের বাড়ির মেয়েদের মহলে ঢুকে ঘরের কথা শুনতে।

বললাম, আমাকে আপনি যেতে দিন দয়া করে। আমি না-জেনে ঢুকেছি, বলছি তো।

মেয়েটি বললে, কখ্খনো যেতে দেব না।

বললাম, আমি তো বলছি, আমি না জেনে ঢুকে পড়েছি।

মেয়েটি শাসিয়ে উঠল। বললে, আবার?

বললাম, কেন, গালাগালি দিচ্ছেন কেন, ডাকুন কাকে ডাকবেন। আমি সব কথা খুলে বলব।

আমার যেন তখন মরীয়া অবস্থা হয়েছিল।

বললাম, আমি কিছু অন্যায় করি নি। কী করবেন করুন আমাকে।

মেয়েটি বললে, অন্যায় করে আবার কথা! আবার জোর করছে!

বললাম, ঘনশ্যামবাবুর কাছে আমাকে যেতেই হবে, দেখা করতেই হবে আজ।

মেয়েটি বললে, ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি এটা নয়।

বললাম, তা হলে আমি সেখানেই যাচ্ছি, আমায় চলে যেতে দিন। মেয়েটি আমার সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়াল।

বললে, কী করে যাবে দেখি তুমি—যাও—

বললাম, কেন আমাকে এমন করছেন, আমি কী করেছি আপনার? আমি তো কিছু বলি নি—আমি তো কোনও অপরাধ করি নি। আমাকে কেন অমন করছেন আপনি?

মেয়েটি তখনও পথ আটকে দাঁড়িয়ে ছিল।

বললে, খুব তো কথা। দোষ করে আবার কথা বলা হচ্ছে।

আমি বললাম, আমি আর আপনার কথা শুনতে চাই না, আমায় আপনি ছেড়ে দিন। আমি আপনার সঙ্গে আর কথা বলতে চাই না।

কী জানি কী হল। হঠাৎ মেয়েটি ক্ষেপে গেল যেন। আমার গালে ঠাস করে একটা চড় মারলে। চড়টা আমার গালে পড়ে ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে গেল। আমি বিস্ময়ে ভয়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

মেয়েটি তখনও রাগে ফুলছে। গাল দু'টো লাল হয়ে উঠল আরও।

বললে, আমার মুখের ওপর কথা, বোস ওখানে, চুপ করে বোস।

আমি বসে পড়লাম চেয়ারটার ওপর। আমার চোখ দিয়ে এবার অঝোর ধারায় কান্না ঝরে পড়তে লাগল। আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। কী করব আমি, কাকে ডাকব? কে এসে আমার এ-অবস্থা থেকে আমায় বাঁচবে!

বসবার পরেই মেয়েটি আবার একটা চড় মারলে আর একটা গালে!

আমি টলে টলে পড়ে যাচ্ছিলাম। হয়তো পড়েই যাচ্ছিলাম। পড়ে গেল আমার চশমাটা ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। কিন্তু তার আগেই মেয়েটি আমায় ধরে ফেলেছে।

বললে, ঠিক হয়ে বোস।

কথা বলতে গেলাম। কিন্তু মনে হল মুখ যেন আমার ভেঙে গেছে। সমস্ত মুখে অসহ্য ব্যথা। সমস্ত শরীর টলছিল। টনটন

করছিল ব্যথায়। আমার মাথা সোজা রাখতে পারছিলাম না। আমার মাথা ঘুরছিল।

ভাবলাম মেয়েটি বোধহয় এবার কাউকে ডাকবে। ডেকে আমাকে পুলিসের হাতে দেবে। পুলিসের হাতে দিলেই যেন আমি বেঁচে যাই। রাত অনেক হয়ে গেছে। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। বাড়ির বাইরে সদরে পুজোর কাঁসর ঘণ্টা বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে! এত রাত্রে ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখা আশা আর নেই। হয়ত তিনি টেলিফোন করেছেন আপিসে। সেখানে লোকজন থাকে সারারাত। তারা হয়ত বলবে, গদি বন্ধ করে বাবুরা চলে গেছে সব। কেউ নেই সেখানে। ঘনশ্যামবাবু খুব রেগে যাবেন। কিন্তু কী করা যাবে!

এতক্ষণ বাড়িতেও সবাই ভাবছে। অন্য দিন এই সময়েই হাঁটতে হাঁটতে বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। দাদা বোধহয় এতক্ষণ এসে গেছে। ভাবছে, এখনও এল না কেন তিনকড়ি। আমি গেলে তবে একসঙ্গে খেতে বসি। বরাবরের তাই নিয়ম। আজ দাদা বসে বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবে। তারপর বাইরের চাউলপটি লেনের গলির মুখটা দেখবে। তারপর হয়ত দিদিকে জিজ্ঞেস করবে, বউমাকে জিজ্ঞেস কর তো রে, তিনকড়ির আজ দেরি হচ্ছে কেন এত?

আমার স্ত্রী ভাবছে এখন। বাইরে কিছু প্রকাশ করবে না সে। বাইরে থেকে কেউ তার মনের কথা জানতে পারবে না। বড় চাপা, বড় অল্পভাষী আমার স্ত্রী। আমার স্ত্রী কোন কথাই বলবে না। জানবেই বা কী করে যে আমি এই বিপদের মধ্যে পড়েছি। আমার তো জানা ছিল না যে এখানে আমাকে আসতে হবে আজ। রোজকার মত ঠিক সময় বাড়ি যাব, এইটেই আমি জানতাম।

মেয়েটি বললে, বাড়িতে তোমার কে কে আছে?

বললাম, সবাই আছে।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে, বউ আছে?

বললাম, আছে।

—ছেলে মেয়ে ?

বললাম, এখনও হয় নি।

এবার বললে, বাবা ?

বললাম, না। কিন্তু বিয়ে দেবার মত বোন আছে দু'জন, দাদা আছে বউদি আছে, তারা খুব ভাবছে এখন। আপনি ছেড়ে দিন আমাকে, আমি চলে যাই, দয়া করে ছেড়ে দিন।

মেয়েটির দিকে চেয়েই কথাগুলো বললাম। দেখলাম ভাল করে। বড়লোকের মেয়ে। সারা গায়েই গয়না। পিঠের দিকে বেণীটা দুলছে। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে রাগে। রাগে যেন ফুলছে।

হঠাৎ বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ হল।

মেয়েটি চমকে উঠল এক নিমেষে। হঠাৎ তার চোখ-মুখের চেহোরাটা যেন একেবারে বদলে গেল। তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে খিল দিয়ে দিলে নিঃশব্দে। তারপর খানিকক্ষণ কী যেন কান পেতে শুনতে লাগল। অনেকক্ষর্ণ ধরে শুনতে লাগল।

তারপর দরজাটা কে যেন ঠক্ ঠক্ করে নাড়তে লাগল। তারপর কড়া নাড়তে লাগল।

আমি অবাক হয়ে তার দিকে দেখলাম। ভয়ে যেন তার মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে। আমার দিকে পিছন ফিরে দরজার দিকে মুখ করে কী যেন শুনতে লাগল। তারপর আমার দিকে মুখ ফেরালে।

কথা বলতে গেলাম। ভাবলাম বলব, কে ডাকছে বাইরে ?

মেয়েটি হঠাৎ নিজের হাত দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরলে।

ইঙ্গিতে বললে, চুপ।

আমি যেন কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমার কাছে গোড়া থেকে সমস্তটাই রহস্য মনে হচ্ছিল। কে এ মেয়েটা! নাম তো ভেতরে কথা থেকে বুঝেলিাম—জয়ন্তীয়া। কিন্তু জয়ন্তীয়া এ-বাড়ির কে ? কেনই বা এতক্ষণ সরযূপ্রসাদের সঙ্গে ঝগড়া করছিল। আর

যদি ঝগড়াই করছিল তো এখন হঠাৎ ঝগড়া থেমেই বা গেল কেন ? আর সেই সরযুপ্রসাদ ? এতক্ষণ যে কথা বলছিল, ঝগড়া করছিল, সেই-বা কোথায় ? ঘরের ভেতরে সে লোকটা একলা চুপ করে রয়েছে কেন ? সে ঘরের ভেতরে একলা কী করছে। সেই-ই বা একবার বাইরে আসছে না কেন ? সে কি শুনতে পাচ্ছে, এই ততক্ষণ ধরে যে কথাগুলো হল !

বাইরে তখনও কড়া নাড়ছে।

মেয়েটি আমার মুখ চেপে রয়েছে জোরে। খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে রয়েছে মেয়েটা। জোরে হাতের পাতা দিয়ে ধরেছে আমার মুখটা যাতে আমি কথা না বলতে পারি। মেয়েটি যেন আতর মেখেছিল, তার গন্ধে যেন আমার নেশা লেগে গেল। আমার মনে হল আরও অনেকক্ষণ মেয়েটি মুখটা ধরে থাকুক। এ এক অনুভূতি আমার। আমার সমস্ত ভয় চলে গেল। তখন আর আমার বিপদের কথা মনে নেই। ঘনশ্যামবাবুর কাছে খাতাতে সই নেবার কথাও মনে নেই! বাড়িতে কারা আমার জন্যে বসে বসে ভাবছে সে কথাও মনে নেই, শুধু মনে হচ্ছিল সেই অস্বাভাবিক অবস্থার কথা। হাতে বোধহয় তার আলতা মাখানো ছিল, কিংবা মেহেদী পাতার রঙ। রক্তের মত লাল। তার হাতের রঙ আমার মুখে গলায় হাতে লেগে গিয়েছিল। আমি হাত দিয়ে মুখটা ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। জয়ন্তীয়া আরও জোরে টিপে ধরেছে। এত জোর তার গায়ে, মনে হল আমার দম আটকে আসবে যেন। বলতে গেলাম—ছাড়ুন। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও শব্দই বেরোল না।

মনে হল দরজার বাইরে যে এতক্ষণ কড়া নাড়ছিল সে বোধহয় চলে গেল। আর শব্দ হচ্ছে না।

জয়ন্তীয়া অনেক লক্ষ্য করলে। তার পর আস্তে আস্তে আমার মুখটা ছেড়ে দিলে।

ইঙ্গিতে আবার মুখে হাত দিয়ে বললে, চুপ ॥

আমিও কথা বলতে সাহস পেলাম না।

জয়ন্তীয়া যেন অনেকক্ষণ বাইরের দিকে কান পেতে রইল। কোনও সাড়া শব্দই আর নেই কোথাও!

তারপর আমার কাছে এসে মুখের কাছে হাত নামিয়ে বললে, চুপ করে বসে থাক। আমি এখুনি আসছি।

বলে দরজার কাছে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়াল। কী যেন শুনতে লাগল। তারপর নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল।

যাবার সময় বলে গেল, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

আমারও কী মতিচ্ছন্ন হল। আমি দরজাটা খিল দিয়ে বন্ধ করে দিলাম! দিয়ে আবার চেয়ারটায় এসে বসলাম।

অনেকক্ষণ নিজের মনেই বসে ছিলাম। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। আবার আসবে জয়ন্তীয়া। যতক্ষণ না আসবে, ততক্ষণই বসে থাকতে হবে। কিন্তু খানিক পরেই মনে হল যেন মেয়েটা আসতে অনেক দেরি করছে। যেন কল্পান্তকাল বসে আছি তার অপেক্ষায়। যেন সময়ের আর শেষ নেই। যেন নিরবধি কাল ধরে বসে আছি এক জায়গায়।

খানিক পরেই অস্বস্তি হতে লাগল। মনে হল যেন অনেক রাত হয়ে গেছে, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আমি উঠলাম।

উঠে কী ভাবলাম। দরজার খিলটা খুলব?

ভেতরের দিকের দরজাটা তখনও ভেজানো ছিল। মনে হল ভেতরে সেই লোকটা কী করছে? সেই সরযূপ্রসাদ। সে-লোকটা এতক্ষণ চুপ-চাপ বসে আছে নাকি। সে তা কিছুই কথা বলছে না।

হঠাৎ যেন বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হল আবার।

জয়ন্তীয়া এসেছে।

খিলটা খুলতেই কিন্তু চমকে উঠলাম। জয়ন্তীয়া নয়, অন্য লোক। লম্বা-চওড়া চেহারা।

আমাকে দেখে সে-ও যেন অবাক হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলে, কে আপনি ?

বললাম, আমি ঘনশ্যামবাবুর গদিবাড়ির লোক।

লোকটা বললে, ঘনশ্যামবাবু ? তিনি তো পাশের বাড়িতে থাকেন। এ বাড়ি নয়।

বললাম, আমি সেখানেই যাব, ভুল করে এ-বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি। আমি আগে কখনও আসিনি। নতুন লোক আমি।

লোকটা আমার আপাদ-মস্তক দেখতে লাগল।

বললে, কে নিয়ে এল আপনাকে এ-ঘরে ?

বললাম, আমি নিজেই এসেছি। সদরে যাকে জিজ্ঞেস করলাম সে-ই বললে ভেতরে আসতে।

আবার সেই একই ধরনের প্রশ্ন, একই ধরনের উত্তর। জয়ন্তীয়াকে একবার অনেকক্ষণ ধরে এই সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম। তবু কিছুতেই তার শান্তি হয় নি। এই লোকটাকেও সেই সব জবাব দিতে হল।

বললাম, লাল রং-এর বাড়ি দেখে ঢুকেছিলাম, ভেবেছিলাম এইটেই ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি।

লোকটা হিন্দুস্থানী। দরোয়ান শ্রেণীর লোক। আগে এসে পড়লে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু কপালের গ্রহ থাকলে আমি আর কী করব।

দরোয়ানটা বললে, এ-কোঠিতে তো কেউ নেই এখন, সব সাদি-বাড়ি গেছে।

বললাম, কেউ নেই ?

দরোয়ান বললে, না বাবুজী।

আমি যেন কেমন অবাক হয়ে গেলাম। তবে এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বলছি। কে সেই জয়ন্তীয়া ! সে যে আমার মুখ চেপে ধরেছিল। এখনও যে ঘরে তার আতরের গন্ধ লেগে রয়েছে। এখনও যে স্পষ্ট

তার চেহারাটা মনে পড়ছে ! আর সেই লোকটা ! সেই সরযূপ্রসাদ ! তার গলাও যে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি নিজের কানে ! দু'জনে ঝগড়া করেছে ! তাহলে সব কি স্বপ্ন !

বললাম, আর সেই তোমার দিদিমণি ?

লোকটা বললে, কোন্ দিদিমণি ?

বললাম, জয়ন্তীয়া নামে কোনও কেউ নেই বাড়িতে ?

লোকটা বললে' সবাই গেছে সাদিবাড়িতে ! কেউ নেই বাবুজী।

বললাম, আমাকে যে এখানে বসে থাকতে বলে গেল এখনি।

লোকটা সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বললে, আপনি এ-ঘরের মধ্যে ঢুকলেন কেন ?

আমি বললাম, পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, এই একটা ঘরে দেখলাম আলো জ্বলছে তাই এখানে ঢুকেছিলাম।

দরোয়ান বললে, কিন্তু খিল বন্ধ করে বসেছিলেন কেন ?

বললাম, তোমার দিদিমণি যে খিল বন্ধ করে বসে থাকতে বলল।

দরোয়ানটা হাসল।

বললে, ঝুট্ বাবুজী ! ঝুট্ ববুজী ! ঝুট্ ! কেউ নেই বাড়িতে। দিদিমণিরা ভি চলে গেছে সাদি-বাড়ি, এখানে কোই নেহি আছে। আমি একলা তদারক করছি।

বললাম, তাহলে এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে ? আমি যখন ঢুকলাম বাড়িতে, তখন সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম ঘনশ্যামবাবু কোথায়, তা সবাই যে বললে ভেতরে আসতে।

দরোয়ানটা বললে, ঝুট বাত বাবুজী, ঘনশ্যামবাবুর কোঠি তো এর পাশে।

বললাম, পঁচাত্তরের দুই নম্বর লাল রং-এর বাড়ি।

দারোয়ান বললে, দু,টো বাড়িই লাল রং-এর বাবুজী, আপনি ভুল করিয়াছেন।

আশ্চর্য ভুল তো ? এমন ভুলও মানুষের হয় ! এই ভুলটুকুর

জন্যেই কী দুর্ভোগ পোয়াতে হল। কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু ক্ষোভ রয়ে গেল। আমি গরীব বটে। কিন্তু যত সামান্য সময়ের জন্যই হোক, একটু স্পর্শ পেয়েছিলাম এক সুন্দরীর। সে-কথা যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে রইল অনেকক্ষণ। আমি যেন আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার আতরের গন্ধ প্রাণভরে গ্রহণ করতে লাগলাম আমার বুকের ভেতরে। সে বলেছিল, সে আসবে। সে বলেছিল, দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে থাকতে। কেন অপেক্ষা করলাম না? কেন তবে দরজার খিল খুলে দিলাম। এমন ভুল যেন বার বার করতেও ভাল লাগে। মনে হল কালও যেন এমনি ভুল করে এখানে চলে আসি।

সারাজীবন শুধু অভাবের আর অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। চোখ তুলে আকাশের দিকে কখনও চাইবার সময় পাইনি। মনে হয়েছে আকাশ আমাদের কাম্য নয়, বিলাস আমাদের জন্যে নয়। আমাদের জন্যে শুধু জীবিকার তাড়না। আমাদের জন্যে শুধু জীবন-সংগ্রাম। গাড়িতে, বড়লোকের বাড়ির অন্দর মহলে, দূর থেকে যে-টুকু নজরে পড়েছে, তার জন্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছি অবশ্য—কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা মন থেকে দূর করবার চেষ্টা করেছি প্রাণপণে।

কিন্তু সেদিন মনে হল আমারও জীবন যেন সার্থক হয়েছে। হোক এক মুহূর্তের, কিন্তু স্বর্গের ইশারা যেন পেয়েছি আমি। আকাশের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ভেতরের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছি। আর কী চাই! আর কী চেয়েছিলাম আমি জীবনে।

সমস্ত শরীর আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

চোখ বুজে সমস্ত অবস্থাটা আবার যেন গোড়া থেকে কল্পনা করতে ভাল লাগল।

খানিক পরে বললাম, এই দেখ দরোয়ানজী, এই খাতা নিয়ে যাচ্ছিলাম ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি, সই করবার জন্যে, তাঁর গদিতে আমি কাজ করি কিনা।

দরোয়ানজী বুঝল।

বললে, ঠিক বাত বাবুজী।

বললাম, আমি তাহলে যাচ্ছি, আমাকে বেরোবার রাস্তাটা একবার দেখিয়ে দাও তো।

দরোয়ানজী আমার ঘর থেকে বার করে আগে আগে চলতে লাগল। চারিদিকে আবার চেয়ে দেখলাম, । সেই তেমনি টিম্-টিম্ আলো জ্বলছে মাঝে মাঝে। সমস্ত বাড়িটা নিঝুম। এখনও কেউ ফেরেনি। আমি চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম, কোথাও সেই জয়ন্তীয়াকে দেখতে পাওয়া যায় কিনা। কোথাও দাঁড়িয়ে হয়ত উঁকি মেরে দেখছে আমাকে। আমাকে তো তার জন্যে অপেক্ষা করতেই বলেছিল। কেন আমি তবে চলে এলাম! কেন আমি বসে থাকলাম না।

মনে হল পেছনে যদি আবার এসে সে ডাকে!

মনে হল আমাকে আবার গালাগালি দিলেও যেন আমি তৃপ্তি পাই।

আবার সেই সদর-গেট! একেবারে সদর-গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিলে দরোয়ানজী। তারপর বাড়িটার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। লাল রঙ-এর বাড়িটাই বটে। সাদা-সবুজ রেলিং ঘেরা বারান্দা; শুধু এই বাড়িটাই নয় পাশের বাড়িটাও তাই। প্রায় এক-রকমই দেখতে।

কিন্তু চারদিকে চেয়ে দেখলাম। রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। অনেক রাত হয়েছে বোধহয়। দু'চারটে বিরাট বিরাট ষাঁড় ফুটপাতের ওপর বসে আছে নিশ্চিন্তে।

ঘনশ্যামবাবুর বাড়িটায় ঢুকতে গেলাম। কিন্তু সামনে তখন তার অন্ধকার। ওপরের দিকেও চেয়ে দেখলাম। কোথাও আলোর কোনও চিহ্ন নেই। বোধহয় সবাই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভয় হল খুব। হয়ত খুব বকুনি খেতে হবে ঘনশ্যামবাবুর কাছে।

পণ্ডিতজী বকবে খুব, কাল যখন শুনবে খাতা নিয়ে আমি যাইনি তাঁর বাড়িতে।

বলবে, তোমার ভালর জন্যেই বাবুর কোঠিতে ভেজেছিলাম তোমাকে, জান-পছান্ হলে তোমার মাইনে বাড়তে পারে।

আমি বলব, কিন্তু চিনতে পারলাম না যে বাড়িটা ঠিক।

পণ্ডিতজী বলবে, না, বাঙালীবাবুকে দিয়ে হবে না, চতুরাননজী যাবে কাল।

আমি বলব, না পণ্ডিতজী, এবার আমাকেই পাঠান, এবার ঠিক জায়গায় যাব, কাল রাত্তির হয়ে গিয়েছিল, তাই বুঝতে পারি নি।

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলাম। দাদা তখনও খায় নি। অন্ধকার রাস্তার সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে যেন হাতে প্রাণ পেলে দাদা।

বললে, এই যে, তোমার এত দেরি হল যে? আমি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, পুলিসে খবর দেব নাকি।

বললাম, গদির কাজে ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি যেতে হয়েছিল, তাই দেরি হয়ে গেল।

দাদা বললে, কেন? ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি যেতে হয়েছিল কেন?

বললাম, ঘনশ্যামবাবুর অসুখ হয়েছে। তিনি আসতেই পারেন নি গদিতে।

ভেতরে শোবার ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় বদলালাম।

আমার স্ত্রীও এতক্ষণ আমার জন্যে জানালায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। দেখলাম তার চোখ ছল্ ছল্ করছে।

বললে, বড় ভাবনা হচ্ছিল তোমার জন্যে, এত দেরি করতে হয়?

বললাম, দেরি কি সাধ করে করি! গদিতে কাজ পড়লে কী করা যাবে? বলে কলতলায় যাচ্ছিলাম।

আমার স্ত্রী বললে, তোমার মুখে গলায় ও কীসের দাগ? রক্ত কোত্থেকে এল?

বললাম, কই?

বলে আয়নায় মুখটা দেখলাম হারিকেনের আলোয়।

বললাম, ও কিছু নয়।

বলে কলতলার দিকে চলে গেলাম। মেয়েটা আমার মুখ চেপে ধরেছিল নিজের হাত দিয়ে, তাই হয়ত তার হাতের মেহেদী রঙ আমার মুখে লেগে গেছে।

সাবান দিয়ে ঘসে ঘসে মুখের রঙটা পরিষ্কার করে তুলে ফেললাম। তারপর জামা-কাপড় বদলে দাদার সঙ্গে খেতে বসলাম।

পরের দিন সকালবেলা যথারীতি ছাতা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে যাচ্ছি, আমার স্ত্রী বললে, আজকেও তোমার দেরি হবে নাকি?

বললাম, এখন থেকে কিছু বলতে পারছি না, আজকে বোধ হয় দেরি হবে না।

বাইরে দাদার সঙ্গে দেখা হল।

দাদাও জিজ্ঞেস করলে, আজকে তোমার দেরি হবে নাকি তিনকড়ি?

বললাম, আজকে বোধহয় দেরি হবে না, আজ বোধহয় পণ্ডিতজী চতুরাননকে পাঠাবে।

তারপর হাঁটতে হাঁটতে আবার সেই বড়বাজারে চললাম। চারিদিকে লোকজন, জনতা, গাড়ি, ঘোড়া সব চলেছে। রাস্তার একপাশ দিয়ে নিজের মনেই ছাতা মাথায় দিয়ে চলছিলাম। আগের দিনের মোহটা তখনও মাথার মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। আবার যদি ঘনশ্যামবাবুর বাড়ির নাম করে ওই বাড়িতে ঢুকে পড়ি আবার যদি

সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়! আবার যদি সেই ভুল হয়! আবার যদি সেই ঘটনা ঘটে!

গদিবাড়িতে যেতেই দেখি হৈ-চৈ পড়ে গেছে খুব!

পণ্ডিতজী আমায় দেখেই বলে উঠলেন, কাল ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে যাও নি বাঙালীবাবু?

চতুরাননজী আমার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছিল!

বললে, বাঙালী ঘুমিয়ে পড়েছিল রাস্তায়, ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল বিলকুল।

তিলকচাঁদ বললে, বাঙালী-লোক রোটি খায় না খালি ভাত খায়।

পণ্ডিতজী বললেন, কী হয়েছিল তোমার বাঙালীবাবু? যাও নি কেন?

বললাম, বাড়ি চিনতে পারি নি পণ্ডিতজী, গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।

পণ্ডিতজী বললেন, কেন? গোলমাল হল কেন?

বললাম, পঁচাত্তরের দুই অন্ধকারে খুঁজে পেলাম না, সব এক রকম দেখতে, সব লাল রঙ-এর বাড়ি।

পণ্ডিতজী বললেন, তাজ্জব কি বাত্, একটা কাজ করতে পারলে না। বাবুজী খুব গোসা করেছে, সকালবেলাই টেলিফোন করেছিল।

বললাম, আজ যাব ঠিক পণ্ডিতজী।

পণ্ডিতজী বললেন, আজ আর তোমাকে যেতে হবে না বাঙালী-বাবু, আজ চতুরাননজীকে পাঠাব।

বললাম, কসুর মাপ করবেন পণ্ডিতজী, আজ আমি ঠিক যাব, আর কাউকে যেতে হবে না।

পণ্ডিতজী খুব রাগ করেছেন মনে হল। মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল তাঁর।

বললেন, কাম ঠিক মত না-করলে বাবুজী আমার ওপর গোসা করে, জরুরী সই নেবার ছিল, সেই সই নেওয়া হল না, এ-রকম করলে কী রকম করে চলবে গদিবাড়ির ?

মুখে গজ্ গজ্ করতে লাগলেন অনেকক্ষণ। বুঝলাম খুব ক্ষতি হয়ে গেছে। মুখ বুজে কাজ করতে লাগলাম একমনে। দুপুর বারোটার সময় চা-ওয়ালা এল। সবাই চা খেতে লাগল। আমি চা খাই না। সুতরাং আমি মাথা নিচু করে কাজই করতে লাগলাম। ভাবলাম, আমার আর যাওয়া হবে না সেখানে। কেমন যেন হতাশ হয়ে গেলাম। আবার যদি সেখানে যেতে পারতাম, অন্তত জানতে চেষ্টা করতাম আগের দিন কে আমার মুখ টিপে ধরেছিল! আগের দিন কার সঙ্গে কথা বলেছিলাম! জানবার অবশ্য উপায় নেই কোনও। কিন্তু তবু সেই বাড়িটার সামনে গিয়ে দেখতাম। বাড়িটার চারপাশে ভাল করে পরীক্ষা করতাম। আর সুযোগ পেলে আর একবার ভেতরে ঢুকতাম।

পণ্ডিতজী বোধহয় অনেকক্ষণ আমার দিকে লক্ষ্য করেছিলেন।

বললেন, বাঙালীবাবু!

মুখ তুলে চাইলাম।

বললাম, আজ্ঞে—

পণ্ডিতজী বললেন, আজ ঠিক যেতে পারবে তো বাঙালীবাবু? আজ কোনও কসুর হবে না তো ?

আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম যেন।

বললাম, আজ কোনও গাফলতি হবে না পণ্ডিতজী, দেখবেন, আজ ঠিক ঠিক যাব!

পণ্ডিতজী বললেন, তাহলে তৈরী হয়ে নাও, পাঁচটার পর সোজা যাবে কটন্ ষ্ট্রীটে।

সমস্ত শরীরে কেমন অদ্ভুত এক শিহরণ খেলে গেল আমার। এবার আর ভয় করবে না। এবার সোজা জিজ্ঞেস করব, কাল যে লোকটার সঙ্গে কথা বলছিলে, ও লোকটা কে? কার সঙ্গে ঝগড়া করছিলে? সরযূপ্রসাদ কে? ও কেন আসে? কেন তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছ? তোমার স্বার্থ কী? লোকটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কীসের? লোকটা যদি আসতে না চায় তোমাদের বাড়িতে, কেন তাকে ডেকে আন? লোকটা কীসের জন্য আসে? তুমিই বা কী চাও আর লোকটাই বা কী চায়?

সমস্ত দুপুরটা যেন একটা অস্বস্তিতে কাটল আমার। আমি মুখ নিচু করে খাতা লিখতে লাগলাম, কিন্তু মনটা আমার অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

চতুরাননজী একবার পাশ থেকে বললে, কী ভাবছ বাঙালীবাবু?

এক মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়েছি।

তারপর তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নেবার জন্যে আরও দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়ে খাতা লিখতে লাগলাম। যেন দেরি না হয়। যেন পাঁচটার পর আর বেশিক্ষণ গদিতে না থাকতে হয়।

কিন্তু হঠাৎ একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল।

কয়েকজন পুলিস আর একজন দারোগা সোজা ঢুকে পড়েছে দোকানে। ঘনশ্যামবাবু নেই, তাই সোজা একেবারে পণ্ডিতজীর সামনে এসে হাজির হল।

পণ্ডিতজী, চতুরাননজী, তিলকচাঁদজী, আমি, সবাই অবাক হয়ে গেছি!

পণ্ডিতজীর সামনে এসে দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলে, ঘনশ্যাম-বাবু কোথায় ?

পণ্ডিতজী বললেন, তাঁর অসুখ, তিনি গদিতে আসেননি কাল থেকে। কী দরকার বলুন, আমি গদির হেড্ মুন্সী।

দারোগা সাহেব সোজা জিজ্ঞেস করলে, তিনকড়ি ভঞ্জ কার নাম ?

সামনে আমার দিকে দেখিয়ে পণ্ডিতজী বললেন, ওই যে—

আমি তখন আকাশ থেকে পড়েছি !

বললাম, আমি।

পুলিস পণ্ডিতজীর দিকে চেয়ে বললে, আমি ওঁকে গ্রেপ্তার করছি।

বলে আমার দিকে এগিয়ে এল সবাই।

পণ্ডিতজী অবাক, চতুরাননজী, তিলকচাঁদজী সবাই-ই অবাক। আমিও যেন হতবাক হয়ে গেছি। মাথার ওপর যেন বাজ ভেঙে পড়েছে আমার। আমার কোনও জ্ঞান নেই যেন। আমি যেন মাটির তলায় তলিয়ে যাচ্ছি। হাতের কাছে আমার কোনও অবলম্বন নেই যে ধরব! আমি যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সব অদৃশ্য হয়ে গেছে আমার চোখের সামনে।

শুধু কানে গেল পণ্ডিতজী জিজ্ঞেস করলে একবার, কেন ?

পুলিস শুধু বললে, কাল পঁচাত্তরের তিন কটন স্ট্রীটের বাড়িতে একটা খুন হয়ে গেছে॥

তিনকড়িবাবু একটু থেমে বললেন আপনাদের দেরি করিয়ে দিচ্ছি কবিরাজ মশাই।

বাবা বললেন, না না, আপনি বলুন—তারপর ? আপনি কি জেল খাটলেন নাকি ?

তিনকড়িবাবু বললেন, বলছি সব আপনাকে, যে আপনি চৌধুরী সাহেবের অসুখ সারিয়েছেন শুনেছি, কিন্তু সারাবার মালিক কি আপনি? ঠিক করে বলুন তো। আমিও তো একদিন এখানে এসেছিলাম ডাক্তারি করব বলে। কিন্তু ডাক্তারির কী জানি যে করব! একটা হোমিওপ্যাথিক বই-ই ছিল কেবল ভরসা।

তবে গোড়া থেকে বলি শুনুন।

দেওঘরে তখন সস্তা সব জিনিসপত্র। জেল থেকে যেদিন ছাড়া পেলাম কারোর সামনে আর মুখ দেখাবার অবস্থা রইল না আমার।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ক'বছর জেল হলো?

তিনকড়িবাবু বললেন, মানুষ খুন করার অপরাধে আমার ফাঁসিই হবার কথা। অর্থাৎ তিনশো দুই ধারার মতেই আমার বিচার হবার কথা। আমি নাকি সরযূপ্রসাদকে খুন করেছিলাম। আমি নাকি টাকা ধার করেছিলাম সরযূপ্রসাদের কাছে। কে যে সরযূপ্রসাদ, তাকে আমি চোখেও দেখলাম না! আর কবে যে আমি টাকা ধার করলাম, কত টাকা ধার করলাম তা-ও জানি না। কিন্তু সাক্ষীরা সবাই প্রমাণ করে দিলে আমি গরীব লোক, সাত টাকা মাইনে পাই, আমি সংসার চালাতে পারি না, তাই সরযূপ্রসাদের কাছে আমি টাকা ধার করতাম মাঝে মাঝে। সেই টাকা বেড়ে বেড়ে অনেক টাকা যখন হলো তখন অন্য কোনও উপায় না দেখে আমি সরযূপ্রসাদকে খুন করেছি। সরযূপ্রসাদ তার আত্মীয় বাকেবিহারীর বাড়িতে প্রায়ই যেত, আমি তার পেছনে পেছনে গিয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে তাকে খুন করেছি।

আমাকে উকীল জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি সরযূপ্রসাদকে খুন করবার জন্যে বহুদিন ধরেই ওর পেছনে ঘুরছ?

আমি বললাম, আমি সরযূপ্রসাদকে কখনও চোখেই দেখিনি।

উকীল বললে, চোখে দেখনি অথচ ঠিক লোককে খুন করতে তো তোমার ভুল হয় নি! সরযূপ্রসাদ যে বাকেবিহারীর বাড়ি যায়, এটা

তুমি কি করে জানলে? নিশ্চয়ই কয়েকদিন ধরে তুমি ওর পিছনে ঘুরেছ?

উকীল আবার জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি করে জানলে যে বাঁকে-বিহারীবাবুর বাড়ির সবাই সেদিন আত্মীয়ের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাবে?

আশ্চর্য হয়ে গেলাম, যখন সব সাক্ষী এসে বললে, সেদিন বাড়িতে চাকর-দরোয়ান ছাড়া আর কেউই ছিল না।

আমার উকীল বললে, জয়ন্তীয়া বলে একটা মেয়ে সেদিন বাড়িতে ছিল।

কিন্তু সাক্ষীরা বললে, জয়ন্তীয়া দলের সঙ্গে সাদিবাড়িতে গিয়েছিল।

শেষে জয়ন্তীয়াও এল সাক্ষী দিতে। আমি চোখ তুলে চেহারাটা দেখলাম। মস্ত বড় ঘোমটা দিয়ে সেই সেদিনকার মেয়েটিই বললে, সেদিন সে সে-সময়ে বাড়ি ছিল না। আমাকে সে কখনও দেখে নি, আমাকে সে চেনে না। সে অনেক রাত্রে সকলের সঙ্গে বাড়ি এসে দেখল তাদের আত্মীয় সরযূপ্রসাদ খুন হয়ে পড়ে আছে।

আমি অবাক হয়ে তার ঘোমটা-ঢাকা মুখখানার দিকে চেয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভাল করে দেখা গেল না। তবু সেই একই গলার স্বর, সেই একই চেহারা। কোনও তফাৎ নেই!

আমার উকীল জিজ্ঞেস করলে, আপনি সরযূপ্রসাদকে সেদিন বাড়িতে আসতে চিঠি লিখেছিলেন?

জয়ন্তীয়া উত্তর দিলে, না।

—আপনি সরযূপ্রসাদের কারবারে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন?

জয়ন্তীয়া উত্তর দিল, না।

—সরযূপ্রসাদের ওপর আপনার খুব রাগ ছিল, না?

জয়ন্তীয়া বললে, রাগ থাকবে কেন? সে তো কোন অপরাধ করেনি।

আমার উকীল বললে, কিন্তু সে অন্য একটা মেয়ে মানুষকে রক্ষিতা হিসেবে রাখার জন্যে আপনি তাকে খুব গালাগালি দিয়েছিলেন, না ?

জয়ন্তীয়া কোনও উত্তর দিল না।

আমার উকীল আবার বললে, আপনি তাকে অনেকবার সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও সে তার রক্ষিতার কাছে যেত। আপনার কাছে আসা বন্ধ করেছিল সে। এ-কথা কি সত্যি ?

জয়ন্তীয়া উত্তর দিল না॥

—শেষে যেদিন সবাই বাড়িতে অনুপস্থিত, সেইদিন তাকে বাড়িতে ডাকিয়ে এনে শেষে প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করেন ?

যে-কদিন মামলা চলল সে ক'দিন কোর্টে কী ভীড় ? আমার দাদা আমাদের বাড়ি বিক্রী করে উকীলের টাকা যোগাড় করতে লাগল। দাদার দিকে চেয়ে দেখতাম—তার চেহারা যেন শুকিয়ে গেল দিন দিন। আমার জামিন হয়নি। হাজতের মধ্যে দিনের পর দিন আমি ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেলাম। মনে হলো আর সহ্য হয় না ! যাহোক একটা কিছু হয়ে গেলে বাচি।

শেষে রায় বেরোল।

বাড়িতে কী অবস্থা হলো তা দেখবার দুর্ভোগ আমাকে ভুগতে হয়নি। দাদা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কোর্টের মধ্যে। আমি গিয়ে পুলিসের ভ্যানের মধ্যে উঠলাম। ভালই হলো ! ফাঁসি আমার হলো না—তার জন্য ধন্যবাদ দিলাম ঈশ্বরকে। তিনশো দুই ধারার বদলে তিনশো ধারার সুবিধে পেলাম। আমার জীবনের অন্য এক পরিচ্ছেদ শুরু হলো।

জেলের ভেতরের দীর্ঘ দিনের ইতিহাস আপনাকে বলব না। তাতে কোনও নতুনত্ব নেই। একটানা কষ্টভোগের সে জীবন।

কোথা দিয়ে দিন হত আর দিন চলে যেত তার বর্ণনা দেবার দরকার নেই। কিন্তু যখন বহুদিন পরে জেল থেকে বেরোলাম, বাড়িতে গিয়ে দেখি একমাত্র দাদা ছাড়া সবাই বেঁচে আছে। বাড়িটা দাদা বিক্রি করেনি, বন্ধক রেখেছিল। সেটা আবার ছাড়ানো হয়েছে। এক বোনের বিয়ে দিয়েছিল দাদা মৃত্যুর আগে, সেই ভগ্নিপতি দেখাশোনা করেছে সবাইকে।

দু,একদিন পরেই বুঝলাম, সংসারে আমার আবির্ভাব সকলে সুস্থ মনে গ্রহণ করতে পারেনি।

একে চাকরি নেই, তার ওপর খুনের অপরাধে আসামী। সমস্ত মানুষ-সমাজের ওপর তখন আমার বিতৃষ্ণা জন্মেছে। কারো সঙ্গে কথা বলি না, কারো সঙ্গে দেখা করি না। আমি যেন সংসারে অপাংক্তেয় হয়ে গিয়েছি।

আর বেশিদিন সহ্য করতে পারলাম না সেই অবস্থা।

আমার স্ত্রীর কাছে তখন পঁচিশ টাকা ছিল। আর ছিল হাতের দু'গাছা সোনার চুড়ি। সেইটুকু সম্বল করে একদিন এখানে চলে এলাম। ভাবলাম যত কষ্টই হোক কলকাতায় আর নয়। বৈদ্যনাথের পায়ের কাছে থেকে উপোস করব দু'জনে কিন্তু কলকাতার মানুষ আর নয়। ঘর পর তখন একাকার হয়ে গেছে। কলকাতায় আর বেশি দিন থাকলে আমি বাঁচব না।

সেই পঁচিশ টাকা নিলাম পকেটে। গয়না দুটো বেচে আশি টাকা হলো। তারপর স্ত্রীকে নিয়ে ট্রেনে উঠে বসলাম। আসবার আগে দোকান থেকে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স আর একখানা বই কিনে নিলাম। অথচ ডাক্তারির তখন আমি কিছুই জানি না।

স্ত্রীকে বললাম, বিদেশে গিয়ে থাকবে, তোমার কষ্ট হবে না তো ?

আমার স্ত্রী বরাবরই চাপা-প্রকৃতির মানুষ। শত দুঃখ-কষ্টেও তার মুখে কোনও দিন বিরক্তির ছাপ দেখিনি। মাথা নেড়ে বললে, না।

ট্রেনে উঠে তো বসলাম। ভাবতে লাগলাম ভাসতে ভাসতে

কোথায় যাব জানি না। যে আমাকে অকারণে খুনের অপরাধে জেলে পাঠিয়েছে সে-ই আবার বাবা বৈদ্যনাথের কাছে ঠেলে দিলে। আমার আর কি করবার ছিল। আমার অভিযোগ করবার কি-ই বা আছে! আমি স্রোতের মুখে ভেসে পড়লাম। চাউলপটির ভঞ্জ-বংশের শেষ বংশধর আমি পাড়ার লোকের কলকাতার লোকের চোখের আড়ালে চলে গেলাম। কেউ আমাকে স্টেশনে বিদায়-অভিনন্দন জানাতে এল না। কেউ শুভেচ্ছা জানালে না আমার যাত্রারম্ভে। পাড়ার লোক সংসারের লোক সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। আমি তাদের কলঙ্কের হাত থেকে যথাসাধ্য মুক্তি দিলাম। আমি আমার সংসারের লোকদের অসম্মান থেকে বাঁচালাম। তখনও আমার এক বোনের বিয়ে হয়নি। তার বিয়ে হওয়ার পথে আমি কেন প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াব? আমি কাউকে সাহায্য না-করতে পারি, কিন্তু কারো প্রতিবন্ধক হব না জীবনে। আমি চোখের জল ফেললাম। সে-চোখের জলে কারো মনের ক্ষেত্র সরস হবে না জানতাম—তবু চোখের জল ফেললাম। দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে ততটা নয় যতটা আমার কাছে কেউ রইল না বলেই চোখের জল ফেললাম।

আমার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। আশ্চর্য! দেখলাম সে-চোখ শুক্‌নো!

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কষ্ট হচ্ছে না কলকাতা ছাড়তে?

আমার স্ত্রী মাথা নেড়ে বললে, না।

দেওঘরে তো এলাম। এই দেওঘর। আপনাকে তো বলেছি তখনকার দিনের দেওঘরের কথা। অন্ধকার রাস্তাগুলো। এখনকার

মত তখন এত ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। বাজারের কাছে একটা ঘর ভাড়া করলাম। ঘর মানে ঘর ঠিক নয় সেটা থাকবার একটা আশ্রয়। কোনও রকমে মাথা গুঁজে থাকা যায়। মাসে এক টাকা ভাড়া। আর রাস্তার ধারে এইখানে একটা দোকান ভাড়া করলাম। এই এখন যেখানে বসে আছেন, এইখানেই ছিল সেই ঘরটা। মাসে দু'টাকা ভাড়া। এইটেই হলো আমার ডাক্তারখানা।

পকেটে আমার মাত্র তখন একত্রিশটা টাকা। আর সব জিনিস-পত্র কিনতে খরচ হয়ে গিয়েছে। সেই একত্রিশ টাকার ওপর ভরসা করে আমি এক শুভদিন দেখে ডাক্তারি করতে শুরু করলাম।

ডাক্তারির তখন কিছুই জানি না। কাকে বলে অ্যানাটমি, কাকে বলে ফিজিওলজি, কাকে বলে মেটিরিয়া মেডিকা কিছুই জানি না। সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখানে এসে বসি। বইটা নিয়ে মন দিয়ে পড়ি। আর রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি।

বাইরে সাইনবোর্ড একটা লাগিয়ে দিয়েছিলাম। 'দি গ্রেট হোমিও হল্' লেখা। তীর্থযাত্রীরা সেদিকে তাকিয়ে দেখত। মাটির বাড়ি, টিনের চাল।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সাইনবোর্ডটার দিকে তাকিয়ে তারা হেসে ফেলত। বলত, দেখ, দেখ হে, 'দি গ্রেট হোমিও হল্' দেখ।

সামনে আলকাতরা মাখানো একটা দরজা। ঘরের ভেতরে ঢুকতে গেলে মাথা নিচু করতে হয়। মনে হত একটা ঝড়ের ঝাপটা এলেই ঘরটার বুঝি আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। একেবারে হুড়মুড় করে পড়ে যাবে মুখ থুবড়ে। আর আরও ভেতরের দিকে যারা চাইত তারা আরও হাসত। হেসে গড়িয়ে পড়ত। রোগী নেই, পত্র নেই, একজন কম বয়সী লোক রাস্তার দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে আছে। রোগীর আশাতেই বসে আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে বসে একটা রোগীরও দেখা মিলত না, তখন দরজায় তালা লাগিয়ে আমি চলে যেতাম বাড়িতে তারপর সন্ধ্যেবেলা স্বামী-স্ত্রীতে

মিলে যেতাম মন্দিরে। বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে গিয়ে বসতাম খানিক।

মনে মনে বলতাম, তোমার পায়ে আশ্রয় নিয়েছি ঠাকুর, আমাদের দেখো তুমি।

তারপর মন্দির থেকে উঠে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি চলে আসতাম।

আর উল্টো দিকে—আমার ডাক্তারখানার ঠিক উল্টোদিকে ছিল মস্ত একটা বাড়ি। ওই দেখুন। ওই বাড়িটা তখনও ছিল। শুনতাম পঞ্চকোট না কোথাকার এক রাজার বাড়ি। লাল ইঁটের সুন্দর বাড়িটা। তখন বাড়িটা ছিল নতুন। বছরে একবার পুজোর সময় রাজাসাহেব আসত। তখন বাড়িটার সদর দরজায় বন্দুক নিয়ে পাহারা দিত দরোয়ান। আর এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত বাড়ির সবগুলো জানালা দরজা কিন্তু সমস্ত দিন বন্ধ থাকত। নতুন বাড়ি। অন্তত জানালা দরজা ইট কাঠ সমস্ত রঙ করা হয়েছিল নতুন করে। ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করত বাড়িখানা। আর মাঝে মাঝে একটা বিরাট মোটরগাড়ি এসে দাঁড়াত সামনে। সঙ্গে সঙ্গে পর্দা খাটানো হয়ে যেত সামনে। কে নামত কে উঠত বোঝা যেত না, তবু আমি হাঁ করে চেয়ে থাকতাম সেই দিকে।

কিন্তু ওইটুকু ছিল আমার সারাদিনের বিলাস।

কিছুদিন পরেই আমার বড় ছেলে হয়েছে, তার খাওয়া খরচ আছে। আমার একত্রিশটা টাকা তখন কমে কমে শূন্যতে আসবার দাখিল।

মন্দিরে গিয়ে বাবাকে মনে মনে বলি, তোমার পায়ে আশ্রয় নিয়েছি ঠাকুর, আমাদের দেখো তুমি।

তা পাথরের ঠাকুর তো আমাদের জন্যে নয়। আমাদের ঠাকুর হলো রোগী। সেই রোগীর কৃপাকণা যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ কোনও ভরসাই নেই। রোগী একটা-দুটো যে না-আসে তা নয়। রোগীরা আসে। আমিও ওষুধ দিই। কিন্তু যে একবার আসে সে আর দু'বার আসে না। দু'বার এলেও তিন বারের বার কখনও আসতে দেখিনি। অথচ টাকার দরকার। টাকা না-এলে আর সংসার চালানো যাবে না। টাকার জন্যে একমাত্র প্রয়োজন রোগীর। সেই রোগীই আর আসে না।

পরের বছর আমার ছোট ছেলেটি হলো। তখন আরও দুর্ভাবনায় পড়লাম।

মন্দিরে গেলাম। : ঠাকুরকে আবার বললাম, তোমার পায়ে আশ্রয় নিয়েছি ঠাকুর, আমাদের দেখো তুমি।

সেবার পুজোর সময় সামনের বাড়িতে আবার সেই রাজারা এল। একলা টিনের চালের তলায় বসে দেখতে লাগলাম— আবার বন্দুক কাঁধে পাহারা বসে গেছে সদর দরজায়। বাড়িটা নতুন রঙ করা হয়ে গেছে। এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত সমস্ত বাড়িটার জানলা-দরজা বন্ধ। আবার একটা মোটরগাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে। সঙ্গে সঙ্গে পর্দা খাটানো হয়ে গেল গাড়ি থেকে শুরু করে সদর দরজা পর্যন্ত। কে নামল, কে-ই বা উঠল বুঝতে পারলাম না। দরোয়ানটা একবার বন্দুক নামিয়ে সেলাম করল। তারপর আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বুঝতে পারলাম, রাজারা এল। কিন্তু তাতে আমার কী এসে

যায়। আমি জন্মেছি দুঃখ-কষ্ট করতে, সুতরাং আমার জীবন এমনিই কাটবে।

সেদিন স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে ক'টা টাকা আছে?

স্ত্রী বললে, তিনটে।

সমস্ত রাত ঘুম এল না। এমন করে কতদিন চলবে! তক্তপোশের ওপর দু'টো ছেলে শুয়ে ছিল, তাদের দিকেও তাকালাম। খেতে না পেয়ে তাদের চেহারাও শুকিয়ে আসছে। স্ত্রীর দিকেও খেয়ে দেখলাম। তার দিকে আর চেয়ে দেখা যায় না। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলাম, শুয়ে শুয়েই। বললাম, তোমার পায়ে আশ্রয় নিয়েছি ঠাকুর, আমাদের দেখো তুমি।

বোধহয় একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল। ভাবতে ভাবতে বোধহয় দুর্ভাবনায় একটু আচ্ছন্ন ভাব এসেছিল।

হঠাৎ বাইরে যেন কার গলা শোনা গেল।

—ডাক্তার সা'ব! ডাক্তার সা'ব!!

চম্‌কে উঠলাম।

কখনও তো এমন করে রাত জেগে কোনও রোগী ডাকতে আসে না আমাকে। ভুল শুনি নি তো! স্বপ্ন দেখি নি তো? ঠিক শুনেছি তো? জেগে আছি তো?

আবার ডাক এল।

—ডাক্তার সা'ব? ডাক্তার সা'ব?

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম! আমার স্ত্রীও শুনতে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি হারিকেনটা জ্বেলে দিল আমার স্ত্রী। আমার ছেঁড়া কাপড়। খালি পা। তাড়াতাড়ি কাপড়টা বদলালাম। বদলে দরজাটা খুলে বাইরে এলাম।

বললাম, কে?'

বাইরে তখন অনেক লোক। সঙ্গে একটা পেট্রোম্যাক্স বাতি। সমস্ত বস্তিটা একেবারে দিন হয়ে গেছে সে আলোয়।

সামনে একজন ভদ্রলোক। হিন্দুস্থানী।

আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করলে, আপনিই ডাক্তার সাহেব?

বললাম, হ্যাঁ।

লোকটি বললে, স্টেশন রোডেই আপনার 'দি গ্রেট হোমিও হল্' ডাক্তারখানা?

আমি আবার বললাম, হ্যাঁ।

লোকটি বললে, আপনাকে এখুনি একবার যেতে হবে, একটি ছেলের খুব অসুখ, ছটফট্ করছে। এই রাত্রেই যেতে হবে দেখতে।

আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম। আমি যেন খানিকক্ষণের জন্যে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আবার যেন বাক্যরোধ হয়ে গিয়েছিল। এ কী আশার বাণী শোনালে ঠাকুর! এতদিন তোমার চরণে এসে উঠেছি, এমন অপ্রত্যাশিত ডাক তো কখনও শুনি নি।

লোকটি যেন আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বললে, আপনি যত টাকা ভিজিট চান সব দেওয়া হবে। আপনি সে-সব ভাববেন না—আপনার জন্যে গাড়ি এনেছি।

তবু যেন কেমন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার জন্যে গাড়ি! আমি ডাক্তারির কী জানি! কী অসুখ! কী ওষুধ দেব! আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

লোকটি বললে, পাঁচশো টাকা চান তো তা-ই দেওয়া হবে। আপনি এখুনি চলুন।

বললাম, এখন রাত ক'টা?

লোকটির হাতে ঘড়ি ছিল।

দেখে বললে, দু'টো।

বললাম, তাহলে কাপড়টা পরে নিই?

লোকজন সেখানেই সব দাঁড়িয়ে রইল। আমার তো বসবার ঘর নেই। একটাই মাত্র ঘর, আর সেটা আমার শোবার ঘর। সেই ঘরটাই আমার সব।

ঘরের ভেতর যেতেই স্ত্রী আমার দিকে ভয়ে ভয়ে চাইলে।

বললাম, ফরসা কাপড় আছে একটা।

স্ত্রী কাপড় বার করে দিলে, জামা বার করে দিলে। স্টেথিস্‌কোপ্‌টা নিলাম। ওর ব্যবহার জানি না। কিন্তু নিতে হয় ওটা। ওটা ডাক্তারের অঙ্গ। কিন্তু যেতে যেন মন সরছিল না। যত টাকা চাই তত দেবে! পাঁচশো টাকা!

দেখলাম, দেওয়ালে টাঙানো বাবা বৈদ্যনাথের ছবিখানার দিকে চেয়ে আমার স্ত্রী গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করছে।

আমিও একবার প্রণাম করলাম। মনে মনে বললাম, তোমার পায়ে আশ্রয় নিয়েছি ঠাকুর, আমাদের দেখো তুমি।

স্ত্রীকে বললাম, তুমি দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়, আমি আসবো'খন।

বাড়ির সামনে অনেকখানি হেঁটে তবে বড় রাস্তার আসতে হয়। সবাই সেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চললাম।

ভদ্রলোক বললে, অনেক তক্‌লিফ্‌ করে আপনার কোঠির ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে ডাক্তার সা'ব।

বড় রাস্তার উপর বিরাট একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। এতবড় গাড়ি! মনে হলো গাড়িটা যেন আমার চেনা-চেনা। অনেকবার দেখেছি।

আমরা উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিলে। খানিক পরেই গাড়িটা যেখানে এসে থামল, আশ্চর্য, সেটা আমারই ডাক্তারখানার সামনে—মহারাজার বাড়ির সামনে।

সদর দরজার সামনে গাড়ি থামতেই দরোয়ান দরজা খুলে দিলে।

গাড়িটা সোজা ভেতরে গিয়ে থামল।

ভদ্রলোক আগে নামল।

বললে, আসুন ডাক্তারবাবু।

আমি নামলাম। আর ভয়ে বুক কাঁপতে লাগল। শেষে কি না এই বাড়ি থেকেই আমার ডাক এল! শুনেছিলাম পঞ্চকোট না কোথাকার রাজা। কিংবা মহারাজ হবে হয়ত। কতদিন চুপচাপ ডাক্তারখানায় বসে এ-বাড়ির ঐশ্বর্য বৈভব বিলাস সব লক্ষ্য করেছি। আজ এখান থেকেই আমার ডাক এল!

সামনে পেট্রোম্যাক্স বাতিটার আলোয় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম আমি। বাইরে থেকেই বাড়িটাকে চিনতাম আগে। এবার ভেতরে আসবারও সুযোগ পেলাম। যত বিরাট ভেবেছিলাম, বাড়িটা তার চেয়েও বিরাট দেখলাম। অত রাত্রেও সমস্ত বাড়িতে সবাই জেগে রয়েছে। অসংখ্য চাকর-বাকর সব সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। মহারাজার ছেলের অসুখ, সুতরাং কারো বিশ্রাম করবার অবকাশ নেই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বিরাট হলঘর।

সেখানেই আমাকে বসিয়ে ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেল।

আমি চারদিকে চেয়ে দেখলাম। চারপাশে ছোট ছোট ঘর। একটা ঘরের দরজা খোলা। সেটা কাছারি-ঘর মনে হলো। ভেতরে অনেক খাতা-পত্র টেবিল চেয়ার রয়েছে।

আমি অনেকক্ষণ বসে রইলাম সেখানে।

ভদ্রলোক আবার ফিরে এল।

বললে, চলুন ডাক্তার সা'ব।

এবার অন্দর-মহল।

নেই। অন্দর-মহলে কারোর সাড়া-শব্দই পাওয়া গেল না। অনেক ঘরটাই আম৷

বারান্দা, দালান, ঘর পেরিয়ে একটা ঘরের সামনে দেখলাম বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছেন একজন। বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা। ফরসা ধপ্‌ ধপ্‌ করছে রং। মাথার সামনের দিকে চুলটা একটু পাতলা হয়ে গেছে মনে হলো। আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন।

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক বললে, ডাক্তার সা'ব এসেছেন মহারাজ জী।

বুঝলাম উনিই মহারাজা।

মহারাজা বললেন, আসুন আপনি।

বলে আমাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। একটা পালঙ্কের ওপর সাত-আট বছর বয়সের একটা ছেলে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মাথার বালিশ ছিটকে পড়েছে দূরে। অস্থির চেহারা। চোখ বোজা।

বললাম, কী হয়েছে এর?

মহারাজ বললেন, আজ ভোর রাত থেকে শরীরটা খারাপ, কিচ্ছু খাওয়া-দাওয়া করছে না, কেবল কাঁদছিল, যত রাত বাড়ছে তত বেশি ছটফট করছে।

মাথায় হাত দিলাম। খুব জ্বর।

বললাম, জ্বর কত, দেখা হয়েছে?

মহারাজ বললেন, না।

বুকে একবার স্টেথিসকোপটা বসিয়ে দেখলাম অতি কষ্টে। বুকে সর্দি কাশি রয়েছে মনে হলো।

এবার জ্বরটা নেবার ব্যবস্থা করলাম। অনেক কষ্টে হাতটা চেপে ধরে জ্বর নিলাম। দেখলাম একশো তিন ডিগ্রী!

কী যে ভাবলাম, কী যে দেখছি, কিছুই বুঝতে পারলাম না। রাজার ছেলের চিকিৎসা। সাধারণ বস্তির লোক হলেও কথা ছিল। এ কী পরীক্ষায় ফেললে ঠাকুর! আমি তো অনেক পরীক্ষা দিয়েছি আগে। জীবনে অকারণে অনেক দুর্ভোগ সইতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু এখনও কি পরীক্ষা শেষ হয় নি। এতদিন রোগীর আশায় পথ চেয়ে

বসে থেকেছি দিনের পর দিন। ডাক্তারখানার টিনের চালের তলায় অন্ধকার নির্জন ঘরে রাস্তার তীর্থযাত্রীদের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন কেটেছে। কোনও দিন ভুলেও একটা রোগী আসে নি। একেবারে যে আসেনি তা নয়। কিন্তু সে না-আসারই সমান। যে একবার এসেছে সে দ্বিতীয়বার আর আসেনি। কিন্তু এবার এত করুণা তোমার কেমন করে সইব!

মহারাজ আর সেই হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আমার দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়েছিলেন।

আমি হাতটা রোগীর গা থেকে তুলে নিতেই বললেন, কী দেখলেন?

বললাম, দেখি, কী করতে পারি!

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

বললাম, বিশেষ কিছু নয়, এক দাগ ওষুধ আমি দিচ্ছি।

মহারাজ বললেন, কলকাতার সব ডাক্তারদের আজ সকালেই টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁরা তো কাল ভোরের আগে কেউ আসতে পারছেন না, তাই ততক্ষণ আপনি দেখুন।

সত্যি বলছি কবিরাজ মশাই, মাথার ওপর আমার যেন বাজ ভেঙে পড়ল। কলকাতার সেরা সেরা সব ডাক্তার, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে আমাকে!

রোগীকে রেখে আমি হল ঘরে এলাম। আমার ওষুধের বাক্সটা আর বইখানা ছিল সেখানে। বইটা একবার খোলবার চেষ্টা

করলাম। কোন্ পাতায় খুঁজব! কী লক্ষণ মেলাব! কিছুই যে আমি জানি না। মোটা বইখানার পাতার মধ্যে যেন আমি হারিয়ে গেলাম। চোখের সামনে কিছুই স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। সমস্ত অক্ষরগুলো যেন সচল হয়ে আমার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল।

তারপর ওষুধের বাক্সটা খুললাম।

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আমার পাশেই দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। তার সামনে নিজেকে যেন বড় ছোট মনে হলো। যদি আমার অজ্ঞতা ধরা পড়ে যায়! কোন্ ওষুধটা নেব তা-ও ঠিক করতে পারলাম না। সাধারণ রোগী নয়—রাজার ছেলে, পরের দিন কলকাতার সেরা সেরা ডাক্তার আসবে দেখতে। তখন পরীক্ষা হবে। অযত্ন করে, তাচ্ছিল্য করে যা-তা ওষুধ দেওয়া যায় না। ওষুধের ছিপিগুলোর ওপর প্রত্যেকটার নাম লেখা ছিল। কিন্তু মনে হলো কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছি না। যে-টুকু এতদিনে শিখেছিলাম, তা-ও যেন ভুলে গেলাম।

শেষকালে হাতের কাছাকাছি একটা ওষুধের শিশি বার করে চারটে পুরিয়া তৈরি করলাম।

ভদ্রলোককে বললাম, একটা পুরিয়া এখুনি খাইয়ে দিন। আর আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর আরও তিনটে পুরিয়া খাওয়াতে হবে।

ওষুধটা আমার সামনেই খাইয়ে দেওয়া হলো।

আজও মনে আছে সেদিন সকলের অলক্ষ্যে কোন্ অদৃশ্য শক্তির কাছে প্রার্থনা করে জানিয়েছিলাম যেন রাজার ছেলের আরোগ্য লাভ

হয়। যেন আমার মানসম্মান বজায় থাকে। রাজার ছেলের জীবনের চেয়ে সেদিন আমার সম্মান প্রতিষ্ঠার কথাই বেশী করে ভেবেছিলাম মনে আছে। কলকাতায় আমার সম্মান ধূলিসাৎ হয়েছিল একদিন। কিন্তু সে তো আমার জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদের ব্যাপার। সে-জীবন তো কবে ত্যাগ করেছি। সে-জীবন থেকে কবে সরে এসেছি। এ আমার জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। এখানে যেন নতুন করে আবার জীবন আরম্ভ করেছি। এখানে যেন সম্মানহানি না হয়। আমার মাথা যেন উঁচু থাকে।

মহারাজ বললেন, আপনার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে পাশের ঘরে। আপনি রাতটা এখানেই থাকুন, আপনার বাড়িতে খবর দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

দেখলাম, চমৎকার একটা বিছানার আয়োজন রয়েছে হলঘরের পাশে।

আমি বললাম, আধঘণ্টা পরে যেন ওষুধটা ঠিক খাওয়ানো হয়, আর আমাকে খবর দেওয়া হয়।

বিছানার ওপর গিয়ে বসলাম। আলোটা জ্বলছিল। সেটাও নিবিয়ে দিলাম। রোগীর কাতরানীর শব্দ ওখান থেকেও শোনা যাচ্ছিল। কী জানি ভুল ওষুধ দিয়েছি কি ঠিক দিয়েছি! কী ওষুধ দিয়েছি নিজেই কি জানি! হাতের কাছাকাছি যেটা পেয়েছিলাম সেটাই দিয়েছি।

বলে রেখে দিলাম, যদি রোগটা বেড়ে চলে তাহলে যেন আমাকে ডাকা হয়।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জ্ঞান নেই।

হঠাৎ ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল। দেখলাম সকাল হয়ে গেছে।

উঠে বসলাম। দেখি সেই হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক সামনে দাঁড়িয়ে।

বললাম, কেমন আছে রোগী?

ভদ্রলোক বললে, এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, মহারাজ কোথায় ?

—তিনিও শেষরাত্রের দিকে ঘুমোতে গেছেন।

বললাম, ওষুধের সবপুরিয়াগুলো খাওয়ানো হয়েছে ?

ভদ্রলোক বললে, হ্যাঁ।

বললাম, এখন যখন ঘুমোচ্ছে রোগী, তখন আর ওষুধের দরকার নেই।

খানিক পরেই মুখ হাত-পা ধোবার জল এল। সাবান তোয়ালে এল। চা জলখাবার এল। সমস্ত বাড়ি আবার কলমুখর হয়ে উঠল।

মহারাজ এলেন।

বললেন, এই ভোরের গাড়িতেই কলকাতার ডাক্তাররা আসছেন, আমার ইচ্ছে তাঁদের কাছে আপনিও থাকেন। আপনার বাড়িতে আমি কাল রাত্রেই খবর দিয়েছি।

ভোরবেলাই ডাক্তারেরা এসে হাজির হলেন। বিখ্যাত বিখ্যাত ডাক্তার সব। কবিরাজ, অ্যালোপ্যাথ্, হোমিওপ্যাথ্ কেউ বাকি নেই। গাড়ি গিয়েছিল স্টেশনে তাঁদের আনতে। গাড়ি এসে পৌঁছতেই সবাই নেমে দাঁড়ালেন। আমি দেখলাম তাঁদের। তাঁদের নাম শুনেছিলাম এতদিন। এবার স্বচক্ষে দেখলাম। প্রত্যেককে রোজ হাজার টাকা হিসেবে ফিস্ দিয়ে আনানো হয়েছে।

সবাই রোগিকে দেখলেন।

রোগী তখন ঘুমোচ্ছে।

কী লক্ষণ, কী হয়েছিল, তারপর কেমন যন্ত্রণা হচ্ছিল, সব জিজ্ঞেস করলেন।

সাহেব ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, কে দেখছিলেন ?

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললে, উনি, এখানকার ডাক্তার সাহেব।

কলকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ইউনান সাহেব এসেছিলেন। সঙ্গে তাঁর এ্যাসিস্টাণ্ট্ও ছিল।

আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সমস্ত। জ্বর কত ছিল তখন, ঘাম হচ্ছিল কিনা। আরও অনেক তথ্য নিলেন আমার কাছ থেকে।

মনে আছে সকালবেলা আমি দেখেছিলাম কী ওষুধ আসলে আমি দিয়েছি। কিন্তু আমার কী তখন খেয়াল ছিল। অত বড় বড় ডাক্তার সব। তাঁদের মধ্যে বসে থাকতেও আমার লজ্জা হচ্ছিল। তাঁদের আর আমার জামা-কাপড়ের তফাৎটাও যেন বড় বিসদৃশ হয়ে চোখে ঠেকছিল আমার কাছে।

মনে আছে ইউনান্ সাহেব শুধু বলেছিলেন, মার্ভেলাস সিলেকশান্।

তারপর সব ডাক্তারই একমত হয়ে বললেন যে, যখন রোগী ভাল রয়েছে, তখন আর নূতন কোনও ওষুধ দেওয়া নিরর্থক। যেমন চিকিৎসা চলছে তেমনি চলুক।

বিকেল বেলা রোগীর অবস্থা আরও ভালো দেখা গেল। ডাক্তারেরা প্রত্যেকে হাজার টাকা করে নিয়ে সন্ধ্যের গাড়িতে কলকাতায় চলে গেলেন। তারপর আমাকেও গাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

মহারাজা বললেন, আপনি এ ক'দিন একবার করে রোজ আসবেন।

ক'দিন পরই বোধহয় রোগী ভাল হয়ে উঠল। তখন মহারাজার দেশে ফিরে যাবার পালা।

আমার ডাক পড়ল রাজবাড়িতে।

হলঘরের মধ্য দিয়ে পাশের কাছারি ঘরে যেতেই দেখি হিন্দুস্থানী

সেই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে। মহারাজও বোধহয় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

ভদ্রলোকটি বললে, ডাক্তার সাহেব, আপনি মহারাজের ছেলের চিকিৎসা করেছেন, অনেক তকলিফ্ নিয়েছেন, মহারাজ খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন আপনার ওপর।

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, কতদিনের প্র্যাক্‌টিস্ আমার ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাজাঞ্চিকে বললেন, ডাক্তার সাহেবকে এক হাজার রূপেয়া দিয়ে দাও মুন্সী।

মুন্সী খাতায় লিখলে খরচটা। তারপর একটা পাশে রাখা লোহার সিন্দুক থেকে গুণে গুণে একশো টাকার নোট বার করতে লাগল।

আমি যেন তখনও বিশ্বাস করতে পারি নি। এতগুলো টাকা একসঙ্গে পাওয়া দূরে থাক, চোখেও কখনও দেখি নি এত কাছ থেকে।

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক টাকাগুলো গুণে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, লিজিয়ে ডাক্তার সাব্।

হঠাৎ মনে হলো ঘরের পেছনে কোথায় ঝন্ ঝন্ করে কাঁসর আওয়াজ হলো। সেই আওয়াজ শুনেই মহারাজ উঠলেন।

বললেন, থোড়া ঠায়্রো।

বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আমার দিকে টাকাটা এগিয়ে দিয়েছিল, সে-ও হাতটা টেনে নিলে।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। আবার বাধা পড়ল কেন?

ভেতরে যেন কার গলার শব্দ পেলাম।

মুন্সী সভয়ে জিব কাটলে। খাজাঞ্চিকে বললে, রাণীসাহেবা!

হিন্দী কথাবার্তা। তবু কিছু কিছু শোনা যাচ্ছিল বাইরে থেকে। কিছু কিছু অস্পষ্ট বোঝাও যাচ্ছিল।

রাণীসাহেবা বলছিলেন, কেন? এক হাজার টাকা কেন? বাইরে

কলকাতার ডাক্তাররা এসে কিছু না করে হাজার হাজার রূপেয়া নিয়ে গেল, আর এ-ডাক্তার এতদিন দেখলে, তাকে খালি হাজার রূপেয়া ?'

মহারাজা বললেন, আচ্ছা দু'হাজার দিতে বলছি আমি, ঠিক বাত।

—কেন ? দু'হাজার কেন ? আমার ছেলের জীবনের চেয়ে কি টাকার দাম বেশি ? ছেলেকে তো এই ডাক্তার সাহেবই বাঁচিয়েছে।

মহারাজ বললেন, তাহলে কত দেব ?

রাণীসাহেবা বললেন, পঞ্চাশ হাজার তো দাও।

তারপর আরও সব কী কী কথা হলো। সব বুঝলাম না। মহারাজ বাইরে এলেন।

বললেন, মুন্সী, এক হাজার নয়, ডাক্তার সাহেবকে পঞ্চাশ হাজার রূপেয়া দেও।

তিনকড়িবাবু বলতে লাগলেন, সেই পঞ্চাশ হাজার টাকাই শুধু নয়, তারপর থেকে ঠিক হলো যতদিন বেঁচে থাকব আমি ততদিন আমার বাড়িতে রাজএস্টেট থেকে সিধে আসবে। চাল ডাল তেল ঘি মসলা। সে তো আপনাকে বলেছি আগেই।

তারপর দিনই রাজাসাহেব রাণীসাহেবা চলে গেলেন সে-বারের মত।

আমি সেই জমির ওপরই এই বাড়ি করলাম পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে। আর পঁচিশ হাজার টাকা রইল আমার ব্যাঙ্কে। তারপর প্রতি বছরই এসেছেন মহারাজা। প্রতি বছরই আমাকে কত ভেট পাঠিয়েছেন। আমার কাপড়, স্ত্রীর গয়না শাড়ি, ছেলেদের ধুতি।

তারপর বড় ছেলেকে চাকরি দিয়েছেন মহারাজা। সে পায় সাতশো টাকা। ছোট ছেলে ম্যাট্রিক পাস করেছিল, তাকেও চাকরি দিয়েছেন তিনশো টাকার। আমার ভাবনা কী বলুন, ছেলেদের চাকরি হলো, আমার সারা জীবনের মত সঞ্চয়।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, আর প্র্যাকটিস?

তিনকড়িবাবু বললেন, আর প্র্যাকটিস জমে নি। আরও অনেক রোগী পরে আসত আমার কাছে, কিন্তু কাউকে সারাতে পারিনি আর।

গল্পের পর আমরা উঠেছিলাম, অনেক রাত হয়ে এসেছিল।

তিনকড়িবাবুও বিদায় দিতে উঠলেন।

বললেন, একটা ঘটনা আপনাদের বলি নি। বছর দশেক আগে একদিন শীতকালে পণ্ডিতজীর সঙ্গে হঠাৎ এখানে দেখা। আমার বাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। খুব খুশীও হলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায় উঠেছেন পণ্ডিতজী?

পণ্ডিতজী সামনে পঞ্চকোটের রাজবাড়ি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ওই বাড়িতে দু'টো ঘর খুলে দিয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, ওদের সঙ্গে আপনার জানা-শোনা হলো কী করে?

পণ্ডিতজী বললেন, কটন্ স্ট্রীটের বাঁকে বিহারীবাবুকে জানেন? অত মামলা হলো—সেই কত কাণ্ড! মিছিমিছি আপনার ওপর খুনের দায় চাপল! সেই বাঁকেবিহারীবাবুর বড় মেয়ে জয়ন্তীয়ার সঙ্গে যে পঞ্চকোটের মহারাজকুমারের সাদি হয়েছিল। আপনি তখন জেলে।

পণ্ডিতজী সেই সূত্রেই কোনও চিঠি নিয়ে এখানে রাজ-বাড়িতে উঠেছিলেন। তাঁর কথা শুনেই প্রথম বুঝতে পারলাম যে, আমার এই বাড়ি, এই ঐশ্বর্য, এই ছেলেদের চাকরি, এর মূলে কে! কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নেই—অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। জয়ন্তীয়ারও অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে, আমিও বুড়ো হয়ে গেছি।

চতুর্থী

আমরা কি সবাই অভিনেতা? এই, আমরা যারা পুরুষ?

এক এক সময় ভাবি আমরা তো সব সময়ে অভিনয় করেই চলেছি। কিন্তু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা আমাদের স্বরূপ প্রকাশ করেছি কতটুকু? কতটুকু নিজেকে জেনেছি আর পরকেই বা জানিয়েছি?

এসব ভাবনা আমার বহু দিনের। ছোটবেলা থেকেই মানুষকে জানবার এবং নিজেকে মানুষের কাছে জানাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছি। তাতে দুর্ভোগ বেড়েছে বৈ কমেনি। বন্ধু বিচ্ছেদ হয়েছে, গৃহবিবাদ বেড়েছে, মাঝখান থেকে আমি শুধু একলা হয়ে পড়েছি দিন-দিন।

তা হোক, তাতে আমার দুঃখ নেই। যত একলা হয়েছি ততই নিরপেক্ষ বিচার করতে পেরেছি মানুষকে। মানুষের কাছ থেকে আপাতঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের সঙ্গেই আরো বেশি করে যুক্ত হয়েছি। দর্শনের ভাষায় যাকে বলা যায়—বিয়োগ করে যোগ করেছি।

কিন্তু নারী?

সেখানেই মুশকিলে পড়েছি বরাবর। আজকের নারী আর সে যুগের নারীতে আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। আজ রাস্তায়-বাজারে-অফিসে নারী। নারীর সঙ্গে পুরুষ দিনের পর দিন পাশাপাশি বসে চাকরি করছে। ঘোমটার আড়ালে যে-রহস্য লুকিয়ে থাকতো তা এখন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এখন সহাবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে পারস্পরিক কৌতূহল মিটে গেছে। কিন্তু তবু বলবো, পুরুষ কি নারী কারোরই অভিনয় করা আজো বন্ধ হয়নি। সামনে সবাই আমরা এখনো অভিনয়ই করি। পরের সামনেও অভিনয় করি, নিজের সামনেও। আজ আমাদের জীবনে স্বর আর পর একাকার হয়ে গিয়েছে।

এমনি অভিনয় করতে করতে এখন মানুষের জীবনে অভিনয় প্রায় একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। সব সময় ধরা যায় না কোন্‌টা অভিনয় আর কোন্‌টা স্বভাব। সেই কারণেই স্বভাবটাকেও আমরা অনেক সময় অভিনয় বলে ভুল করি, বা অভিনয়টাকেই স্বভাব।

এমনি দু'জনকে আমি জেনেছি। তারা দু'জনেই অভিনেত্রী নয় বটে; কিন্তু অভিনয় করে-করে অভিনয় করা তাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একজনের নাম রঞ্জনা, আর একজনের নাম ঊষা। দু'জনেই অভিনেত্রী, কিন্তু দুজনের অভিনয় দু'রকম।

এদের সকলকে যে আমি স্বচক্ষে দেখেছি তা নয়, এদের সম্বন্ধে আমি শুনেছি। সেও প্রায় একরকম দেখারই মত। আর তা ছাড়া নিজের চোখে দেখলেই কি সত্যদর্শন হয়? সত্য জিনিসটা দেখবার জিনিসই নয়, আসলে সেটা উপলব্ধির। উপলব্ধির জারক-রসে শোধন করে নিলে তবেই সত্য-স্বরূপ নজরে পড়ে।

প্রথমে নট্‌নীর কাহিনী বলি ঃ

জয়পুর থেকে প্রায় মাইল চল্লিশের মধ্যে কিষেণগড়। কিষেণগড় নানা কারণে বিখ্যাত। ওখানেই রূপনগর নামে একটা গড় আছে। বঙ্কিমচন্দ্র ওই রূপনগরের কাহিনী নিয়েই তাঁর 'রাজসিংহ' উপন্যাস লিখেছিলেন।

সেসব অন্য প্রসঙ্গ।

অন্য প্রসঙ্গ হলেও এ-গল্পে একটা কথা বলা দরকার। কারণ কিষেণগড়ের ডাক্তার সত্যপ্রসন্ন বসুর সঙ্গে দেখা না হলে এই নট্‌নীদের ব্যাপারটা জানতে পারতাম না।

ডাক্তার সত্যপ্রসন্ন বসুর কিষণগড়ের বাড়িটা রাজস্থানের সব বাঙালী যাত্রীর একটা চিরস্থায়ী আস্তানা। নিজে ডাক্তার, কিন্তু বাঙালী

দেখলে একটা রাতের জন্য তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে, থাকতে হবে, খেতে হবে, ঘুমোতে হবে।

আজকালকার এই পরশ্রীকাতরতার যুগে, পরস্পরকে ছোট করবার যুগে, ডাক্তার সত্যপ্রসন্ন বসু একজন ব্যতিক্রম।

একদিন আমিও ওই পথের যাত্রী হয়েছি। অবসর কিংবা সুযোগ পেলেই রাজস্থানে বেড়াতে যাবার লোভ আমার দুর্বার।

তাই প্রথমবার যখন গিয়েছিলাম তখন আজমীর হয়ে আর এদিকে ফিরিনি। সোজা আবু-পাহাড় হয়ে একেবারে ওখা-পোর্ট আর দ্বারকার দিকে চলে গিয়েছি।

কিন্তু উনিশশো বাষট্টি সালে যখন গেলাম, তখন জয়পুরেই থাকবো বলে আস্তানা নিয়েছিলাম।

প্রভাত গুহরায় আমার স্নেহভাজন বন্ধুপ্রতিম। সে জয়পুরের বাসিন্দা। বহু বছর থেকেই সে চিঠি লিখতো—একবার জয়পুরে আসুন। আমি আপনার জন্যে বাড়ি ঠিক করে রাখবো।

সেবার যখন আজমীরে গিয়েছিলাম, তখনও বলেছিল। তারপর বছরের পর বছর চিঠি লিখে চলেছে সে। কিন্তু যাওয়া কি অত সহজ! ঘর ছেড়ে, কাজকর্ম ছেড়ে কে বেরিয়ে পড়তে পারে বাইরে?

রবীন্দ্রনাথের লেখায় আছে—

'জড়ায়ে আছে বাধা
ছাড়ায়ে যেতে চাই।
ছাড়িতে গেলে বুকে বাজে।'

অথচ সেই রবীন্দ্রনাথই আবার বলেছেন—

'দেশে দেশে মোর ঘর আছে
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।'

এই দোটানা নিয়েই তো মানুষের জীবন। এই টানা-পোড়েনের মাকু চালাচ্ছে কোন্ এক অদৃশ্য দেবতা, তারই আকর্ষণ-বিকর্ষণে আমরা

চলি আর নিজের ক্ষমতার দম্ভে পৃথিবী পদভারে কাঁপিয়ে দেবার স্পর্ধা দেখাই।

কিন্তু বুঝতে পারি না যে, সেই অদৃশ্য দেবতা আমাদেরই অগোচরে আমাদের দিয়েই নিজের গোপন ইচ্ছাটা কেবল পূর্ণ করে নেয়। আমরা তা দেখতেও পাই না, জানতেও পারি না।

আজমীরের 'বেঙ্গলী সুইটস'-এর দোকানটা অনেকেই দেখেছেন। সেই দোকানের মিষ্টি অনেকেই খেয়েছেন। সঙ্গে ভাতের হোটেলও আছে।

দোকানের মালিক সদানন্দ ব্যানার্জীকেও নিশ্চয় অনেকে দেখেছেন। তাঁর সঙ্গে কথাও হয়তো বলেছেন অনেকে।

সেই তিনিই সেবার বলেছিলেন—আপনি কিষেণগড়ে যাবেন না?

বললাম—কেন, কিষেণগড়ে কী আছে?

সদানন্দ ব্যানার্জী বলেছিলেন—কেন, কিষেণগড়ে ডাক্তার সত্য বোস আছে—

তা তখন হাতে সময় ছিল না বলে আর কিষেণগড়ের দিকে ফিরে আসিনি। সোজা চলে গিয়েছি মাউন্ট আবুর দিকে।

কিন্তু এবার অন্য প্রোগ্রাম করেছিলাম। জয়পুরে পুজোটা কাটিয়ে তারপর কিষেণগড় হয়ে চিতোর আর উদয়পুরের দিকে যাওয়ার কথা। মাঝখানে পড়ে কিষেণগড়।

আগে থেকেই খবর দেওয়া ছিল। যখন গিয়ে পৌছুলাম তখন দেখি একেবারে রাজসূয় ব্যাপার। খাট-বিছানা খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত সরঞ্জাম মজুত।

ডাক্তারবাবু বললেন—এখানে থেকে যেতে হবে ক'দিন—

তথাস্তু!

তা ছাড়া এতখানি খাতির পেলে ভালো লাগারই কথা। জীবনে ভালোবাসার চেয়ে দামি জিনিস তো দুটি নেই। ওটা অনেক সৌভাগ্য থাকলে তবে পাওয়া যায়।

থেকে গেলাম কিষেণগড়ে। ক'দিন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে খুব ঘোরা-ঘুরি করলাম। ডাক্তারবাবু কিষেণগড়ের সবেধন-নীলমণি। কুড়ি মাইল—পঁচিশ মাইল দূর দূর গ্রাম থেকে তাঁর কল্ আসে। সঙ্গে আমি থাকি। রাজস্থানের গ্রামের ভেতরটা দেখা হয়ে যায়।

একদিন হঠাৎ বললেন ওই দেখুন, ওই একটা নট্‌নীদের গ্রাম—

—নট্‌নী!

কথাটা কেমন নতুন ঠেকলো। নট্‌নী মানে?

ডাক্তারবাবু বুঝিয়ে দিলেন। নট্‌নীদের পেশাই হচ্ছে নাচ-গান। ওদের পয়সা দিলে নাকি আমার-আপনার বাড়িতে নেচে গেয়ে যাবে। কারো বাড়িতে বিয়ে সাদি হলে ওরা আসে। নেচে-গেয়ে যায়, খানা খায়। তারপর চাষ-বাস আছে। তারপর যারা তাও পারে না, অর্থাৎ যারা দেখতে তেমন ভালো নয়, তাদের আবার অন্য বৃত্তি আছে।

—কী বৃত্তি?

ডাক্তারবাবু বললেন—শরীর বেচার ব্যবসা।

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—কিন্তু এখানে ওদের খদ্দের কোথায়? এখানে কে ওদের খোরাক জোগাবে?

ডাক্তারবাবু বললেন—ওদের খোরাক জোগাবার লোকের অভাব হয় না কোথাও, সে গ্রামেই বলুন আর শহরে বলুন। মানুষের ওল্‌ডেস্ট প্রোফেসান্ ওইটেই—

তা বটে! রাজস্থানের ছোট ছোট গ্রামের মতই নট্‌নীদের গ্রাম। কোনও তফাত নেই। গ্রামের বাইরে চারদিকে ক্ষেত আর মাঠ। ক্ষেত-ভর্তি গম আর জোয়ার। হলদে সবুজ মাঠ। দূরে ধূ ধূ করছে পাহাড়। আর তারই মধ্যে মধ্যে গ্রাম।

বললাম—ওদেরও তো অসুখ হয়, ওখান থেকেও তো আপনার কল্ আসে—

ডাক্তারবাবু বললেন—কেন আসবে না, আসে। ওরা বেশ ভালো টাকাই দেয়। ওদের অবস্থাও বেশ ভালো।

—পুরুষমানুষরা কী করে?

তারা ঢোলক বাজায়, নট্‌নীদের তদারকি করে। যেখানে নট্‌নীদের মুজরো আসে, ওরা সেখানে ওদের সঙ্গে যায়। গান গায়। তাছাড়া নানারকম বদমাইস লোক তো আছে। রাজস্থান তো বলতে গেলে ডাকাতদের দেশ। এখানে ডাকাতি অনেকের পেশা। মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের যেতে হয়। তা সত্ত্বেও কত খুন-খারাবি হয়ে গেছে, তার ঠিক আছে—

গাড়ি চালাতে চালাতে ডাক্তারবাবু গল্প বলছিলেন।

একটু থেমে বললেন—এবার যেদিন ও-গ্রামে কল্ আসবে, আপনাকে নিয়ে যাবো, অনেক প্লট পাবেন—

বললাম—প্লটের জন্যে নয়, নতুন ধরনের মানুষ দেখতেই আমার ভালো লাগে—

ডাক্তারবাবু বললেন—কেন, তা যদি বলেন, আমার ডাক্তারখানাতেই তো ওরা আসে—

—কই, আমি তো দেখিনি।

ডাক্তারবাবু বললেন—ঠিক আছে, এবার এলে আমি আপনাকে দেখাবো—

তারপর আবার বললেন—ওই নট্‌নীদের আপনি রাজস্থানের সব জায়গায় দেখতে পাবেন—জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, মেবার চিতোরগড়। কিন্তু উদয়পুরে কোনো নট্‌নী নেই।

কেন ?

আমি অবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে।

ডাক্তারবাবু বললে—সে একটা বড় ট্রাজিক গল্প আছে। আচ্ছা আপনি আগে উদয়পুর থেকে ফিরে আসুন না, আপনাকে বলবো—

আমার যেন কৌতূহল আরও বেড়ে গেল।

বললাম—আপনি এখনই বলুন না, আমার বড় শুনতে ইচ্ছে করছে—

—না, আগে আপনি ঘুরে আসুন, তারপর বলবো—

এর পর উদয়পুর চলে গিয়েছিলাম চিতোরগড় হয়ে। উদয়-সাগর দেখতে গিয়ে গাইডরা এসে ছেঁকে ধরলো।

একটু সুবিধে-সুযোগ পেয়েই নানা রকম কথা তাদের জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। কোথায় নাথদ্বার, কোথায় বৃন্দাবন-প্রাসাদ। এক-একটা করে সব জেনে নিয়ে একান্তে জিজ্ঞেস করলাম—তোমাদের এখানে নট্‌নী নেই?

গাইড বললে—না হুজুর উদয়পুরে নট্‌নী নেই—

—কেন, নেই কেন?

তা জানি না হুজুর। আর সব জায়গায় আছে, আমাদের উদয়পুরে নেই।

শুধু একজনকে নয়, সব গাইডকেই ডেকে ডেকে পয়সা দিয়ে আলাপ করে চা খাইয়ে গল্প করলাম। যদি গল্পের মধ্যে কোনও হদিস পাই। গাইডদের ডেকে এনে নিজের খরচে হোটেলে খাইয়ে-দাইয়েও কোন সুলুক-সন্ধান পেলাম না। সবারই ওই এক কথা! উদয়পুরে কেন নট্‌নী নেই, তা কেউ জানে না।

শেষকালে একদিন সবকিছু জেনে এসে আবার ফিরে এলাম কিষেণগড়ে।

ডাক্তারবাবু তখন রোজকার মত ডাক্তারখানায় বসে ডাক্তারি করছেন। ওপাশে কম্পাউণ্ডার নিতাইবাবু ওষুধ তৈরী করছে একমনে।

আর ঠিক ডাক্তারবাবুর সামনে একজন ওই-দেশী মহিলা বসে আছেন।

মহিলাকে দেখে আমি সোজা ভেতরের অন্দরমহলের দিকে যাচ্ছিলাম।

ডাক্তারবাবু কাজ করতে করতেই ডাকলেন।

বললেন—বসুন বিমলবাবু, এখানেই বসুন—

অগত্যা সঙ্কোচ ত্যাগ করে পাশের একটা চেয়ারের ওপর গিয়ে বসলাম।

ততক্ষণে ডাক্তারবাবু মেয়েটিকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন—মদ খাওয়া একটু কমিয়ে দিতে হবে তোমাকে, বুঝলে?

মেয়েটি হাসলো। রাজস্থানী পোষাক-পরা চেহারা। উজ্জ্বল স্বাস্থ্য। হাসলে আবার গালে টোল্ পড়ে। বাঁ-দিকের একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। বয়সের তেজ যেন ঘাগরা-ওড়নার ফাঁক দিয়ে কেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

মেয়েটি বললে—না ডাগ্দারবাবু, আমি সরাব কমিয়ে দিয়েছি—

ডাক্তারবাবু আবার বল[illegible] রাতে ভালো করে ঘুমোতে হবে ঘুম কম হচ্ছে—

—না ডাগ্দারবাবু আমি তো ঘুমোই। পেট ভরে ঘুমোই। ভোর চারটেয় নিদ্ যাই, আর বেলা বারোটায় উঠি। পুরো আট ঘণ্টা নিদ্ যাই—

ডাক্তারবাবু বললেন—না, ওরকম ঘুম নয়, রাত দশটায় বিছানায় যেতে হবে, আর ভোর ছ'টায় উঠবে। তোমার শরীরে একদম খুন্ নেই। এই দাওয়াই দিচ্ছি, এই দাওয়াই খেলে দরদ-টরদ সব চলে যাবে।

—আর কাসি?

—কাসিও চলে যাবে। আমার কথা শুনে চললে সব ঠিক হয়ে যাবে, কোন ভাবনা নেই।

মেয়েটি এবার উঠলো, ওষুধ নিলে কম্পাউণ্ডারের কাছ থেকে।

টাকা দিলে গুণে গুণে। তারপর চলে যাবার সময় ওড়নাটা ভালো করে ঢেকে দিয়ে ডাক্তারবাবুকে নমস্কার করে বিদায় নিলে।

রাস্তার বাইরে একটা বয়েল-গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সেখানে একটা বুড়ি মতন কে বসেছিল ভেতরে। মেয়েটা লাফাতে লাফাতে গিয়ে তার উপর উঠে বসলো।

ডাক্তারবাবু এবার আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন—কিছু বুঝলেন?

বললাম —না—

—সে কী, আপনাকে বোঝাবার জন্যেই তো এখানে বসতে বললাম। এই-ই হলো নট্‌নী।

আমি আর-একবার নট্‌নীকে ভালো করে দেখবার জন্য রাস্তার দিকে চাইলাম। কিন্তু তখন নট্‌নীকে নিয়ে বয়েল-গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ডাক্তারবাবু বললেন—আমার পেসেন্ট ওরা। এই কিষেণগড়ে অনেক নট্‌নী আছে। সেবার তো ওদের গ্রাম দেখিয়েছিলাম আপনাকে। তবে এরা শহরের নট্‌নী। তাই ওদের অবস্থা একটু ভালো। এদের পেছনে বড় বড় রেইস্ আদমি আছে। তারাই এদের খোরাক জোগায়—

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন—উদয়পুরে গিয়ে কী দেখলেন?

বললাম—টুরিস্ট-গাইডে যা-যা লেখা আছে তাই-ই দেখলাম—

—আর নট্‌নী?

বললাম—না। অনেক চেষ্টা করেছি দেখতে। অনেক গাইডকে হোটেলে এনে খাইয়েছি, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলে না—

ডাক্তারবাবু বললেন—তবে শুনুন—

গল্প আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন ডাক্তারবাবু, এমন সময় আরো কয়েকজন রোগী এসে পড়লো। আর বলা হলো না।

বললেন—রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর।

কিষেণগড় জায়গাটা পুরোনো। সুগার-মিল আছে। সিনেমা-হাউস আছে। বড় একটা বিজনেস-সেণ্টার। জয়পুর আর আজমীরের মধ্যে যাতায়াত করবার পথে একটা বড় শহর। সারারাত লরীগুলো মাল নিয়ে যাতায়াত করে।

একেবারে বাজরের ওপর ডাক্তার সত্যপ্রসন্ন বসুর বাড়ি। উত্তর দিকে আবার একটা বিরাট কটন্ মিলের ফ্যাক্টরি কনস্ট্রাক্শন চলছে।

ডাক্তারবাবু বললেন—এ রাজস্থান আর সেই আগেকার রাজস্থান নেই। তাড়াতাড়ি সব বদলে যাচ্ছে। আমি যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম তখন মাংসের সের ছিল দু'আনা একআনা। এখন দু'টাকা কিলো।

পুরোনো দিনের গল্প চলছিল ডাক্তারখানার বাইরে ইজিচেয়ারে বসে। সামনে দিয়ে এক-একটা লরী যাচ্ছে আর গুম্ গুম্ করে কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে।

তারপর আছে সামনেই রেলওয়ে স্টেশন। কিষেণগড় স্টেশনের প্লাটফরমের ওপরে দাড়িয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিলে হয়তো ডাক্তারবাবুর বাড়িটাও দেখা যায়।

কিন্তু তখন রাত হয়ে গেছে অনেক। তাই শব্দের আর গোলমালের তীক্ষ্ণতা কম। সামনের স্টোভ সারানোর দোকানের মালিক ঝাঁপ বন্ধ করে বিঁড়ি টানতে টানতে শেষবারের মত নিজের বাড়ি চলে গেল। একটা টাঙ্গাওয়ালা স্যোয়ারী পায়নি বলে অনেকক্ষণ বাস-স্ট্যাণ্ডেই ঘোরাঘুরি করে শেষকালে ক্লান্ত হয়ে আস্তাবলের দিকে গাড়িখানাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললো।

ডাক্তারবাবু গল্প বলতে লাগলেন ডাক্তারখানার সামনে বসে।

আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো উদয়পুর, উদয়সাগর, বৃন্দাবন প্যালেস, রাণা স্বরূপ সিং আর এক নট্‌নী।

নাথদোয়ারের মঙ্গল সিংএর মেয়ে রঙনা।

ডাক্তারবাবু বললেন—সকালবেলা ওই যে মেয়েটাকে দেখালাম, ওর নামও রঙনা—কিন্তু ওরা জানে না—

বললাম- -কী জানে না?

—এই যে গল্প আপনাকে বলছি। অনেক রেইস্‌ বাবু আছে ওদের। অনেক মাল্‌টি-মিলিওনার বাবু। তারা ওদের নিয়ে এখন ফুর্তি করে, ওদের পেছনে টাকা খরচ করে। যার ভাগ্য ভালো তারা বাবুদের কাছ থেকে গাড়ি পায়, বাড়ি পায়। কেউ কেউ বাইরে বেড়াতে যায়। কেউ বা লণ্ডনে, কেউ আমেরিকায়। তুনিয়ার সারা দেশে ওরা যেতে রাজী। কিন্তু উদয়পুরে ওরা যাবে না। যদি উদয়পুরে প্যালেস-হোটেলের এয়ার কণ্ডিশন্‌ ঘরেও নিয়ে যাবার লোভ ওদের কেউ দেখায় তবু ওরা উদয়পুরে যাবে না। এমনি ওদের সংস্কার।

তারপর একটু থেমে বললেন—আপনি উদয়পুর থেকেই তো এলেন। কিন্তু সেখানেও দেখে এলেন এ-গল্পটা কেউ জানে না। জানবে কী করে? তারা কি নট্‌নী দেখেছে আমার মত? তারা কি আমার মত ওদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশেছে? ওদের বাড়িতে গিয়ে শুয়েছে অনেকেই, ওদের বাড়িতে গিয়ে খেয়েছেও অনেকে। কিন্তু আমার মত চোখ দিয়ে কেউ তো ওদের দেখেনি—

তা সত্যি! ডাক্তারবাবুর চোখ ছিল।

যখন এক-একটা কাহিনী বলতেন, রাজস্থানের এক-একটা ইতিহাস বলতেন, তখন মনে হতো উনি যেন বাঙালী নন, খাস রাজস্থানী।

—ইণ্ডিয়ার অন্য স্টেটের সঙ্গে এই রাজস্থানের কোনও তুলনা করবেন না আপনি। এই রাজস্থান এখনও একটা মিউজিয়াম হয়ে আছে। হয়তো ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে আর এরকম থাকবে না। কিন্তু তবু যেটুকু জানি আপনাদের বলে যাই। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ

একে নিয়ে লেখেন। এর মানুষরা অন্য জাতের থেকে আলাদা। এর মাটিটা পর্যন্ত অন্য রকম। এর খনিতে যা পাওয়া যায় তা অন্য স্টেটের মাটিতে পাওয়া যায় না—

বলতে বলতে আসল গল্পের খেই হারিয়ে ফেললেন ডাক্তারবাবু।

আমি বললাম—তারপর রঙনার কী হলো ?

—রঙনা ?

মনে পড়ে গেল যেন এতক্ষণে।

বললেন—হ্যাঁ, রঙনার কথাই বলি। নাথদোয়ারের মঙ্গল সিং-এর মেয়ে। মঙ্গল সিংও নাচতো, গাইতো। নাথদোয়ারের মন্দিরে শিব-চতুর্দশীর রাত্রে নাচতেই হয়। ওটা নিয়ম। শিব-চতুর্দশীর রাত্রে উদয়পুরে যত নট্নী আছে সকলকে নাচতে হবে। ওর ছোটবেলা থেকেই নাচতে শেখে। নাচই ওদের নেশা, নাচই পেশা।

আর নাচই কি এক-রকমের ?

ডাক্তারবাবু বললেন—আমি যখন প্রথম এদেশে আসি, তখন দেখেছি ওসব। এই কিষেণগড়ে প্রথমে সুগার-মিলে ডাক্তারের চাকরি নিয়ে আসি। ডাক্তারমানুষ বলে আমাকে বেশ খাতির করতো সবাই। নট্নীরাও খাতির করতো। শিবপূজোর প্রসাদ পাঠিয়ে দিত বাড়িতে। ওদের বাড়িতে যা-কিছু উৎসব হলে যাওয়া আমার চাই-ই চাই। নইলে ওরা রাগ করতো।

আর সে কী নাচ, আপনাকে কী বলবো ! রাজপুতদের লাঠি দেখেছেন তো ? ওই লাঠি একজন উঁচু করে ধরতো, আর তারই ডগার ওপর একজন নট্নী ব্যালেন্স রেখে নাচতো। ঘুরে ঘুরে নাচ।

আমি গল্প শুনছিলাম।

বললাম—পড়ে যেত না ?

ডাক্তারবাবু বললেন—আমি কখনো পড়ে যেতে দেখিনি। তবে শুনেছি নাকি দু-একবার এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। আমার ডাক্তারখানায় তাকে নিয়ে এসেছে। তারপর হাতে-পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে মলম লাগিয়ে

তাদের সারিয়ে তুলিয়েছি। ওরা আমাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। ওরাই আমাকে এই গল্পটা বলেছে-- রঙনার গল্পটা তাই ওদের সকলের মুখে মুখে—

রাণা স্বরূপ সিংএর আমল তখন। এই রাজস্থানের সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে স্বরূপ সিংএর নামও যেমন, প্রতিপত্তিও তেমনি।

রঙনার তখন বেশ বয়েস হয়েছে।

পাড়ার অন্য মেয়েরা তাকে দেখে হিংসে করে।

বলে—বে-সরম—

বে-সরম বললো তো বললো। তাতে রঙনার বয়েই গেল। তোমার তো আমি খাইও না, পরিও না। তুমি আমার মত নাচো তোমারও খাতির হবে, তোমারও পয়সা হবে। ইণ্ডিয়ার সব জায়গা থেকে তখন তীর্থযাত্রীরা আসে নাথদোয়ারে পূজো দিতে। তখন এখনকার মত ট্রেনও ছিল না, বাসও ছিল না, প্লেন তো দূরের কথা। সেই তীর্থযাত্রীরা এসে পাণ্ডাদের বাড়িতে উঠতো, মন্দিরে পূজো দিত।

কিন্তু রঙনাকে নজরে পড়ে গেলেই জিজ্ঞেস করতো—ও কে? কাদের মেয়ে?

পাণ্ডারা বলতো—ও রঙনা, নট্‌নীর মেয়ে নট্‌নী—

—নট্‌নী কী?

পাণ্ডারা বলতো—যারা নাচা-গানা করে, তাদেরই নট্‌নী বলে হুজুর!

—কী-রকম নাচা-গানা করে?

—খুব ভালো হুজুর।

—ওর নাচ দেখাতে পারেন?

—খুব পারি হুজুর। নাচা-গানাই তো ওর পেশা।

—তাহলে লাগান একদিন, নাচ দেখি।

তা তার ব্যবস্থা করতে অসুবিধে হয় না। হয়তো সিন্ধ থেকে বড় শেঠজী এসেছে। অনেক টাকার মালিক। সঙ্গে টাকার পাহাড়

এনেছে। টাকা খরচ করবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে। কত টাকা নেবে নাও, কিন্তু সবচেয়ে যা ভালো নাচ আছে তাই দেখাতে হবে।

—হুজুর ওরা লাঠির ওপর নাচতে পারে, দড়ির ওপরও নাচতে পারে।

দড়ির ওপর কি রকম নাচ ?

—দুটো লম্বা লাঠির ওপর মাথায়-মাথায় দড়ি বাঁধা, তার ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে হেঁটে যাবে।

—তা তাই-ই দেখবো। লাগাও নাচ।

নাথদোয়ারের নট্‌নীপাড়া থেকে দলবল এসে হাজির হয় পাণ্ডাদের বাড়ির সামনের উঠোনে। ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্ করে ঢোল বাজতে শুরু হয়, আর শুরু হয় নাচ। রঙনা নতুন নট্‌নী। আর সব নট্‌নীকে সে নেচে কুপোকাৎ করে দেয়। জোয়ান মেয়ে। যেমন গড়ন তার, তেমনি তেজ। অন্য নট্‌নীরা তার সঙ্গে পারবে কেন ?

শেঠজী বলে—কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—

আসর খতম হলে নট্‌নীরা এসে শেঠজীর সামনে মাথা নিচু করে সেলাম করে। মাথার বেণীটা ঝুলে পড়ে সামনের দিকে।

শেঠজী একমুঠো মোহর সামনে এগিয়ে দেয়।

বলে—তোমার নাম কি নট্‌নী ?

পাশ থেকে রঙনার বাপ বলে—রঙনা—

রঙনা! বেশ নামটা। শেঠজী মনে মনে উচ্চারণ করে। তারপর রঙনার গড়নটার দিকে চেয়ে দেখে। বোধহয় ভেতরে ভেতরে লোভ হয়। তারপর যখন অনেক পরে সবাই চলে যায়, পাণ্ডাজীকে আড়ালে ডেকে বলে—পাণ্ডাজী, নট্‌নীর বাড়ি কোথায় ?

পাণ্ডাজী বলে—হুজুর, ওদের মহল্লা আছে নাথদোয়ারে, সেই মহল্লায় থাকে—

—এখানে ডাকলে আসবে না ?

পাণ্ডা বলে—কেন আসবে না হুজুর, ওদের তো ও-ই পেশা। হুজুর যতবার ডাকবেন ততবার আসবে। দলবল নিয়ে এসে গেয়ে যাবে, নেচে যাবে।

শেঠজী বলে—না, সে-রকম নয়। দলবল নিয়ে নয়। একলা লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে বললে আসবে?

পাণ্ডা বুঝতে পারে।

বুঝতে পেরে চমকে ওঠে।

বলে—না হুজুর, ওরা বড় জাঁদরেল জাত। রাজপুতদের সঙ্গে ওই নট্‌নীদের মেলে না। ওরা যেমন নাচতে গাইতে পারে, তেমনি আবার ছোরা চালাতে পারে। নট্‌নীদের দিকে কেউ নজর দিলে ওরা তার জান্ নিতে কসুর করবে না—

শেঠজী: সিন্ধী মানুষ। অগাধ টাকার মালিক। টাকা আছে বটে কিন্তু তা বলে প্রাণের ভয় কিছু কম নেই। ঠাকুর-দেবতা দেখে পূজো-টুজো সেরে দেশে ফিরে যায় ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে।

এই রকম করে নট্‌নীদের খবর দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সিন্ধ থেকে মহারাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র থেকে ত্রৈলঙ্গ দেশেও খবরটা চালাচালি করে।

সব জায়গার লোক বলে—নট্‌নী দেখেছিস? নট্‌নী?

কেউ কেউ বলে—না।

—যা, তাহলে রাজস্থানে যা, গিয়ে দেখে আয়। আর নট্‌নীর সেরা নট্‌নী নাথদোয়ারের রওনা।

তারপর থেকে যেই বর্ষাকালটা কাটলো আর দলে-দলে তীর্থযাত্রী আসতে লাগলো উদয়পুরের নাথদোয়ারে। শেঠদের কল্যাণে নাথদোয়ারের ঠাকুরের গায়ে সোনার গয়না উঠলো। নাথদোয়ারের সেবাইতদের সিন্দুকে মোহরের পাহাড় জমে উঠলো। বড় বড় সোনার ঘড়ার ভেতর সোনার মোহর জমে উপছে পড়তে লাগলো।

আসলে কিন্তু ঠাকুর-দেবতা সব বাজে কথা। আসল টান হলো ওই নট্‌নীর।

রঙনার জন্যেই নাথদোয়ারে এত লোক আসে। রঙনার জন্যেই এত ভিড় হয় নাথদোয়ারে।

রঙনাই যেন নাথদোয়ারের ঠাকুর।

কিন্তু খবরদার, খুব সাবধান। ওদিকে নজর দিয়ো না তোমরা। নট্‌নীরা বড় সর্বনেশে মানুষ। ওরা গান গাইতে নাচতেও যেমন, আবার তোমাকে খুন করে ফেলতেও তেমনি!

মহেশ্বরপ্রসাদ এককালে গরীব ছিল। মহেশ্বরপ্রসাদের মার যখন বয়েস কম ছিল তখন তার নাচের সঙ্গে মহেশ্বরপ্রসাদ ঢোল বাজিয়েছে। আর যখনই অবসর পেয়েছে তখনই নট্‌নীপাড়ার মেয়েদের নাচ শিখিয়েছে। নট্‌নীদের নাচ বড় জবর নাচ। যে-সে শিখতে পারে না। মেয়ে যখন জন্মালো তখন বুড়োরা এসে তার মুখ দেখে না, পা দেখে। হাত দিয়ে পায়ের গড়ন পরীক্ষা করে। ছোটবেলা থেকে সেই পায়ের যত্ন হয়। ওদের জুতো পরিয়ে দেয়। চামারদের কাছ থেকে পায়ের মাপ দিয়ে সে জুতো তৈরী করিয়ে আনে। তারপর আছে মালিশ। কী-সব একরকম গাছ-গাছড়া আছে, তারই রস গরম করে পায়ে মালিশ করা হয় রোজ।

বললাম— কী গাছের রস?

ডাক্তারবাবু বললেন—সে-গাছের নাম ওরা কাউকেই শেখায় না।

—তা তারপর?,

—তারপর যখন দু'বছর বয়েস হবে মেয়ের, তখন খুব ঘটা করে উৎসব হবে। মানে আমাদের যেমন লেখাপড়ার হাতে-খড়ি হয়, ওদেরও তেমনি। আমাদের মধ্যে বামুনদের যেমন পৈতে হয়, ঠিক সেই রকম আর-কি! তারপর মহেশ্বরপ্রসাদ সেই মেয়েকে নিয়ে পড়বে।

মহেশ্বরপ্রসাদ ঢোলে বোল্ তুলবে—

তা ধিন্ ধিন্ তাক্—
তাক্ ধিন্ ধিন্ তা
ত্রেকেটে তাক্ ত্রেকেটে তাক্
ধিন্ তাক্ ধিন্ তাক্
ধিন্ ত্রেকেটে তাক্···

ঢোল বাজায় মহেশ্বরপ্রসাদ আর জোরে মুখে মুখে বোল্ বলে। দরকার হলে নেচেও দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু নটনী সেই তালে তালে নাচে।

দু'বছরের মেয়ে রঙনা সেই তখন থেকেই ওস্তাদ। একবার একটা বোল্ তুলে দিলে আর ভোলে না।

মহেশ্বরপ্রসাদ নিজেই রঙনার কেরামতি দেখে অবাক হয়ে যায়।

বলে—কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—

সেই মেয়ে বড় হলো। বড় যত্নে বড় হলো রঙনা। মহেশ্বরপ্রসাদ নট্নীপাড়ার নামকরা বাজিয়ে। গান শিখিয়ে, নাচ শিখিয়ে বুড়ো হয়ে গেছে তখন। পাড়ার দশজন ভয়-ভক্তি করে। মানে।

বলে—গুরুজীর নসীবটা ভালো। মেয়ে গুরুজীর সুখ আনবে—

তা সুখই হলো শেষ পর্যন্ত মহেশ্বরপ্রসাদের। নাথদোয়ারে সবাই রঙনার নাম করে। নাথদোয়ার ছাড়িয়ে উদয়পুরেও নাম ছড়িয়ে গেল। শেষকালে উদয়পুর থেকে যোধপুর, বিকানীর, জয়পুর, কিষেণ-গড়, যব জায়গাতেই রঙনার নাম।

—কে রঙনা?

—ওরে, রঙনা সেই গুরুজী মহেশ্বরপ্রসাদের মেয়ে।

মেয়ের সঙ্গে বাপেরও নাম ছড়িয়ে গেল রাজস্থানে। রাজস্থান থেকে বাংলা মুলুক। বাংলা মুলুক থেকে বিহার, মধ্যপ্রদেশ দাক্ষিণাত্য। আর যেখানেই তীর্থ করতে যাও, রাজস্থানের পুষ্কর তীর্থ দেখতে যেতেই হবে। আর পুষ্কর দেখলে নাথদোয়ার আর কতদূর?

নাথদোয়ারে গিয়ে শিবের প্রসাদ পেতেই হবে। শিব তো সকলেরই দেবতা। নামেরই যা ফারাক। কেউ ডাকে ভোলা-মহেশ্বর বলে। কেউ ডাকে ত্রিলোকনাথ বলে। আবার কেউ ডাকে একলিঙ্গেশ্বর বলে। আসলে সবই এক, একই সব।

ডাক্তারবাবু বললেন—একদিন স্বরূপ সিংএর কাছে খবরটা গেল।

স্বরূপ সিং হলো উদয়পুরেশ্বর। শিব যেমন ভুবনেশ্বর, স্বরূপ সিং তেমনি উদয়পুরেশ্বর।

বড় খেয়ালী রাজা।

তখন বৃন্দাবন-প্রাসাদ তৈরি হয়ে গেছে। চারদিকে উদয়সাগর। উদয়সাগরের জল একবার যদি খাও তো তোমার স্বাস্থ্য ফিরে যাবে। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত উদয়সাগর ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়েও আছে, জড়িয়েও আছে। বড় বড় পাহাড়ের ওপর উদয়পুরের কেল্লা, সেখানে উঠতে গেলে পা ব্যথা হয়ে যাবার জোগাড়। তারপর একবার পাহাড়ের ওপর উঠতে পারলে আর ভাবনা নেই। তখন উদয়সাগরের হাওয়া তোমার দেহ-মন জুড়িয়ে দেবে।

সেই উদয়সাগরের ভেতরে বৃন্দাবন-প্রাসাদ। বড় যত্ন করে সে-প্রাসাদ সাজিয়েছেন স্বরূপ সিং। সেইখানে বসে স্বরূপ সিং। সেইখানে বসে-বসেই স্বরূপ সিং বড় বড় ওস্তাদের গান শোনেন। জলের স্রোতের ওপর গানের সুর ভেসে গিয়ে দূরের পাহাড়ের গায়ে আছাড় খায়।

গান শুনতে শুনতে স্বরূপ সিং বলে—কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—

শুধু স্বরূপ সিং একলা নয়। সঙ্গে মন্ত্রী থাকে, মোসায়েব থাকে, পাত্র-মিত্র-সভাসদ সবাই তালে তাল দেয়। তারাও সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে—কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—

রাণা স্বরূপ সিং যদি গান শুনে ভালো বলে তো আশেপাশের পাত্র-মিত্র-মন্ত্রী-পরিষদ সবাইকে তা ভালো বলতে হবে। রাণার যদি কোনও দিন গান শুনতে ভালো না লাগে তো কারোরই শুনতে ভালো লাগবে না।

রাণা স্বরূপ সিং যদি বলেন—আজ দিনটা তো ভালো নয় জগমন্ত্ সিং—

জগমন্ত্ সিং খাস মন্ত্রী। তিনিও বলবেন—না মহারাণা, আজকে দিনটা ভালো নয়।

একবার বাইরে থেকে এক ভাট এসেছিল। নাম—ভাট তিলকচাঁদ। ভাট আগেও অনেক এসেছে উদয়পুরে। রাণার নিজস্ব মাইনে-করা ভাটও আছে। কিন্তু অনেকে বললে—এ ভাটটা নাকি ভালো গান করে—

রাণা বললেন—জগমন্ত্ সিং যদি বলে এ ভালো ভাট তাহলে আসুক, গান গাক্—

জগমন্ত্ সিং আসতেই স্বরূপ সিং জিজ্ঞেস করলেন—নতুন ভাট কেমন গান গায় জগমন্ত্ সিং?

জগমন্ত্ সিং বললে—খুব ভালো মহারাণা, বড় ভালো গান গাইছে আজকাল—

রাণা বললেন—তাহলে আনো তাকে—

যে-লোক ভাটকে আনতে গেল, সে বললে—এখন আমার সময় নেই, আগে যোধপুরে রাণাকে গান শুনিয়ে আসবো, তারপর উদয়পুরের রাণাকে গান শোনাবো।

যে-লোক ডাকতে গিয়েছিল সে বললে—কেন? যোধপুরের রাণা কি উদয়পুরের রাণার চেয়ে বড় যে তার কাছে আগে যাবে?

ভাট বললে—আজ্ঞে হুজুর, যোধপুরের রাণার কাছ থেকে যে আগে বায়না নিয়েছি—

খবরটা স্বরূপ সিংএর কাছে পৌছুতেই একেবারে আগুন হয়ে গেলেন।

—কী, এত বড় সাহস ভাটের! ডাকো ভাটকে এখানে। উদয়পুরের চেয়ে যোধপুর বড় হলো?

তখুনি জগমন্ত্ সিংএর কাছে তলব গেল।

মন্ত্রী জগমন্ত্ সিং স্বরূপ সিংএর মেজাজ চিনতো। বুঝতে পারলে ভাটের এবার সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। ভাটের যোধপুর যাওয়া ঘুচে গেল চিরকালের মত।

স্বরূপ সিংএর কাছে আসতেই জগমন্ত্ সিংএর ওপর হুকুম হলো—ডাকো ভাটকে এখানে। এনে বাঘের মুখে ফেলে দাও

তা তাই-ই হলো।

কেউ জানলো না—কেন ভাট তিলকচাঁদ যোধপুরে যেতে পারলে না। কেউ বুঝতে পারলে না ভাট তিলকচাঁদের গান আর কেউ শুনতে পায় না কেন?

ভাট তিলকচাঁদের নাম রাজস্থানের ইতিহাস থেকে মুছে দিলেন মহারাণা স্বরূপ সিং।

মহারাণা স্বরূপ সিং এমনি মানুষ।

যারা নাথদোয়ারে থাকে তারা মহারাণার এসব কাহিনী শুনেছে। শুনেছে উদয়পুরের মহারাণা খামখেয়ালী লোক। শুনেছে মহারাণা যার ওপর সদয় হবেন, তাকে হয়তো একেবারে জায়গীর দিয়ে দেবে। কিন্তু যার উপর রাগ হবে, তার চরম সর্বনাশ করে তবে তাকে ছাড়বেন।

নট্‌নীরা অনেকবার গেছে স্বরূপ সিংএর দরবারে। স্বরূপ সিং বড় দিল্‌দার লোক বড় দরদী লোক। জহুরী গুণীর গুণের কদর আছে স্বরূপ সিংএর কাছে। নট্‌নীরা গিয়ে নাচে গায় আর মোটা ইনাম নিয়ে আসে।

আহেরিয়ার দিন দরবারে মজলিস বসে।

স্বরূপ সিংএর দরবারে আহেরিয়ার দিনে শুধু নটনীরা শুধু আসে না আসে শেঠজীরা। উদয়পুরের বড় বড় শেঠজী সব। লাখ-লাখ টাকার কারবার তাদের। তারা এদেশ থেকে ওদেশে মাল চালান দেয়। মালের মহাজনও বটে তারা। ওদিকে বাংলাদেশ, ওদিকে দাক্ষিণাত্য, আবার ওদিকে মহারাষ্ট্র গুজরাট। তাদের কারবারের জাল গোটানো

সারা হিন্দুস্থানে! মাল চালানি আমদানি রপ্তানি চলে। তারাও বহু টাকার মালিক। তাদেরও মোহর আছে, সোনা আছে, হীরে আছে। নোকর-চাকর-বাঁদী সবই আছে। তাদেরও হাজার-হাজার লোক আছে খেদমদ্ করবার জন্যে।

কিন্তু স্বরূপ সিংএর সামনে এসেই জুজু।

সেই পাহাড়ের নীচু থেকে ওপর প্যালেসে ওঠবার সময় পায়ের জুতো-জোড়া হাতে তুলে নেয়। স্বরূপ সিংএর সামনে জুতো পরাই নিষিদ্ধ। জুতো যদি কেউ পরতে চায় তো নিচেয় পরুক, ওই যেখানে তালাও আছে, যেখানে ধোবিঘাটে ধোপারা কাপড় কাচে; যেখানে চাষারা ক্ষেতে লাঙল দেয়, যেখানে বাজারে আনাজ-তরকারি বিক্রি হয়, ওখানে জুতো পরে মশ-মশ করে হাঁটুক। কিন্তু এখানে নয়। এই পাহাড়ের তলা থেকে, যেখান থেকে এই প্যালেসটা উঠেছে ওইখান থেকে জুতো খুলে হাতে করে এসো। এসে আমার সামনে নিচু হয়ে কুর্নিশ করে দাঁড়াও। তারপর আমি বসতে বললে বসবে. কথা বলতে বললে কথা বলবে।

তারপর তুমি বসবে আর আমি হাসলে হাসবে, আমি গম্ভীর হলে গম্ভীর হবে।

কিন্তু রাগ?

রাগের কথা শুনবে?

সে-রাগের ঘটনাও আছে স্বরূপ সিংএর জীবনে।

মন্ত্রী জগমন্তু সে ঘটনাও জানে। স্বরূপ সিং একদিন সন্ধ্যেবেলা শিবপূজো সেরে সিঁড়ি দিয়ে দরবারের দিকে আসছেন। হঠাৎ কানে গেল গানা-বাজনার শব্দ!

কোথায় গানা-বাজা হচ্ছে?

ডাকলেন জগমন্তুকে।

—কে গান গান গাইছে জগমন্তু সিং?

মুশকিলে পড়লো জগমন্তু সিং! কান পেতে শুনতে লাগলো

তাই তো! কার এত বুকের পাটা। স্বরূপ সিংএর অনুমতি না নিয়ে গানা-বাজা করে কী করে লোকে! এ তো কানুন নয়। এ তো বে-কানুন।

জগমন্ত্ সিং খবর আনতে পাঠালে শহরের মহল্লা থেকে।

বাজারের সামনে শেঠজীদের মহল্লা। শেঠজীরা চারদিক থেকে টাকা আমদানি করে আনে। কেউ কারবার করে দিল্লীর বাজারে, কেউ করে কলকাতার বড়বাজারে। চারদিকের কারবারের টাকা এসে জমা হয় উদয়পুরের শেঠজীদের পাড়ায়। শেঠজীরা টাকা এনে মাটির তলায় পুঁতে রাখে। খরচ করতে হলে লুকিয়ে লুকিয়ে খরচ করতে হয়। জানতে পারলেই বিপদ। একবার যদি স্বরূপ সিংএর কানে ওঠে অমুক শেঠজীর টাকা হয়েছে তো আর রক্ষে নেই। তখন জগমন্ত্ সিংএর ওপর হুকুম হবে মাথট আদায়ের। একটা কোনও ছুতো-নাতায় টাকা দিতে হবে দরবারে। মহারাণার মেয়ের সাদিই হোক আর নাতির অন্নপ্রাশনেই হোক হাজার হাজার টাকা এনে ঢেলে দিতে হবে রাণার পায়ের ওপর।

সেদিন শেঠজীদের পাড়ায় বড় মজলিশ বসেছিল।

মজলিস বলতে এমন কিছু নয়। নাচ-গান-বাজনা। নটনীর দল এসেছে নাথদোয়ার থেকে। তাদের গুরুজী মহেশ্বরপ্রসাদের সঙ্গে নটনীর দল এসে নাচা-গানা-বাজা করছে। আর শেঠজীর আত্মীয়-কুটুমরা এসে জুটেছে আসরে।

ওদিকে রান্না-খাওয়ার আয়োজন হচ্ছে ভেতরে।

উপলক্ষটা সামান্য। একটা কারবার নতুন করে ফাঁদতে যাচ্ছে শেঠজী। তারই মহুরৎ-উৎসব। আসলে অনেক টাকা জমে গেছে ভাঁড়ারে। সেগুলো খরচ করার দরকার।

এক-একজন করে নট্নীরা নাচছে, আর তাদের গুরুজী মহেশ্বর প্রসাদ তদারকি করছে।

ভুল হলেই ধমক খেতে হবে গুরুজীর কাছে।

হঠাৎ কানাকানি ফিস্‌-ফিস্‌ শুরু হয়ে গেল। শেঠজীদের মধ্যে যেন গুনগুন করে কথাবার্তা চলছে। দু'একজন গান শুনতে শুনতে বাইরে উঠে গেল। এমন তো হয় না।

মহেশ্বরপ্রসাদের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। মহেশ্বরপ্রসাদ নিজে তালিম দিয়ে নাচ শিখিয়েছে নট্‌নীদের। তাদের নাচ দেখতে দেখতে কেউ আসর ছেড়ে উঠে গেলে তার বড় খারাপ লাগে। নিজের অপমান মনে হয়।

মহেশ্বরপ্রসাদ ঢোলচিকে আরো জোরে বাজাতে বললে।

তারপর রঙনার দিকে চেয়ে দেখলে। রঙনা তখন নিজের খেয়ালেই নাচছে। একবার বুকটাকে চিত করে দিচ্ছে, একবার ঘুরে-ঘুরে কাত হয়ে সকলকে সেলাম করছে। তারপর সেই রকম কাত হয়েই একটা পা বাড়িয়ে দিলে উল্টোদিকে।

এই জায়গাটায় বরাবর আসরের সমঝদার গুণী লোকরা 'তওবা' 'তওবা' বলে তারিফ করে। এ জায়গাটাতেই শেঠজীরা সাধারণত ইনাম দেয়।

কিন্তু তাজ্জব! কেউই কিছু বললে না।

রঙনাও নাচতে নাচতে একটু অবাক হয়ে গেল। এত মন দিয়ে নাচছে সে, অথচ কই কেউ তো তারিফ করছে না অন্য দিনের মত।

গুরুজীর দিকে একবার চাইলে রঙনা।

মহেশ্বরপ্রসাদ বুঝলো ব্যাপারটা।

রঙনাকে তাতিয়ে দেবার জন্যে জোরে তারিফ করে উঠলো—বহোত্‌ আচ্ছা নট্‌নী—বহোত্‌ আচ্ছা—

তারিফ করলে বটে মহেশ্বরপ্রসাদ, কিন্তু তেমন যেন মনের জোর পেলে না।

হঠাৎ আসরের দিকে নজর পড়তেই দেখলে শেঠজীরা কেউ নেই। কয়েকজন ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে শুধু বসে আছে।

মহেশ্বরপ্রসাদ উঠলো।

কিন্তু রঙনা তখনও নাচছে। তার কোনও দিকে খেয়াল নেই। গুরুজী তাকে শিখিয়েছে—যখন নাচবে সে তখন কোনোদিকে নজর দেয় না যেন। তার চোখের সামনে তখন আর কেউ নেই, কিছু নেই। গুরুজীর মুখটাই তখন শুধু মনে পড়ছে তার। আর মনে পড়ছে নাথদোয়ারের ঠাকুর একলিঙ্গনাথের কথা। মনে মনে প্রণাম করেছে সে ঠাকুরকে, গুরুজীকে। হে একলিঙ্গনাথ, হে গুরুজী, আমাকে সাহস দাও, ভক্তি দাও—

শেঠজীর বাড়ির ভেতরে তুমুল কাণ্ড চলেছে।

মহেশ্বরপ্রসাদ সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে হুজুর? নট্‌নীর কী কসুর হলো?

কেউ মহেশ্বরপ্রসাদকে কথার জবাবই দেয় না।

—কী হলো হুজুর?

শেঠজীরা তখন এদিকে থেকে ওদিকে ছোটাছুটি করছে। বাড়িময় হৈ-চৈ চলেছে। মহেশ্বরপ্রসাদ তখনও কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।

হঠাৎ কে যেন আসরের মধ্যে এসে চিৎকার করে উঠলো—নিকাল্ যাও সব, নিকাল্ যাও—

রঙনা তখনও নাচছে।

মহেশ্বরপ্রসাদ এক ধমক দিয়ে উঠলো—হুঁশিয়ার—

লোকটা বললে—আর দেরি কোরো না গুরুজী, এক্‌খুনি ভাগো এখান থেকে—

—কেন? কী কসুর হলো?

—তোমার কসুর কিছু হয়নি। কসুর হয়েছে আমাদের।

—কী কসুর?

কসুর যে কী তা বলতে গেলে অনেক সময় লাগে। অত সময় কোথায়? সে সময়ও কেউ দিলে না। কথাটা বলেই লোকটা অন্য-ধান্ধায় দৌড়লো।

মহেশ্বরপ্রসাদের মনে আছে সেদিনকার সেই কাণ্ড।

সেই তখন সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল দলবল নিয়ে। কিন্তু তার আগেই সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে। যখন মহেশ্বরপ্রসাদ নটনীর দল নিয়ে মহল্লা পেরিয়ে অনেক দূরে পালিয়ে গেছে তখন শেঠজীর বাড়িটা গুঁড়িয়ে একেবারে ধুলো হয়ে গেছে।

সত্যিই স্বরূপ সিংএর বড় রাগ হয়েছিল।

জগমন্ত্ সিং খবরটা নিয়ে এসেই সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছে মহারাণা স্বরূপ সিংকে।

স্বরূপ সিং দরবারে এসে বসলেন।

জগমন্ত্ সিংও পেছনে পেছনে এলো।

স্বরূপ সিং জিজ্ঞেস করলেন—কী খবর? কোন শেঠজীর কোঠিতে গানা-বাজা হচ্ছে?

জগমন্ত্ সিং বললে—বাজার-মহল্লাতে শেঠ ঝুমুটমল আছে, তারই কোঠিতে।

—কে শেঠ ঝুমুটমল?

—হুজুর, ওই যে যে-শেঠ গুজরাটে বাদাম-দানার কারবার করে, সেই শেঠ—

—তা হঠাৎ নাচা-গানা বাজা লাগিয়েছে কেন?

জগমন্ত্ সিং বললে—হুজুর, কাফি নাফা হয়েছে, অনেক টাকা কামিয়েছে, তাই কিছু নাচা-গানা-বাজাতে ওড়াচ্ছে—

—তা গানা-বাজা যে করছে তার জন্যে রাজ-দরবারে থেকে পাঞ্জা নিয়েছে?

—না হুজুর।

—তবে ফাঁসাও ওকে?

হুকুম হয়ে গেল মহারাণা স্বরূপ সিংএর। ফাঁসাও বললেই ফাঁসাও। এর আর আপীল নেই, এর আর মাফি নেই। একে শেঠ ঝুমুটমল বিদেশে গেছে, তার ওপর বিদেশে গিয়ে বাদাম দানার কারবার করছে। তার ওপরে বিদেশে গিয়ে বাদাম-দানার কারবার করে কাফি নাফা

হয়েছে। তারপর সেই নাফার টাকা নিজের খুশিমত গানা-বাজায় ওড়াচ্ছে। তারপর সবচেয়ে বড় অপরাধ করেছে এই যে সে গান-বাজনা করবার পাঞ্জা পর্যন্ত নেয়নি দরবার থেকে।

হুকুম মিলে গেছে।

সুতরাং আর কারো তোয়াক্কা নেই।

সেই রাজ হাভেলির ওপরে পাহাড়ের চূড়ো থেকেই কামান-দাগা হলো। এমন করে টিপ করা হলো, যাতে কামানের গোলা গিয়ে পড়ে শেঠ ঝুমুটমলের কোঠির ওপর।

আর পড়লোও তাই।

আর পড়বার সঙ্গে সঙ্গে শেঠ ঝুমুটমলের কোঠিতে আগুন ধরে গেল। আশেপাশের বাড়িও ক্ষতি হলো। একটু আগেই যেখানে গান-বাজনা-আনন্দ-উৎসবের হিড়িক পড়েছিল, সেখান থেকেই আবার কান্নার রোল উঠলো। উদয়পুরের শেঠবাজার-মহল্লায় আগুন ধরে গেল এক দণ্ডে। বাড়ি-ঘর দোর ছেড়ে পালালো মহল্লার লোকজন।

আর স্বরূপ সিং তাঁর উঁচু পাহাড়ের ওপরের ঘর থেকে বসে বসে মজা দেখতে লাগলেন।

বুঝুক মজাটা। দরবার থেকে পাঞ্জা না নিয়ে গান-বাজনা করে পরকে টাকা দেখানোর মজাটা বুঝুক ঝুমুটমল। শেঠ ঝুমুটমলের সঙ্গে মহল্লার অন্য শেঠরাও টের পাক। স্বরূপ সিং যে এখানে মরেনি, স্বরূপ সিং যে এখনও বেঁচে আছে, এ-খবরটা মাঝে মাঝে সকলকে জানানো দরকার। নইলে রাণাকে মানবে কোন উদয়পুরের লোক?

জগমন্ত্‌ সিংও খুশি! হাঁ, জব্দ বটে শেঠ ঝুমুটমল! ঝুমুটমলের নয়া কোঠি হয়েছিল, নয়া বিবি হয়েছিল। ঝুমুটমল টাকাও কামাচ্ছিল খুব, নাথদোয়ার থেকে নট্‌নীদের গুরুজী মহেশ্বরপ্রসাদকে এনে গানা-বাজা-নাচা লাগিয়েছিল।

কিন্তু জগমন্ত্‌ সিং জানতেও পারলে না—তার আগেই খবরটা পৌঁছে গিয়েছিল ঝুমুটমলের বাড়িতে। খবর পেয়েই লোকজন সরে গিয়েছিল।

মহেশ্বরপ্রসাদ যখন বাজার-মহল্লা পেরিয়ে বড় তালাওটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখনই কামানের গোলাটা এসে পড়লো শেঠজীর কোঠির মাথায়। আর চারদিকে ধোঁয়ার পাহাড় উঠলো। উঠে উদয়পুরের আসমান ঢেকে দিলে।

ঝুমুটমলও জেনানাদের সঙ্গে করে নিয়ে তার আগেই বাড়ি ছেড়ে দূরে সরে পড়েছে। যারা জানতে পারেনি তারাই পাথর চাপা পড়ে মরেছে শুধু। তাদের কান্নায় আর চিৎকারে তখনও কান পাতা যায় না।

যে মরেছে সে তো বেঁচেছে।

কিন্তু যারা তখনও মরেনি, আধমরা হয়ে রয়েছে—তাদেরই যত যন্ত্রণা।

আর যারা একেবারে রক্ষে পেয়ে গেছে, তারা তখন দূরে দাঁড়িয়ে থর-থর করে কাঁপছে। তারা যে রক্ষে পেয়ে গেছে এই-ই একলিঙ্গনাথের অপার দয়া। জয় বাবা একলিঙ্গনাথ কী জয় হো, জয় বাবা একলিঙ্গনাথ কী জয় হো!

ডাক্তারবাবু গল্প বলতে বলতে এবার থামলেন।

বললাম—তারপর?

কিষেণগড়ের ডাক্তারখানার সামনে বসে গল্প হচ্ছিল। রাত অনেক হয়ে গিয়েছে তখন। একটা কুকুর সামনের ফুটপাথে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ কেঁউ-কেঁউ করে একবার আর্তনাদ করে উঠলো।

ডাক্তারবাবু বললেন—দেখুন দেখুন, কুকুরটার শীত করছে তাই কাঁদছে—

আমিও দেখলাম, কুকুরটা আবার ল্যাজ গুটিয়ে শরীরটাকে আরো বেশি কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলে। রাস্তার ঘেয়ো কুকুর।

কোথাও আশ্রয় নেই বলেই রাস্তার ধুলোর ওপর খোলা আকাশের তলায় ঘুমোবার চেষ্টা করছে।

ডাক্তারবাবু বললেন—তখনকার দিনে রাজস্থানের যত প্রজা, স্বরূপ সিংএর চোখে তারা সবাই-ই যেন ওই ঘেয়ো কুকুর। তাদের বাড়ি-ঘর-বৌ-ছেলেমেয়ে কিছুই যেন থাকতে নেই। তারা যেন মানুষ নয়। স্বরূপ সিংএর চোখে রাজস্থানের প্রজা মানেই জানোয়ার। তারা মরলেই বা কী, আর বাঁচলেই বা কী! তখনকার সমাজে ওই-রকমই ছিল নিয়ম। কত শো বছর আগের গল্প আপনাকে বলছি। তখন রাণা মানেই ভগবান। দেবাদিদেব একলিঙ্গনাথের ওপরে তার ঠাঁই।

কিন্তু ওই যে কথায় আছে—হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। এও ঠিক তাই। মহারাণা স্বরূপ সিং তবু দেবাদিদেব একলিঙ্গনাথের ওপর। কিন্তু তারও ওপরে যদি কেউ তো হলো ওই মন্ত্রী জগমন্ত্‌ সিং।

বাজার-মহল্লায় যদি কোতোয়ালের অত্যাচার হয় তো তার আপীল-আর্জি যাবে খুব বড়-জোর জগমন্ত্‌ সিং পর্যন্ত। স্বরূপ সিং পর্যন্ত পৌঁছাবেই না। স্বরূপ সিং টেরই পাবে না উদয়পুরের কোন্‌ মহল্লায় কোন্‌ শেঠজীর ওপর কী অত্যাচার হলো। সারা রাজস্থান চালায় জগমন্ত্‌ সিং। কিন্তু আসলে স্বরূপ সিংএর ব-কলমায়।

এমনিতে স্বরূপ সিংএর হুকুম তামিল করতে জগমন্ত্‌ সিংএর পেছপা হবার কথা নয়। স্বরূপ সিংএর কানের কাছে এসে জগমন্ত্‌ সিং যেমন শোনায়, স্বরূপ সিং তেমনি শোনে।

জগমন্ত্‌ সিং যদি বলে—এবার ক্ষেতে মকাই ফলেছে বেশ, চাষীরা খুব নাফা করেছে—

স্বরূপ সিং বললে—তাহলে খাজনা বাড়িয়ে দাও—

খাজনা বাড়ালে স্বরূপ সিংএর লাভ। মন্ত্রী জগমন্ত্‌ সিংএরও লাভ।

আসলে স্বরূপ সিংএর চেয়ে জগমন্ত্‌ সিংএরই লাভটা বেশি।

কিন্তু স্বরূপ সিংএর খেয়ালের আবার তুলনাও নেই। অত্যাচার করতেও যেমনি, দান করতেও তেমনি।

ভাট তিলকচাঁদ খুব গান গায় ভালো। ভাটের মুখে স্বরূপ সিংএর পিতা-পিতামহদের-প্রপিতামহদের গুণপনা শুনে স্বরূপ সিং মহাখুশি।

বললে—পঞ্চাশ মোহর একে দিয়ে দাও জগমন্ত্ সিং—

স্বরূপ সিং যখন যা দিতে বলবে তা দিতে হবেই। স্বরূপ সিংএর সামনে তাই-ই দিতে হলো। ইনাম পেয়ে খুব খুশি ভাট তিলকচাঁদ। স্বরূপ সিংকে মাথা নিচু করে বারবার কুর্নিশ করলে।

কিন্তু বাইরে আসতেই জগমন্ত্ সিং ধরেছে।

—শোনো ভাট তিলকচাঁদ।

তিলকচাঁদ থমকে দাঁড়ালো। দেখলে মন্ত্রী জগমন্ত্ সিং পেছনে দাঁড়িয়ে।

তিলকচাঁদ একটু অবাক হয়ে গেল।

কই, কোনো তো কসুর হয়নি ভাট তিলকচাঁদের। রাণা-দরবারে যেমন-যেমন আদব-কায়দা মানতে হয় সবই তো ঠিক-ঠিক মেনেছে সে। আর এ আদব-কায়দা শুধু উদয়পুরেই নয়; যোধপুর, জয়পুর, বিকানীর সবজায়গাতেই একই কানুন।

জগমন্ত্ সিংএর মুখটা কিন্তু গম্ভীর-গম্ভীর।

দেখেই একটু সন্দেহ হয়েছিল। বললে—নমস্তে মন্ত্রীজী!

জগমন্ত্ সিং বললে—খুব তো দাঁও মেরে নিলে স্বরূপ সিংজীকে সোজা মানুষ পেয়ে। তা আমার হিস্যা কোথায়?

—হুজুর, আপনার হিস্যা? ইস্‌কে মতলোব?

জগমন্ত্ সিং বললে—তোমার পাওনা থেকে আমার অংশ না দিয়েই চলে যাচ্ছো?

ভয় পেয়ে গেল তিলকচাঁদ। এমন ঘটনা আর কোথাও ঘটেনি।

তাড়াতাড়ি মোহর ক'টা বের করলে পুঁটুলি থেকে। জগমন্ত্ সিং সব ক'টা মোহর নিজের হাতে নিয়ে তা থেকে পাঁচটা ভাট-তিলক-

চাঁদের হাতে দিয়ে বাকি পঁয়তাল্লিশটা নিজের ট্যাঁকে গুঁজে রেখে বললে—নাও, আমার হিস্যা নিলাম, এখন তুমিও বিদেয় হও—

এ রকম ঘটনা নতুন নয়। উদয়পুরের মহারাণা স্বরূপ সিংএর কাছ থেকে যারা ইনাম পেয়েছে, তাদের অভিজ্ঞতা আছে।

তা সেদিন বাজার-মহল্লা থেকে বেরিয়ে পড়ে মহেশ্বরপ্রসাদ সেই-জন্যেই অবাক হয়নি। কিন্তু শেট ঝুমুটমলজী যে রাণার কাছ থেকে মজুরি না-নিয়েই নাচা-গানা-বাজা করবে তা কেমন করে জানবে মহেশ্বরপ্রসাদ। জানলে আগে থেকেই হুঁশিয়ার হয়ে যেত।

রঙনা বললে—গুরুজী, এখন কী হবে?

শুধু তো রঙনা নয়। নট্‌নীর দলে আরো অনেক মেয়ে আছে। তাদের সবাইকে নিয়ে নাচতে এসেছিল মহেশ্বরপ্রসাদ।

ঝুমুটমলের বাড়ি গেছে, সম্পত্তি গেছে, কিছু লোক মারাও গেছে। মহল্লার শেঠজীরা নিজের নিজের জান্ নিয়েই ব্যস্ত। তখন আর নটনীদের ভালো-মন্দ দেখবার সময় নেই কারো।

মহেশ্বরপ্রসাদ সেই অত রাত্রে আবার উট-ভাড়া করে নাথদোয়ারে ফিরে গিয়েছিল দলবল নিয়ে। ইনাম-ইজ্জত কিছুই পাওয়া গেল না। মাঝখান থেকে কিছু হয়রানি আর লোকসান নসীবে ছিল।

তারপরে মহেশ্বরপ্রসাদ এদিকে আসেনি।

কিন্তু কেমন করে যেন স্বরূপ সিংএর কাছে রঙনার কথাটা তুলেছিল।

স্বরূপ সিংএর কাছে কথা তোলবার লোকের কখনও অভাব হয় না।

—কী নাম কহা? রঙনা?

—জী সরকার। অপূর্ব নাচে, অদ্ভুত গায়। তার নাচ দেখতে কাঁহা কাঁহা মুলুক থেকে আদমীরা আসে। শুধু রঙনার নাচ দেখবার জন্যে টাকা খরচ করে।

স্বরূপ সিং বলেছিল—ঠিক আছে, রঙনাকো ইহা লাও—

হুকুমটা হয়ে গেল জগমন্ত্ সিংএর ওপর।

এসব খবর মহেশ্বরপ্রসাদ জানতো না। নাথদোয়ারের মাঠে-মন্দিরে-পাহাড়ে তখন নট্‌নীরা গুরুজীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদয়পুরে আর যাবে না তারা। বড় তক্‌লিফ পেয়েছে সেবারে। নট্‌নীদের নাচ যদি দেখতে চাও এই নাথদোয়ারে এসো। এখানে এসে আমাদের নাচ দেখো। মুজরো করো। আমরা তোমাকে নাচ দেখাবো, গান শোনাবো। আর নাচ দেখে যদি তোমার ভালো লাগে তো খুশি হয়ে আমাদের ইনাম দিয়ো। আমরা খুশি হয়ে তা মাথায় তুলে নেবো।

কিন্তু সেদিন স্বরূপ সিংএর হুকুমনামা এসে হাজির হলো মহেশ্বর-প্রসাদের কাছে।

স্বরূপ সিংএর হুকুমনামা, কিন্তু হুকুম পাঠিয়েছে জগমন্ত্ সিং। আর সে হুকুমনামা নিয়ে এসেছে দরবারের পেয়াদা।

মহেশ্বরপ্রসাদ পড়তে জানে না।

জিজ্ঞেস করলে—আমাকে কী করতে হবে।

পেয়াদা বললে—মহারাণা স্বরূপ সিং রঙনার নাচা-গানার সুখ্যাতি শুনেছে, তাই মহারাণা নিজে রঙনার নাচ দেখবে।

মহেশ্বরপ্রসাদ বললে—কিন্তু উদয়পুরে বাজার-মহল্লার শেঠজী ঝুমুটমলের কোঠিতে নাচতে গিয়ে আমার খুব তক্‌লিফ গিয়েছে। আবার নতুন কী তক্‌লিফ হবে বুঝতে পারছি না।

পেয়াদা বললে—মহারাণা স্বরূপ সিং খুদ্ নিজে ডেকেছে, তক্‌লিফ আবার কী হবে? স্বরূপ সিং খুশি হলে ইনাম দেবে, ইজ্জত দেবে।

মহেশ্বরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলে—কী ইজ্জত দেবে?

—রঙনা যে-ইজ্জত চাইবে, সেই ইজ্জতই দেবে। যে-ইনাম চাইবে, সেই ইনামই দেবে।

—আর যদি খুশি না করতে পারে?

পেয়াদা বললে—কেন খুশি হবে না গুরুজী, রাজস্থানের সব লোক খুশি হচ্ছে আর মহারাণা স্বরূপ সিং খুশি হবে না? মহারাণা স্বরূপ সিং তো জহুরী লোক। সেবার ভাট তিলকচাঁদ দরবারে গাইতে এলো, মহারাণা তার গান শুনে খুশি হয়ে তাকে পঞ্চাশ মোহর ইনাম দিলে।

—পঞ্চাশ মোহর তো দিলে, কিন্তু মন্ত্রী জগমন্ত্ সিং তা থেকে কত হিস্যা নিলে?

পেয়াদা বললে—তা মন্ত্রীজী নেবে কেন? মহারাণা স্বরূপ সিংজী নিজের হাতে রঙনাকে ইনাম দেবে।

কথা হচ্ছিল মহেশ্বরপ্রসাদের ঘরের দাওয়ায় বসে। হঠাৎ রঙনা ঢুকলো!

বললে—গুরুজী, কথা দাও, আমি যাবো।

মহেশ্বরপ্রসাদ অবাক হয়ে গেল।

বললে—সে কী রে? কথা দেবো? তুই যাবি? সেবার যে বাজার-মহল্লায় গিয়ে অত তক্‌লিফ হলো! তুই বললি আর উদয়পুরে যাবি না?

রঙনা বললে—সেবার তো শেঠজীর কোঠিতে গিয়েছিলাম গুরুজী। এবার তো রাণার দরবারে।

পেয়াদা হুকুম জারি করে দিয়ে চলে গেল। তার কাম হাসিল।

পেয়াদা চলে যাবার পর মহেশ্বরপ্রসাদ মেয়ের দিকে চাইলে

বললে—কী রে, সত্যিই তুই যাবি?

রঙনা বললে—হ্যাঁ গুরুজী, আমি সত্যিই যাবো।

—কিন্তু শেষকালে যদি কোনো বিপদ হয়?

রঙনা বললে—কী বিপদ হবে—আমি যাবার আগে সেজা করে যাবো। তুমি আমার সেজার ইন্তেকাম করো—

মহেশ্বরপ্রসাদ অবাক হয়ে গেল মেয়ের কথা শুনে। কতদিন ধরে মহেশ্বরপ্রসাদ মেয়েকে বলছে সেজা করতে।

আমি এতক্ষণ শুনছিলাম।

বললাম—সেজা কী ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু বললেন—ওরা বিয়েকে 'সেজা' বলে। আমার মনে হয় 'শয্যা' কথাটা থেকেই 'সেজা' এসেছে, অর্থাৎ বিছানা। কিন্তু ওদের বিয়েটা আমাদের বিয়ের মত নয়। সে অন্যরকম।

আমি বেশ অবাকই হলাম।

বললাম—কী রকম?

—ওরা তরোয়ালকে বিয়ে করে বিমলবাবু। মানে বিয়ে হয় তরোয়ালের সঙ্গে—

—তরোয়াল? বলছেন কী?

ডাক্তারবাবু বললেন—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। বিয়ের সময় বর বিয়ে করতে আসে না। আসে তরোয়াল। সেই তরোয়ালের সঙ্গেই বিয়ের যা-কিছু উৎসব-অনুষ্ঠান শুরু হয়। খুব ঢাক-ঢোল-জগঝম্প বাজে। লাড্ডু-প্যাঁড়া-পুরি-ভাজি-গুল্‌জামুন এইসব খাওয়া-দাওয়া হয়। বড়-লোকের বাড়িতে ঘটাটা বেশি হয়, আর গরীব লোকের বাড়ি একটু কম। তা বিয়েই হোক আর সেজাই হোক, মঞ্জুরি নিতে হবে রাণার দরবার থেকে। দরবার মঞ্জুরি না দিলে আর ঘটা-টটা কিছু হবে না।

তা ঘটা-টটা হবার দরকার নেই। সে পরে হলেও চলবে। আগে তো রঙনার সেজা হয়ে যাক।

মহেশ্বরপ্রসাদ বললে—তবে তাই-ই হোক।

হোক মানে একদিন তরোয়াল এলো রঙনার কাছে।

বরের বাড়ি দূরেও নয় বেশি। পাশের মহল্লাতেই দুখহরণ থাকে, তারই ছেলে হল বর। সেই বর তরোয়াল পাঠিয়ে দিলে একদিন। সঙ্গে লোকজন, ঘোড়া, উট—জাঁকজমক যা আসবার তাও এলো।

যারা জানতো না, তারা বললে—কে তরোয়াল পাঠালে গো?

যে জানে সব সে বললে—ঠাকুর মহল্লার চমন—

—চমন? কোন্ চমন? কার লেড়কা?

দুখহরণের লেড়কা চমন।

চমন দুখহরণের লেড়কা বটে, কিন্তু কিছু করে না সে। করে না মানে কাজের চেয়ে তার বাঁশি বাজাবার দিকেই ঝোঁক বেশি। যখন সবাই নাচে সে বাঁশিটা নিয়ে পোঁ-পোঁ করে।

রঙনা বলতো—তোর কিছু হবে না, তুই বাঁশি বাজানো ছেড়ে দে—

চমন বলতো—আমার বাঁশি বাজানো না হোক, তোর নাচ তো হবে! তুই নাচবি আর আমি তারিফ করবো!

রঙনা বলতো—তারিফ করবার জন্যে তোর মত বেকাম লোককে দরকার নেই। বড় বড় শেঠজীরা আমার তারিফ করতে পারলে ধন্য হয়ে যায়—

অর্থাৎ চমন বুঝতে পেরেছিল রঙনার কাছে বেকাম লোকের তারিফেরও কোনো দাম নেই। কিন্তু কোন্ কাজটা করবে সে? কোনও কাজই যে তার করতে ভালো লাগে না। মন দিয়ে চেষ্টা করলেও যে বাঁশিটা তার হবে না তা সে বুঝতে পেরেছিল।

তা সবাই কি সব পারে?

আর সবাইকেই যে সব কাজ করতে হবে আর পারতে হবে সেইটেই বা কে বললে? সেইটেই বা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে? কিছু না-করতে পারাটাও তো একটা পারা।

তাই যখন নট্নীদের নাচ-গান চলতো, মুজরো নিয়ে মহেশ্বরপ্রসাদ কোথাও যেত, তখন শুধু সঙ্গে যেতে চাইতো চমন!

রঙনা বলতো—না গুরুজী, ওকে নিয়ো না! ও কোন কম্মের নয়, ও কেবল হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, আমি বোল্ ভুলে যাই—

রঙনা কিছুতেই নেবে না, আর মহেশ্বরপ্রসাদ ততই বলবে—ও থাক না সঙ্গে। সঙ্গে থাকলে ক্ষতি কী?

রঙনা বলে—ওই তো বললাম, কেবল আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে যে—

—তা মুখের দিকে চেয়ে থাকলে তোর ক্ষতিটা কী?

—বা রে, আমি যে বোল্ ভুলে যাই—

মহেশ্বরপ্রসাদ বললে—ঠিক আছে, ও তোর মুখের দিকে চাইবে না। হলো তো?

তারপর চমনের দিকে চেয়ে বললে—খবরদার, কারো মুখের দিকে যেন চাসনি।

চমন জিজ্ঞেস করতো—তা হলে কোন্ দিকে চাইবো?

রঙনা বলতো—কেন, কারো দিকে চাইতে হবে না, চোখ বুঁজে থাকলেই হয়।

মহেশ্বরপ্রসাদ বলতো—না না, তার চেয়ে তুই আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকিস, আমার কোনও বোল্ ভুল হবে না—

কিন্তু তা কি হয়? তা কি সম্ভব? হঠাৎ এক-একবার চেয়ে ফেলতো রঙনার মুখের দিকে। আর তখনই ধমক খেতো রঙনার কাছ থেকে।

রঙনা বলতো—ওই দেখ গুরুজী, চমন আমার দিকে আবার চাইছে—

কিন্তু সেই চমনই হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো একদিন। সে এক হৈ-হৈ কাণ্ড। সারা নাথদোয়ারে তোলপাড় পড়ে গেল।

একদিন দৌড়তে দৌড়তে দুখহরণ মহেশ্বরপ্রসাদের কাছে এসে হাজির।

কী ব্যাপারে? না আমার ছেলেটা সর্বনাশ করে ফেলেছে।

—কী সব্বোনাশ গো দুখহরণ? কী সব্বোনাশ?

—চমন নিজের দুটো চোখ অন্ধ করে ফেলেছে। ঝর-ঝর করে রক্ত পড়ছে দু'চোখ দিয়ে।

—ডাক্তারকে দেখিয়েছো?

ডাক্তার মানে সেকালের রাজস্থানের ডাক্তার।

তাড়াতাড়ি মহেশ্বরপ্রসাদ দৌড়ে গেল ঠাকুর-মহল্লায়। রঙনাও দৌড়ে গেল। তখন মহল্লার ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সবাই জুটেছে দুখহরণের বাড়িতে। ডাক্তার তখন চমনের চোখে কী-সব গাছের পাতা বেটে দিয়ে চলে গেছে। চমন যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

তারপর সেই চোখ ফুলে ঢোল হয়ে গেল। চোখদুটো চিরকালের মত নষ্ট হয়ে গেল চমনের।

তাকে জিজ্ঞেস করলে—কেন রে, চোখদুটো কিসে নষ্ট হলো তোর?

চমন বললে—আমি নিজেই চোখদুটো নষ্ট করে ফেললাম—

—কেন তোর চোখ কী দোষ করলো?

চমন বললে—চোখ থাকলেই কেবল রঙনাকে দেখতে চায়—

মহেশ্বরপ্রসাদের তখন খেয়াল হলো। তখনই হঠাৎ মালুম হলো যে রঙনার 'সেজা' দিতে হবে। এতদিন ঢোল বাজিয়ে আর নট্‌নী নাচিয়ে তার দিন কেটেছে শুধু। মেয়ের দিকে মন দেবার আর ফুরসুত হয়নি।

তাড়াতাড়ি সেজার বন্দোবস্ত করতে লাগলো মহেশ্বরপ্রসাদ। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে নিজেই খোঁজ-খবর চালাতে লাগলো। রঙনা কিছুই জানতে পারেনি। কোথা থেকে কে তরোয়াল পাঠাবে, কী-রকম পাত্র, তারই হিসেব নিকেশ করতে লাগলো লুকিয়ে লুকিয়ে। রঙনাকে তরোয়াল পাঠাবার মত পাত্রের অভাব নেই। সবাই রঙনাকে সেজা করতে চায়।

হঠাৎ এক পাত্র মিললো।

মহেশ্বরপ্রসাদ ভারি খুশি।

মেয়েকে বলতেই মেয়ে ক্ষেপে উঠলো—কেন তুমি ওখানে আমার সেজার ব্যবস্থা করতে গেলে গুরুজী ?

—কেন, অন্যায়টা কি করলাম আমি ?

রঙনা বললে—না, আমি ওখানে সেজা করবো না—

—তা কেন করবিনে তা তো বলবি ?

রঙনা বললে—করবো না, আমার খুশি—

—তাহলে কাকে সেজা করবি ?

রঙনা বললে—চমনকে—

—চমন ? সে তো কাণা। দু'চোখ কাণা, তাকে সেজা করবি ?

—হ্যাঁ।

—খুব ভালো করে ভেবে ভাখ মা। সে অন্ধ, চোখে দেখতে পায় না। তোকেও দেখতে পাবে না, তোর নাচকেও দেখতে পাবে না। তোকেই শেষ পর্যন্ত তাকে সামলাতে হবে। সারা জীবন সামলাতে হবে। তা পারবি ? বেশ ভালো করে ভেবে ভাখ—

রঙনা অনড় অটল।

বললে—পারবো গুরুজী। যে আমার জন্যে নিজের চোখ দুটো নষ্ট করতে পারে, আমি নিজেই তার চোখ হয়ে উঠবো। আমার নিজের একজোড়া চোখ যতদিন আছে, ততদিন চমনের চোখের অভাব হবে না—

মহেশ্বরপ্রসাদ আর কিছু বললে না। মেয়ের যখন একবার চমনকে সেজা করবার মতি হয়েছে তো সে আর নড়বে না।

গেল মহেশ্বরপ্রসাদ দুখহরণের বাড়ি।

দুখহরণও ঢোল বাজায় মহেশ্বরপ্রসাদের দলে। দুখহরণকেও মহেশ্বরপ্রসাদ নিজে তালিম দিয়ে তৈরি করেছে। দুখহরণের ছেলে চমনকে জন্মাতে দেখেছে মহেশ্বরপ্রসাদ।

কথাটা শুনে দুখহরণের সমস্ত দুঃখ ঘুচে গেল যেন। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

বললে—গুরুজী, সবই একলিঙ্গনাথের মর্জি।

আর চমন? চমনকে বলতেই সে বললে—গুরুজী, রঙনাকে বোলো, এবার তার দিকে চাইলে সে যেন আর রাগ না করে। এবার যেন সে বোল্ না ভুলে যায়!

তা জাঁকজমক যা হবার তা হলো।

তরোয়াল পাঠালো চমন আর তার সঙ্গে চাঁপা-ফুলের মালা, আর মিষ্টি-খাবার।

রঙনা সেই ফুলের মালা তরোয়ালের গলায় পরিয়ে দিলে। তারপর সেই ফুল-পরা তরোয়াল বিছানায় শুইয়ে রাখা হলো। নট্‌নীদের নাচ হলো, গান হলো। রঙনা নাচলো, দুখহরণ ঢোল বাজালো। নট্‌নী-মহল্লার সবাই এলো সেজার উৎসবে। শুধু এলো না চমন। কারণ তার আসতে নেই। সে আসবে পরে।

যেদিন চমন আসবে, সেদিন আরো বড় উৎসব হবে। আরো নাচ-গান হবে, আরো লাড্ডু, আরো মিঠাই, আরো গুল্‌জামুন খাবে সবাই। অর আগে মহারাণা স্বরূপ সিংএর দরবার থেকে ইনাম নিয়ে আসুক, ইজ্জৎ নিয়ে আসুক।

ডাক্তারবাবু থামলেন।

বললেন—কত রাত হলো? আপনার ঘুম পাচ্ছে নাকি?

বললাম—তারপরে বলুন কী হলো?

কিষেণগড়ের রাস্তা তখন নিঝুম। যে-কুকুরটা এতক্ষণ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল, সে আবার কেঁউ কেঁউ করে ডেকে উঠলো। একখানা

ট্রেন শান্টিং করছিল স্টেশনের প্লাটফর্মে, সেটা হঠাৎ হুইশল্ বাজিয়ে রাত্রের অন্ধকার চিরে খান খান করে ফেলে দিলে।

ডাক্তারবাবু বললেন—আপনার ঘুম পেলে বলবেন—

বললাম—সে কী, দেখছেন আমি উঠছি না পর্যন্ত, এক নিশ্বাসে শুনছি আপনার গল্প—

ডাক্তারবাবু আবার বলতে আরম্ভ করলেন—রাজা-রাজড়ার ব্যাপার, তার আদব-কায়দা-কানুনই আলাদা। বিশেষ করে অত বছর আগের ঘটনা। আপনি যদি কখনও গল্প লেখেন এই নিয়ে তো আমি আপনাকে নানা ভাবে সাহায্য করতে পারবো। এসব ছাপানো বইতে পাবেন না। এখানে এই কিষেণগড়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের লাইব্রেরীতে অনেক পুরোনো সব তুলোট কাগজে লেখা পুঁথি আছে। আমি আপনাকে সব দেখাতে পারি।

বললাম—সেসব পরে হবে, যদি কখনও উপন্যাস লিখি তো দেখবো। এখন বলুন তারপর কী হলো?

ডাক্তারবাবু বললেন—তারপর মহেশ্বরপ্রসাদ দলবল নিয়ে এলো উদয়পুরে স্বরূপ সিংএর দরবারে। জগমন্ত্ সিংএর কথা তো আগেই বলেছি। যেমন করে ভাট তিলকচাঁদের আদর-অভ্যর্থনা করা হয়েছিল, তেমনি করেই মহেশ্বরপ্রসাদের দলকে অভ্যর্থনা করা হলো। যারা জুতো পরে এসেছে তাদের জুতো খুলতে বলা হলো পাহাড়ের তলাতেই। খালি পায়ে উঠতে হবে ওপরে।

সবাই তাই-ই করলো। জুতো খুলে উঠলো ওপরে।

আসলে স্বরূপ সিং তো শুধু মহারাণা নয়, মহাদেবতা। ঈশ্বরের সমান। একলিঙ্গনাথ। সুতরাং তার কাছে যাচ্ছো যখন, তখন নিরাভরণ হয়ে যেতে হবে। দেবদর্শন করতে হলে যা করতে হয়।

কিন্তু ওপরে গিয়েও দেবদর্শন পাওয়া গেল না।

মহারাণার হুকুম সেদিন তিনি দরবারে নাচ দেখবেন না। দেখবেন বৃন্দাবন-প্যালেসে।

বৃন্দাবন-প্যালেস হলো একেবারে উদয়সাগরের ভেতরে। বিরাট প্রাসাদ। কিন্তু স্বরূপ সিংএর প্রাসাদ থেকে আধ-মাইলটাক পথ নৌকো করে পেরোতে হয়। নৌকো ছাড়া অন্য কোনও যাবার রাস্তা নেই। বৃন্দাবন-প্যালেসের চারদিকে অথৈ-অগাধ জল। জলে জল চারদিকে। সেই জলের ওপর মহারাণা স্বরূপ সিং মাঝে-মাঝে জল-বিহারে বেরোন। সঙ্গে থাকে পাত্র-মিত্র-পারিষদবর্গ। যারা স্বরূপ সিংএর কাছ থেকে কিছু প্রসাদপ্রার্থী, তারা সঙ্গে সঙ্গে জল-বিহার করবার সুযোগ খোঁজে। সঙ্গে থাকতে থাকতে যদি একবার হাসিমুখের সুযোগ নিয়ে কিছু পেয়ে যায় তারই প্রত্যাশায় থাকে।

তারপর যখন জল-বিহার শেষ হয়ে যায়, তখন আবার পরের দিনের সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

আর সেও দেখবার মত প্যালেস বটে। আপনি তো দেখে এলেন? শুনছি এখন নাকি মহারাণা প্যালেসটা হোটেল করে দিচ্ছে। আমেরিকান টুরিস্ট যারা আসবে তারা ওখানে দিনে তিনশো টাকা চার্জ দিয়ে থাকবে।

বললাম—হ্যাঁ, এখনও রাজমিস্ত্রি খাটছে। সবগুলো ঘর আমাদের দেখতে দিলে না।

ডাক্তারবাবু বললেন—আমি সবই দেখেছি। আর তা ছাড়া আপনি না দেখতে পেলেও আপনার ক্ষতি হবে না, ও-সম্বন্ধে আপনাকে আমি অনেক বই সাপ্লাই করতে পারবো। তাতে অনেক ছবি-টবি আছে। রাণারা যে কত সৌখিন ছিলেন, কত ঐশ্বর্য, কত জাঁকজমক ছিল তাঁদের তাও জানতে পারবেন। ওই স্বরূপ সিংএর আমল থেকে তা কেবল বেড়েই চলেছিল।

তা যাকগে সেসব কথা।

সেই বৃন্দাবন-প্যালেসের চবুতরায় নাচের আসর বসলো সেদিন।

গণ্য-মান্য গুণীজনদের আসরে নেমন্তন্ন করা হয়েছে।

মহারাণার মঞ্জুরী পাবার পর নাচ আরম্ভ হলো। প্রথমে অন্য নটনীরা নাচলো এক-এক করে।

মহেশ্বরপ্রসাদ এক-এক করে সকলের নাচের খেলা দেখালে। ছুখহরণ ঢোল বাজাতে লাগলো তার সঙ্গে।

দলের সবাই এসেছে শুধু আসেনি একা চমন। সে রঙনাকে সেজা করেছে। তরোয়াল পাঠিয়েছে। সুতরাং এখন সে আসতে পারে না। সে পরে আবার আসবে দলের সঙ্গে।

কিন্তু রঙনা যখন নাচতে উঠলো তখন নাথদোয়ারেব ঠাকুর-মহল্লায় চমন ছুটো বোবা-চোখ দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে আছে।

বলছে—কিছু ভয় নেই রঙনা, নাচো।

রঙনা বলছে—কিন্তু তুমি যে দেখছো আমার দিকে—আমি যদি বোল্ ভুলে যাই—

চমন বলছে—আমি তো দেখতে পাই না রঙনা—

রঙনা বলছে—আচ্ছা এই নাও, তুমি আমার চোখছুটো নাও—

চমন বলছে—কিন্তু আমাকে চোখ দিয়ে দিলে তুমি দেখবে কী করে?

রঙনা বলছে—আমি তো পা দিয়ে নাচবো, আমার পা-ছুটো থাকলেই হলো—

হঠাৎ রঙনার খেয়াল হলো কীসের যেন শব্দ হচ্ছে। চারদিকে চেয়ে দেখলে। কোথায়, চমন তো তার দিকে চেয়ে নেই। কোথায় গেল চমন? কে তবে এতক্ষণ কথা বলছিল তার সঙ্গে?

চারদিকে লোক বসে আছে গোল হয়ে। মহারাণা স্বরূপ সিং। স্বরূপ সিংএর পাশে জগমন্ত্ সিংএর পাশে আরো সব বড় বড় শেঠজী। কাউকেই চেনে না রঙনা। সবাই তার দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু তুমি কোথায় চমন? তুমি তো আমার দিকে চেয়ে দেখছো না?

চমন কোথা থেকে যেন বলে উঠলো—আমি কী করে দেখবো, আমার কি চোখ আছে?

—আছে আছে—তোমার চোখ আছে চমন !

রঙনা চিৎকার করে উঠলো—আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন তোমার চোখ আছে চমন—

—কিন্তু তারপর ? তুমি যখন চলে যাবে ?

—আমি কোথায় আর চলে যাবো ? আমি তোমাকে ছেড়ে কোথায় গিয়ে শান্তি পাবো ?

—আমাকে তুমি এতই ভালোবাসো রঙনা।

—কিন্তু তোমার মত যদি ভালোবাসতে পারতাম ! তোমার জন্য আমি যদি আমার সব কিছু দিতে পারতাম ! তুমি কী চাও বলো।

—কিছু চাই না আর আমি। আমি সব পেয়েছি।

—কিন্তু তবু কিছু চাও। কিছু নিবেদন না কবে যে নিতে নেই—

—তুমি আমাকে তোমার সব দিয়েছো রঙনা। আমি তোমাকে পেয়েছি। আর পাওয়াব কিছু বাকি নেই যে আমার !

—তাহলে বেশ, এবার তুমি আমার সম্মান নাও। যত সম্মান, যত খাতির, যত প্রীতি,যত তারিফ স্বরূপ সিং আমায় দিচ্ছে,এ সব তোমার !

—রঙনা, তুমি কতো ভালো।

রঙনা তখন বেহুঁশ হয়ে নাচছে। তার ঘাগরার জরির-চুম্‌কি বসানো ফুল-লতা-পাতাও নাচছে। মহারাণা স্বরূপ সিংএর চোখের পাতা নড়ছে না। জগমন্ত্‌ সিংএর চোখের পাতা নড়ছে না, পাত্র-মিত্র-পারিষদ কারো চোখের পাতা নড়ছে না। উদয়সাগরে যত জল আছে তাদের মাথাতেও যেন আর ঢেউ নেই। সব ঢেউ যেন রঙনার নাচ দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে রঙনার দিকে।

—এ সবই তোমার চমন। এই খাতির এই তারিফ এসবই তোমাকে দিলাম।

—কিন্তু তোমার সম্মান তো আমারই সম্মান রঙনা। তুমি আমি কি আলাদা ?

রঙনা বললে—এসো, তুমি আর আমি আজ একাকার হয়ে যাই—

আরো জোরে নাচ চলতে লাগলো রঙনার। আরো তারিফ, আরো খাতির, আরো হাততালি। সমস্ত বৃন্দাবন-প্যালেসটা তখন চম্‌কে চম্‌কে উঠছে রঙনার পায়ের আঘাতে। চঞ্চল হয়ে উঠছে রক্ত, ভেঙে ভেঙে পড়ছে আভিজাত্য।

ওই উদয়সাগরের স্থির নিশ্চল জল পেরিয়ে ওপারের বড় কেল্লাটার কোঠরে কোঠরে আরো কয়েক শো জোড়া চোখ এদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

নাচ আমরা অনেক দেখেছি মহারাণা। কিন্তু ঢোলকের ঢুল্‌কি তালে তালে নেচে মনকে বিকল করে দেওয়ার এমন নাচ দেখে আগে আর কখনও এমন করে আত্মহারা হইনি।

একটার পর একটা নাচ হচ্ছে। যেন নাচের ঢেউ, নাচের মালা।

মালার মত এ-নাচের ছন্দের ফুল জড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে। এ-নাচ যে দেখে তার কাজ ভুল হয়ে যায়, কর্তব্য ভুলে যায়, জীবন-মৃত্যু-হাসি-কান্না-সংসার-পৃথিবী সব কিছু ভুলে আত্ম-নিবেদন করে পরিত্রাণ পেতে ইচ্ছে করে।

—তুমি চেয়ে থাকো চমন। তুমি যত চেয়ে থাকবে তত আমি জোর পাবো মনে।

—এই তো চেয়ে আছি রঙনা।

—তুমি দেখতে পাচ্ছো ?

—বা রে, তুমি আমায় চোখ দিয়েছো, আমি দেখতে পাবো না ? তুমি বলছো কী ?

—যতক্ষণ আমি নাচবো ততক্ষণ তুমি চেয়ে থাকবে। তুমি চেয়ে না থাকলে আমি নাচ কাকে দেখাবো।

ইনাম এলো নাচের শেষে।

মহারাণা স্বরূপ সিংএর পূর্বপুরুষের সগর্ব-সঞ্চিত ঐশ্বর্য। তিলে তিলে জমে-ওঠা সম্পত্তি। তারই একটা কণা।

মহারাণা নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন রঙনার গলায়।

—পরো চমন, পরো। এ তো তোমারই।

—আমাকে কি এ মণিহার মানাবে রঙনা। তার চেয়ে তুমিই পরো।

রঙনা হাসলো—বা রে, তুমি আমি কি আলাদা নাকি? তুমি যে কী!

মহেশ্বরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলে—মহারাণাকে খুশি করবার জন্যে আরো নাচতে পারে রঙনা—

স্বরূপ সিং বললেন—অনেক পরেশানি হবে, থাক—

মহেশ্বরপ্রসাদ নিবেদন করলে—না হুজুর, রঙনা আপনার গোলাম, পরেশানি হবে না। আরো যদি হুকুম হয় হুজুরের তো রঙনা আরো নাচতে পারে—

একজন শেঠজী পাশে বসে এতক্ষণ নাচ দেখছিল। শেঠজী বললে—দড়ির ওপরেও নাচতে পারে নটনী—

—রসি?

—হ্যাঁ, দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নাচবে। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত।

—তো তাই নাচো। ওই নাচই হোক—

চমনের মুখে-চোখে যেন আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে এলো।

বললে—না না, তুমি নেচো না রঙনা, নেচো না—

রঙনা হাসলো।

মহেশ্বরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলে—হাসছিস কেন বেটি?

রঙনা বললে—না গুরুজী, এমনি—

—ভয় পাচ্ছে বুঝি তোর?

রঙনা বললে—ভয় পাবে কেন গুরুজী? তুমি তো আছো?

—হ্যাঁ, আমি তো আছিই, ভয় কী তোর?

সব ব্যবস্থাই হলো তখন। প্রথমে বেশি দূর নয়, এই অলিন্দের খিলেন থেকে ওই অলিন্দ পর্যন্ত। মাটি থেকে সাত হাত উঁচু।

রঙনা ওপরে উঠেছে। মহেশ্বরপ্রসাদ ঢোলের পিঠে চাঁটি দিয়ে বোল্ তুললো। আর সঙ্গে সঙ্গে নটনীর দল গান গেয়ে উঠলো তালে তালে।

রঙনা তখন দড়ির ওপর নাচছে।

—খুব হুঁশিয়ার রঙনা। খুব হুঁশিয়ার!

—তুমি এত ভাবছো কেন? এ কি নতুন?

—নতুন নয়, কিন্তু আমার তো বরাবরই ভয় করে!

রঙনা বললে—তোমার কোনও ভয় নেই, আমার কিছু হবে না, দেখো। এই দেখ, আমি কেমন নাচছি। গুরুজীর ঢোলের তালে তালে আমি বোল্ তুলছি। এই দেখ, আমার হাত কাঁপছে না, আমার পা কাঁপছে না, আমার বুক কাঁপছে না—

যখন নিচেয় নামলো রঙনা, তখনও চমন তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

—কী দেখছো অমন করে চমন?,

—আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ, কেমন ভয় পেয়েছিলাম আমি। তুমি যদি পড়ে যেতে!

—তাই কখনও পড়ি? তুমি পাহারা দিয়ে রয়েছো, পড়বো কী করে! আমি তো কোনও দিকে দেখিনি, শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়েছিলাম সারাক্ষণ!

সামনে স্বরূপ সিংএর মুখ তখন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চারদিকে তারিফ, চারদিকে খাতির। যত তারিফ পায় রঙনা তত খুশি হয় মহেশ্বরপ্রসাদ। এ তারিফ তো শুধু তার একলার নয়। এ তারিফ তাদের সকলের। গুরুজী তাদের নাচ শিখিয়েছে, গান শিখিয়েছে। তাই রঙনার সম্মানে সকলের সম্মান।

উদয়পুরের মহারাণারা আগেও নট্নীদের নাচের তারিফ করেছে, আগেও কত ইনাম দিয়েছে, ইজ্জৎ দিয়েছে। এ কিছু নতুন নয়। কিন্তু স্বরূপ সিং আলাদা প্রকৃতির মানুষ। জগমস্ত্‌ সিং যা বলে তাই-ই

শোনে। তাই এতদিন ডাক পড়েনি রওনার। আর তা ছাড়া কড়ার করে নিয়েছে মহেশ্বরপ্রসাদ যে ইনাম যা তারা পাবে তার হিস্যা দিতে হবে না জগমন্ত্‌ সিংকে। এই কড়ার মানলে তবে আমরা যাবো, নইলে যাবো না।

—রাজী তো?

—হ্যাঁ রাজী!

—কিন্তু কথার যেন খিলাপ না হয়, দেখো বাবা!

পেয়াদা সেই কথাই দিয়ে দিয়েছিল এখানে আসবার আগে।

জগমন্ত্‌ সিংকে চুপি চুপি বললে মহেশ্বরপ্রসাদ—হুজুর, এবার তো নাচ খতম—

জগমন্ত সিং বললে—আগে মহারাণা বলুক খতম, তবে তা খতম হবে! তুমি কী-রকম বে-আক্কেলে লোক হে—

আর বেশি কিছু কথা বললে না মহেশ্বরপ্রসাদ।

আসর তখন জম-জমাট। শেঠজীরা কেউ উঠতে চায় না। মহারাণা স্বরূপ সিং না উঠলে কে আর উঠবে? কার সাধ্যি ওঠবার?

হঠাৎ স্বরূপ সিং বললেন আরো উঁচু দড়ির ওপর উঠতে পারবে ওই নট্‌নী?

—হ্যাঁ হুজুর, খুব পারবে!

—কত উঁচু দড়ির ওপর নাচতে পারবে?

—যত উঁচুতে নাচতে হুকুম হবে হুজুরের।

—তাহলে এক কাজ করো—

বলে আর এক মস্ত মতলোব মাথা থেকে বার করলেন স্বরূপ সিং। ওই যে ওই বড় হাভেলিটা দেখছো কেল্লার ওপর?

—হ্যাঁ দেখছি হুজুর।

—ওই কেল্লার মাথায় যদি দড়ি বাঁধে একটা দিকে, আর এদিকে এই হাভেলির মাথায়, তার ওপরে নাচতে পারবে তোমার নট্‌নী?

বিচিত্র সব খেয়াল। রাণা-মহারাণাদের খেয়ালের যেন আর অন্ত নেই। পোষা বাঘের পিঠে বাঁদর বসিয়ে, তার সঙ্গে হাতীর লড়াই লাগিয়ে দিয়েই আনন্দ! দশতলা বাড়ির ওপর থেকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে নিচের মাটিতে লাফিয়ে পড়ানোতেও আর এক রকমের আনন্দ। উদ্ভট আনন্দের উপকরণ না জোগালে আবার জগমস্ত্ সিংএর চাকরি থাকে না। মোট কথা স্বরূপ সিংকে খুশি রাখতে হবে যে কোন উপায়ে। সহজে খুশি হবার লোক নয় মহারাণারা। আর সেই তখন লড়াই-ফড়াইও নেই যে তাই নিয়েই মেতে থাকবেন!

কী করা যায়?

জগমস্ত সিং মহেশ্বরপ্রসাদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—পারবে তোমার নটনী?

মহেশ্বরপ্রসাদ আবার রঙনাকে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, পারবি তুই বেটি?

রঙনা ভালো করে বিপদের ঝুঁকি ভেবে নিলে।

বললে—তুমি আশীর্বাদ করলে পারবো না কেন গুরুজী?

মহেশ্বরপ্রসাদ জগমস্ত সিংকে জিজ্ঞেস করলে—কী ইনাম পাবো?

জগমস্ত সিং আবার স্বরূপ সিংকে জিজ্ঞেস করলে—ওদের ওস্তাদজী জিজ্ঞেস করছে যদি পারে তো মহারাণা কী ইনাম দেবেন?

স্বরূপ সিং বললেন—তামাম উদয়পুরের আধা দিয়ে দেবো—

—তামাম উদয়পুরের আধা!

—তামাম উদয়পুরকা আধা!

কথাটা নিয়ে গুন্‌গুন্ করে সবাই আলোচনা করতে লাগলো।

উদয়পুরের অর্ধেক! মহারাণার যা খেয়াল, তাতে তো তাও অসম্ভব নয়। জগমস্ত্ সিং মহারাণার মুখের দিকে একবার চাইলে। মহারাণাকে বহুদিন ধরেই চেনে জগমস্ত্ সিং! যাকে যা দেবে বলে মহারাণা তা কড়ায় ক্রান্তিতে দেয়!

—মহারাণা !

চুপি চুপি মহারাণার কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো জগমস্ত্ সিং !

—মহারাণা, আপনি বলছেন কী ? সাঁচ-মুচ আধা উদয়পুর দিয়ে দেবেন নাকি ?

স্বরূপ সিং বললেন—আরে তাই কখনো পারবে নটনী ?

—কিন্তু যদি পারে, তখন ?

মহারাণা বললেন—যদি পারে তো তখন দেখা যাবে। এখন মজাটা দেখ না—

ততক্ষণে মহেশ্বরপ্রসাদ ডিম্-ডিম্ করে ঢোল বাজানো শুরু করে দিয়েছে। নট্নী গুরুজীর সামনে এসে মাথা নিচু করে প্রণাম করলে।

তারপর ?

তারপর কাকে উদ্দেশ্য করে প্রণাম করলে কে জানে। খানিকক্ষণ চুপ করে চোখদুটো বন্ধ করে রইলো। তুমি নেই এখানে। তবু তুমি আছো চমন। তোমার কথাই আমি সারাক্ষণ ভেবেছি, তা জানো ? তুমি নাথদোয়ারে বসে বসে আমাকে আশীর্বাদ করো। জানো, তোমাকে আমি একদিন কত বকেছি। কত অনুযোগ করেছি তুমি আমার দিকে চেয়ে থাকো বলে। আজ তোমার চেয়ে থাকা চোখ-দুটোর কথাই স্মরণ করছি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো চমন। তোমার আশীর্বাদ পেলে আমি আর কাউকে ভয় করি না। কিন্তু কই, তুমি তো সাড়া দিচ্ছো না চমন। আমি তবে কোন্ ভরসায় দড়ির ওপর উঠবো বলো। কে আমাকে পাহারা দেবে। কে আমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবে ? কই, তুমি সাড়া দিচ্ছো না যে ! চমন, তোমার সাড়া না পেলে যে আমি উঠতে পারছি না ওই দড়ির ওপর। তুমিই যে আমার সর্বস্ব !

ডাক্তারবাবু থামলেন।

বললাম—তারপর ?

—তারপর, জীবনে যা কখনও হয়নি, মহেশ্বরপ্রসাদের, তাই-ই হলো। এখানে ভাটেরা এখনও সেইসব গান গায়। ভাট তিলকচাঁদের লেখা সেইসব গান। রঙনা-চমনের গান। আপনি আর কিছুদিন থাকলে একদিন আপনাকে ভাটের গান শুনিয়ে দিতাম। আমাদের বাংলাদেশে যেমন মৈমনসিং-গীতিকাতে মহুয়া-মলুয়ার গান আছে, এদের এখানেও সেই রকম রঙনা-চমনের গান আছে। কোনও লেখা নেই। ভাটের মুখে-মুখে চলে শুধু সেসব গান। আমি শুনেছি। এর পরেরবারে যখন আসবেন, তখন শুনিয়ে দেবো।

বললাম—সে যা হোক, তারপর কী হলো ? রঙনা নাচতে পারলো ?

ডাক্তারবাবু বললেন—শুধু তো নাচা নয়, নেচে ওপর থেকে নাচতে নাচতে সেই দড়ির ওপর দিয়ে এপারে হেঁটে আসতে হবে—

কিষেণগড়ের রাস্তায় তখন শীতকালের মাঝ রাত্রিতে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। কুকুরটা বার-দুই কেঁউ কেঁউ করে চেঁচিয়ে, তারপর কুণ্ডলীটা আরো পাকিয়ে নিয়ে শোবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এবার আর পারলো না। ওপারের চায়ের দোকানটা তখন সবেমাত্র খুলেছে। সেখানে ভোরবেলা থেকে বাসের যাত্রীরা এসে চা খাবে। জয়পুর থেকে যারা ফার্স্ট বাসে আজমীর যাবে, তাদের চা জোগাবে ওই চা-ওয়ালা। তাই ভোর রাত থাকতে থাকতে তাকে উনুনে আগুন দিতে হয়।

কুকুরটা সেইখানে গিয়ে শুলো, একটু আগুন পোয়াবার আশায়।

কিন্তু দোকানীটা তাড়া করেছে—এই, ভাগ ভাগ—

ডাক্তারবাবু বললেন—কত রাত হলো? আজ তো আপনার আর ঘুম হলো না—

বললাম—তা না হোক, রোজই তো ঘুমোই, একটা রাত না-হয় নাই ঘুমোলাম। তবু তো একটা গল্প শুনতে পেলাম—

ডাক্তারবাবু বললেন—লিখবেন নাকি গল্পটা? যদি লেখেন তো আরো একবার রাজস্থানে এসে ঘুরে যাবেন। তাড়াহুড়ো করে যেন পূজো-সংখ্যার কোনো কাগজে লিখে দেবেন না। ওতে কেবল কোনও রকমে পাতা ভর্তি হয়। ভাটদের কাছ থেকে ছড়াগুলো খাতায় লিখে নেবেন। অনেক ভালো-ভালো ছড়া আছে ওদের—

—সে নেবো, আপনি ভাববেন না। কিন্তু তারপর কী হলো, বলুন।

ডাক্তারবাবু বলতে লাগলেন—সেও ঠিক এই রকম শীতকাল। নটনী সকলের শেষে একলিঙ্গনাথের উদ্দেশ্যেও প্রণাম করে নিয়ে দড়ির ওপর উঠলো। ওঠাটা কি সহজ? সেই কেল্লার সিঁড়ি দিয়ে দিয়ে একেবারে চূড়োয় উঠলো। যেখানে উদয়পুরের মহারাণা স্বরূপ সিংএর নিশেন ওড়ে, মানে উদয়পুরের ষ্টেট-ফ্ল্যাগ। সেইখানে নিয়ে গেল রঙনাকে জগমন্ত্‌ সিংএর লোক।

রঙনা নিচের দিকে চেয়ে দেখলে। সব জায়গায় শুধু জল। কেবল জল আর জল। নিচের বৃন্দাবন-প্যালেস আর দেখা যাচ্ছে না। কোথায় সেই মহারাণার দরবার, কোথায় সেই মহারাণা স্বরূপ সিং, আর জগমন্ত্‌ সিং আর কোথায় বা গুরুজী আর তার দলের লোকেরা! শুধু ঢোলকের ঢুলকি তালটা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

—কেন তুমি ওখানে উঠলে রঙনা?

—তুমি কিছু ভেবো না। মহারাণা যে আধখানা উদয়পুর আমাকে দান করে দেবে।

—তুমি মহারাণাকে চেনো না? মহারাণার কথায় তুমি বিশ্বাস করছো রঙনা?

—না না চমন, মহারাণা কি কথার খেলাপ করতে পারে? তাহলে কেন আমি এত ঝুঁকি নিচ্ছি। আমরা তখন খুব আরামে থাকবো চমন। তোমায় কিছু কাজ করতে হবে না। আমি নাচবো আর তুমি বাঁশি বাজাবে!

—কী যে বলো! আমি নাকি আবার বাঁশি বাজাতে পারি!

—খুব পারবে চমন, খুব পারবে! তখন আরো ভালো বাঁশি কিনে দেবো তোমায়।

মহেশ্বরপ্রসাদ তখন প্রাণপণে বোল তুলছে। দুখহরণ ঢোলকে তাল দিচ্ছে ডিম্-ডিম্ করে, হাওয়ায় ছন্দ তুলছে উদয়সাগরের জলের ঢেউতে। ঢেউগুলোও তালে তালে এসে বোল্ তুলছে বৃন্দাবন-প্যালেসের পাথরের ভিতের ওপর।

স্বরূপ সিং ওপরের দিকে চেয়েছিলেন।

জগমন্ত্ সিংও চেয়েছিলেন। সবাই উদ্‌গ্রীব আগ্রহে চেয়েছিল ওপরের দিকে। রঙনা আস্তে আস্তে দড়ির উপর দিয়ে নাচতে নাচতে আসছে।

এসে পড়লো। আর বেশি দূর নেই।

এইবার? এইবার তো অর্ধেক উদয়পুর দিয়ে দিতে হবে নট্‌নীকে।

মহেশ্বরপ্রসাদ আরো জোরে জোরে বোল দিতে লাগলো।

দুখহরণকে বললে—জোরসে বাজাও—জোরসে—

দুখহরণ আরো জোরে বাজাতে লাগলো ঢোলক। উদয়সাগরের ঢেউগুলো আরো দুলে দুলে আঁছাড় খেতে লাগলো বৃন্দাবন-প্যালেসের পাথরের ভিতের ওপর!

জগমন্ত্ আর দেরী করলে না। মুখটা তার কালো হয়ে উঠেছে আতঙ্কে। এখনই যদি নট্‌নীটা দড়ির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছায় তো তখন কি হবে?

মহারাণার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে জগমন্ত সিং। সে-মুখে কোনও আতঙ্ক নেই, কোনও উদ্বেগ নেই। যেন উল্লাসের উচ্ছলতা

সমস্ত মুখখানাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই যে এতবড় উদয়পুর, এর অর্ধেক যে দান করে দিতে হবে একজন নগন্য নট্‌নীকে, তার জন্যে কোনও দুশ্চিন্তার ছায়াও নেই তাঁর মুখে !

আশ্চর্য !

আশ্চর্য হবার মত ঘটনাটাই বটে ! এক অখ্যাত নগন্য নট্‌নী যে এতবড় একটা দুঃসাহসের কাজে অনায়াসে সাফল্য লাভ করলো, তার জন্যে আশ্চর্য হয়নি জগমন্ত সিং। আশ্চর্য হয়েছে স্বরূপ সিংএর অপাত্রে দানের প্রতিশ্রুতি দেখে। অপাত্রই তো বটে ! নট্‌নীরা যে অপাত্র তাতে আর জগমন্ত সিংএর কোনও সন্দেহ ছিল না।

আর উদয়পুরের অর্ধেক চলে গেলে জগমন্ত সিংএর ক্ষমতারও অর্ধেক চলে গেল ! অর্ধেক ক্ষমতা মানে অর্ধেক জীবন। ক্ষমতাই তো জীবন। এই এত প্রতিপত্তির শীর্ষে বসে যে-ক্ষমতার বড়াই আজ করছে জগমন্ত সিং, তা আর তখন থাকবে না। অর্ধেক উদয়পুরের লোক জগমন্ত সিংকে আর সেলাম করবে না। অর্ধেক লোক ভেট পাঠাবে না। অর্ধেক লোকই যদি তাকে অগ্রাহ্য করে তাহলে তার আর অস্তিত্ব রইলো কোথায় ?

হাতের পাশে তরোয়ালটা ছিল, সেটা জোরে টিপে ধরলে জগমন্ত সিং।

তখনও নট্‌নী আসছে। এসে পড়লো বলে ! আর দেরী নেই ! আর খানিক্ষণ পরেই একেবারে এসে হাজির হবে সামনে। এসে দড়ি থেকে নেমে পড়বে আসরের ওপর।

দুখহরণ আরো জোরে ঢোলক বাজিয়ে দিলে।

মহেশ্বর প্রসাদ তখন বোল দিচ্ছে মুখে তা—ধিন্—ধিন্—তা—

কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটলো। সকলে অবাক হয়ে দেখলে। ব্যাপারটা যেন এক নিমেষে ঘটে গেল। প্রথমে চোখকে বিশ্বাস করা গেল না। সবাই চমকে উঠে 'হাঁ' 'হাঁ' করে উঠেছে। কী হলো ? কী হলো ?

কী যে হলো তা সবাই চোখের সামনেই ঘটতে দেখেছে। তবু বিশ্বাস করতে পারলে না।

বললাম—তারপর ?

ডাক্তারবাবু বললেন—কত রাত হলো বলুনতো ? তিনটে বেজে গেছে বোধহয়। আজমীরের ট্রেনটা আসছে দেখছি—

বললাম—ওসব কথা থাক, আমার ঘুম পাচ্ছে না। আপনি বলুন, তারপর কী হলো ?

ডাক্তারবাবু বলতে লাগলেন—একটা জাত যখন ক্ষেপে যায়, তখন বুঝতে হবে কোথায় সত্যিই একটা অন্যায় ঘটেছে। রাজস্থানের একটা গৌরব একটা ঐতিহ্য ছিল এককালে। সে ঐতিহ্য বীরত্বের ত্যাগের। সেই ঐতিহ্যের জন্যেই ইণ্ডিয়ার ইতিহাসে রাজস্থানের অত সুনাম। রাণা প্রতাপের নাম কে না জানে বলুন ?

কিন্তু আবার তারই পাশে পাশে আছে মানসিংহ। রাজস্থানের যে সব রাণা স্বার্থের জন্যে মোগল বাদশাহদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তারা আবার এখানকার কলঙ্ক। তারা রাজস্থানের লোক হলেও রাজস্থানীরা তাদের কথা স্মরণ করে না। এই নট্‌নীরা, যাদের আজকে আমার ডিস্‌পেনসারিতে দেখলেন, ওরা রাণা প্রতাপের নাম করে। রাজস্থানের বীরদের ওরা এখনও পুজো করে। ভাট তিলকচাঁদের ছড়া গান করে। কিন্তু রাণা মানসিংহের কথা ওদের জিজ্ঞেস করুন, ওরা চুপ করে থাকবে।

আমি বললাম—তারপর কী হলো বলুন ? ইতিহাসের কথা পরে শুনবো—

ডাক্তারবাবু বললেন—ইতিহাসও তো গল্প। আপনারা যা লেখেন তাও তো ইতিহাস। দু'শো বছর পরে যখন কেউ এই সময়কার

ইতিহাস জানতে চাইবে তখন আপনাদের ওই গল্প উপন্যাসগুলোই তো পড়বে। তখন বিচার হবে দু'শো বছর আগের মানুষ কী ভাবতো, কী কল্পনা করতো, কী স্বপ্ন দেখতো। আজ যদি স্বরূপ সিংএর আমলের কোন উপন্যাস গল্প পাওয়া যেত তো জানতে পারা যেত কেন সেদিন জগমন্ত্ সিং স্বরূপ সিংএর মন্ত্রী হয়ে এতবড় ট্রেচারী করলে।

বললাম—কী ট্রেচারী করলে জগমন্ত্ সিং ?

—সেই কথাই তো বলছি। কিন্তু তার আগে চমনের কথা বলে নিই। নাথদোয়ারার একটা মহল্লায় তখন চমন চুপ করে বসে ছিল। নট্‌নীর দল সবাই চলে গেছে উদয়পুরে। মহল্লা ফাঁকা। একটা লোক নেই যে তার সঙ্গে কথা বলে চমন !

তবু নিজের মনেই একবার ডাকলে—রঙনা—

—এই তো আমি ! তুমি আমার দিকে চাও—

—আমি যে অন্ধ ! চাইবো কী করে ?

—বাইরের চোখ দুটোই কি বড় ? আমি যে দেখতে পাচ্ছি তুমি আমার দিকেই চেয়ে আছো—তুমি দেখতে না পেলে কি আমি এত উঁচুতে উঠে উদয়সাগর পার হতে পারছি ? তুমিই তো আমার সাহস দিয়েছো চমন !

—কিন্তু আমার যে ভয় করে !

—ভয় আর করো না। আমি থাকতে তোমার ভয় কিসের ? আমি যে তোমার জন্যে ইনাম নিয়ে যাচ্ছি উদয়পুর থেকে। ইনাম নিয়েই চলে যাবো তোমার কাছে। বেশী দেরী করবো না।

ভাট তিলকচাঁদ তার ছড়ায় এই জায়গাটা বেশ করুণ করে লিখে গেছে।

নট্‌নীরা যখন ভাট তিলকচাঁদের ছড়াগুলো গায়, তখন যারা আসরে বসে থাকে, তাদের চোখ দিয়ে জল পড়ে।

—আমার যে বড় একলা একলা লাগছে রঙনা।

—একটু একলা-একলা লাগা ভালো। আমারও বড় একলা-একলা লাগছে।

—তুমি দূরে থাকলে আমার সব ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

—আমারও তো ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

—এবার সাদি হয়ে গেলে তুমি যেখানে যাবে, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

—তুমি সঙ্গে না এলে আমি আর কোথাও যাবোই না।

—আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও থাকতে পারব না।

—জানো তুমি; যখন আগে আমার দিকে চেয়ে থাকতে, আমার ভালো লাগতো।

—তাহলে তুমি আমাকে চেয়ে থাকতে বারণ করতে কেন? আমাকে বকতে কেন?

—তোমাকে পরীক্ষা করতাম।

—আমি কিন্তু ভাবতাম, তুমি আমায় মোটে পছন্দ করো না—

—এবার তো বুঝেছো?

—খুব বুঝেছি। বুঝেছি বলেই তো তোমার জন্যে এত ছটফট করি। তোমাকে ছাড়া একদণ্ড থাকতে পারি না।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ চমন যেন সব দেখতে পেল। ভয়ে আঁতকে উঠলো। কই? তুমি কোথায় গেলে? কোথায় তুমি? তোমাকে যে দেখতে পাচ্ছি না রওনা। আমার চোখ কি আবার খারাপ হয়ে গেল? আমি কি আবার অন্ধ হয়ে গেলাম? সব যে অন্ধকার! কোথায় গেলে তুমি? রওনা—রওনা—রওনা—

ঠাকুর-মহল্লায় আশেপাশে যারা ছিল, তারা দুখহরণের ঘরের ভেতরে চমনের কান্না শুনতে পেয়েছে। শুধু কান্না নয়, যেন আর্তনাদ। সবাই দৌড়ে এলো। কী হয়েছে চমন? কী হলো রে তোর?

চমনের সেই আর্তনাদ নাথদোয়ার পেরিয়ে একেবারে উদয়পুরে উদয়সাগরে এসে হাজির হয়েছিল।

চমনের আর্তনাদের সঙ্গে মহেশ্বরপ্রসাদের আর্তনাদও সেদিন সচকিত করে দিয়েছিল সমস্ত উদয়সাগরকে। উদয়সাগরের চলকে ওঠা জলও যেন একই সুরে আর্তনাদ করে উঠেছিল সেদিন। সেদিন সেই সন্ধ্যের আকাশে ,বাতাসে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সকলের আর্তনাদ অশরীরী আত্মা হয়ে সমস্ত উদয়পুরকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

কিন্তু সেদিন স্বরূপ সিং কি তখনও জানতে পেরেছিল যে তারই একটা কথার জন্যে নট্‌নীদের সম্প্রদায়ে এতবড় একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে?

সত্যিই সেদিন সে-আসরে যারাই বসেছিল, তারা সেই বিপর্যয় দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

মহেশ্বরপ্রসাদ চিৎকার করে উঠলো—এ ভুষমণি—এ বিলকুল ভুষমণি—

স্বরূপ সিং আত্মসংবরণ করে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর জগমন্ত সিংএর দিকে তাকালেন।

জগমন্ত্‌ সিংকে কাছে ডাকলেন—জগমন্ত্‌ সিং—

সামনের উদয়সাগরের জলের ওপর তখন ঢেউগুলো ফুলে ফুলে উঠছে রাগে অভিমানে ক্ষোভে আর যন্ত্রণায়।

ঠিক নাচতে নাচতে এসে যেখানে নটনী জলের ওপরে পা ফস্‌কে পড়ে গিয়েছিল, সেখানে কিছুক্ষণের জন্যে যেন একটা বোবা বিস্ময় স্তব্ধ হয়ে ফুলতে লাগলো অকারণে। আর তারপর সব বিপর্যয় জলের লেখায় ধুয়ে-মুছে একাকার হয়ে গিয়ে বিলীয়মান সূর্যের লাল আভায় রক্তাভ রক্তের আভরণে ঢেকে গিয়েছিল।

—জগমন্ত্‌ সিং—

—জী রাণাসাহেব।

—উদয়পুরের অর্ধেক ও নট্‌নীকেই দিতে হবে। আমি কথা দিয়েছিলাম। ওর দলিল-দস্তাবেজ তৈরি করো।

—কিন্তু নট্‌নী তো উদয়সাগর পার হতে পারেনি রাণাসাহেব!

—পারেনি সে তো তোমারই জন্যে জগমন্ত্‌ সিং—

—কেন রাণাসাহেব, আমি কী করলাম?

—আমি দেখতে পেয়েছি, যখন নট্‌নী দড়ির ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে এই বৃন্দাবনপ্রসাদের দিকে আসছিল, তুমি তোমার ভোজালি দিয়ে দড়ির গোড়াটা কেটে দিয়েছো। দড়ি কেটে না দিলে নট্‌নী এপারে চলে আসতো। ওদের অর্ধেক উদয়পুর দিতেই হবে। দলিল বানাও এখনি।

কিন্তু ওদিকে নটনীর দল তখন সবাই রঙনাকে খুঁজছে।

বিরাট পরিধি উদয়সাগরের। কোথায় খুঁজে পাবে তাকে? জলের স্রোতের তলায় তলিয়ে তখন সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

সারা রাত সন্ধান চললো সেদিন। ভোরেও সন্ধান চললো। উদয়পুরের স্বরূপ সিংএর হুকুমে রাজার ডুবুরিরা নামলো জলে। তারাও খুঁজলো।

শেষ পর্যন্ত অনেক দূরে উদয়সাগরের উত্তর-পূর্ব কোণে দেখা গেল রঙনার নিষ্প্রাণ দেহটা পাথরের শ্যাওলাতে গা এলিয়ে দিয়ে ঝুলছে।

দলবল নিয়ে মহেশ্বরপ্রসাদ চলে যাবার চেষ্টা করছে। সব শেষ। সব আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে তাদের। সেই সর্বস্বটুকুকে চিরকালের মত খুইয়ে তারা চলে যাচ্ছে উদয়পুরের অতিথিশালা থেকে।

হঠাৎ হুকুম এলো রাজ-দরবার থেকে। মহারাণা তলব দিয়েছেন মহেশ্বরপ্রসাদকে।

—কেন? আবার তলব কেন?

—স্বরূপ সিংজী একটা দলিল দেবেন মহেশ্বরপ্রসাদকে।

—কীসের দলিল?

—তা জানি না। আপ চলিয়ে!

মহেশ্বরপ্রসাদ যখন স্বরূপ সিংএর দরবারে পৌছুল, তখন সব তৈরি। দলিল-দস্তাবেজ সীলমোহর করা হয়ে গেছে। নিজের হাতের সই করে দিয়েছে মহারাণা স্বরূপ সিং!...আমি অর্ধেক উদয়পুর পরলোকগতা নট্‌নী রঙনার উত্তরাধিবর্গকে বংশ-পরম্পরায় ভোগ-দখল করিবার অধিকার দিলাম। ইত্যাদি ইত্যাদি...

—এইটে তুমি নাও মহেশ্বরপ্রসাদ। তোমার মেয়ের মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। কিন্তু তবু আমার জবান্ আমি রাখছি। জগমন্ত সিং আমার মন্ত্রী, সে দড়ি কেটে না দিলে তোমার মেয়ে ঠিক এপারে পৌছোতে পারতো।

মহেশ্বরপ্রসাদ রাগে মনের মধ্যে গজরাতে লাগলো। বাইরে কিছু প্রকাশ করলে না।

স্বরূপ সিং আবার বললেন—নাও, এ দলিল নাও—

মহেশ্বরপ্রসাদ এবার হঠাৎ ফেটে পড়লো যেন।

বললে—না—

স্বরূপ সিং বললেন—কেন, নেবে না কেন? আমি তো নিজের ইচ্ছাতেই দিচ্ছি—

মহেশ্বরপ্রসাদ পাথরের মত সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বললে—না, আমরা বেইমানের দান নিই না—

—বেইমানের দান! বলছো কি তুমি মহেশ্বরপ্রসাদ? আমি বেইমান?

বললে—বেইমানের শুধু দানই নেবো না, তা নয়। বেইমানের জলও খাবো না আমরা। যতদিন একজন নট্‌নীও বেঁচে থাকবে, ততদিন উদয়পুরের দশ মাইল চৌহদ্দির মধ্যে কেউ আসবে না। উদয়পুরের জল, উদয়পুরের হাওয়া নটনীদের কাছে বিষ বলে জ্ঞান করবো।

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে মহেশ্বরপ্রসাদ। দলবল নিয়ে উদয়পুর ছেড়ে সেইদিনই চলে গেল।

স্বরূপ সিং কথাগুলো শুনলেন শুধু কান পেতে কোনও প্রতিবাদের ভাষা আর তাঁর মুখ থেকে বেরোয়নি সেদিন।

ভাট তিলকচাঁদের গানে সেই রকমই লেখা আছে।

বললাম—তারপর ?

ডাক্তারবাবু বললেন—সেই তিনশো বছর আগেকার এ ঘটনা এখনকার নট্‌নীরা আজও গান গেয়ে গেয়ে শোনায় সকলকে। সেই যে তারা সেদিন উদয়পুর ছেড়ে নাথদোয়ার ছেড়ে চলে এসেছে, তারপর আর ফিরে যায়নি। স্বরূপ সিংএর পর কত রাণা এসেছে—গেছে, কিন্তু কেউই আর নট্‌নীদের এই সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি। কত বড় বড় শেঠজী এদের নিয়ে কত জায়গায় যায়। দিল্লী যায়, বোম্বাই যায়. প্যারিস, আমেরিকায় নিয়ে যায় ফুর্তি করবার জন্যে। সব জায়গাতেই তারা যায় একসঙ্গে। কিন্তু লাখ লাখ টাকার লোভ দেখালেও তারা উদয়পুরে আর যাবে না। সেই যে একদিন বেইমানি করে একজন নট্‌নীকে মেরে ফেলা হয়েছিল, সে বেইমানির কথা এখনও ওরা ভুলতে পারেনি!

কিন্তু উদয়পুর এখন আর সে উদয়পুর নেই। এখন নেটিভ স্টেটের রাজাদের স্টেট কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন তাদের 'প্রিভি-পার্স' থেকে সামান্য কিছু মাসোহারা দেওয়া হয় মাত্র। এখন উদয়-পুরের মহারাণা বৃন্দাবন-প্যালেসটাকে হোটেল করে দিয়েছে। দিনে একখানা কামরার জন্যে দু'শো তিনশো টাকা চার্জ দিয়ে যারা থাকতে পারে, তারাই সেই হোটেলে ওঠে।

এই সেদিন কুইন্ এলিজাবেথ এসেছিল, গ্রীসের রানী এসেছিল। সবাই উঠেছিল ওই প্যালেসে। ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের গেস্ট ছিল ওরা।

কিন্তু ওরাও শুনেছে মাঝরাত্রে উদয়সাগরের বুক থেকে যেন হু হু করা কি-রকম একটা আর্তনাদ কানে আসে। কে আর্তনাদ করে, কে অমন করে কাঁদে, তা কেউ জানে না। কেউ বুঝতে পারে না।

কিন্তু ভাট তিলকচাঁদ লিখে গেছে—চমনের অশরীরী আত্মা ওই উদয়সাগরের চারপাশে নাকি কেবল ঘুরে বেড়ায়। সে একদিন অসহায় হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। অন্ধ মানুষ। কিন্তু কোথায় যে গিয়েছিল সে, কী হয়েছিল তার, তার আর কোনও খোঁজ কেউ পায়নি। উদয়সাগরের বুকের ওপর মাঝরাত্রের ওই শব্দটা শুনে অনেকে কল্পনা করে নেয়, ও চমন। ও চমনেরই অপরিতৃপ্ত আত্মা। চমনের আত্মাই ওই উদয়সাগরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে রঙনাকে খোঁজে। খোঁজে কিন্তু পায় না। আর পায় না বলেই হাহাকার করে ওঠে। তার সেই আর্তনাদ হাহাকার হয়ে উদয়সাগরকে তোলপাড় করে তোলে মাঝ রাত্রের অন্ধকারে।

হঠাৎ ডাক্তারবাবুর খেয়াল হলো যেন।

বললেন—ইস্ একেবারে ভোর হয়ে গেছে। কিছু খেয়ালই ছিল না। ওই দেখুন, আজমীরের এক্সপ্রেসটা যাচ্ছে।

আমি কিন্তু তখনও সেই নটীর গল্পটাতেই মশগুল হয়ে আছি

পঞ্চমী

আমাদের পাড়ার এস, এন, রায়ের কাহিনী আপনাদের বলিনি। সত্যনাথ রায়? জার্ডিন হেণ্ডারসন কোম্পানীর বড়বাবু। সাড়ে সাতশো টাকা মাইনে পাচ্ছিলেন। তারপর গাড়ি ছিল কোম্পানীর। বাড়ি থেকে অফিসে নিয়ে যাবার জন্যে কোম্পানীর গাড়ি আসতো বাড়িতে। সেই এস, এন, রায় আঠারো বছর একাদিক্রমে চাকরি করবার পর হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিলেন একদিন। ভাবলেন কোম্পানীর অফিসে সাড়ে সাতশো টাকার মাইনের চাকরি করে সময় নষ্ট করছেন। এর চেয়ে অনেক বেশী পয়সা আসতো ব্যবসা করলে। সেই এস, এন, রায় চাকরি ছেড়ে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা নিয়ে শেয়ার মার্কেটে ঢুকলেন। তিন বছরের মধ্যে সমস্ত টাকাটা নষ্ট করে শেষে আবার ঢুকলেন গিয়ে সেই একই অফিসে। একই অফিসে আবার নতুন করে আরম্ভ করলেন চাকরি। মাইনে হল ষাট টাকা মাসে।

এ আমার দেখা।

তারপর আমার ন-মাসিমার গল্পও বলিনি আপনাদের। মেসোমশাই বাড়ি করেছিলেন মারা যাওয়ার আগে। বিধবা হবার পর ন-মাসিমা সেই পঁচিশ হাজার টাকার বাড়িটি চল্লিশ হাজার টাকায় বিক্রি করে ভাবলেন বুঝি খুব লাভ করেছেন। পাঁচ বছরের মধ্যেই সেই চল্লিশ হাজার টাকা ফুঁকে দিয়ে আবার নিজের বাড়িতে এলেন ভাড়াটে হয়ে। নিজের বাড়িরই দু-খানা ঘরের জন্যে ভাড়া দিয়ে গেলেন ষাট টাকা সারা জীবন। মরবার শেষ দিনটি পর্যন্ত।

এ আমার দেখা!

আর শুধু কি এস, এন, রায়, ন-মাসীমা! কত লোককে কত রকমভাবে দেখেছি। মঙ্গল যতক্ষণ মকরে থাকে ততক্ষণ মঙ্গলই ঘটায়, কিন্তু মকর থেকে সঞ্চার করলেই কেমন করে যে সব দিকে অমঙ্গল

ঘটতে থাকে কে জানে। আবার সেই মঙ্গলই যখন ঘুরে বক্রী হয়ে যায় তখন যে কেমন করে মঙ্গল-অমঙ্গল সব ওলোট-পালোট হয়ে যায় তা আমি বলতে পারি না। ওসব রাশি গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে আমার কারবারও নয়। আমি শুধু সরস্বতীয়ার কথা জানি, সরস্বতীয়ার গল্প বলতে পারি। সরস্বতীয়ার গল্প বললেই তাবৎ পৃথিবীর সব মানুষের গল্প বলা হবে বলে বিশ্বাস করি।

সত্যি, যতবার নিজের চোরাবালিতে নিজে আটকে পড়ে পালাবার পথ খুঁজেছি কিন্তু পালাতে পারিনি, ততবারই সরস্বতীয়ার কথা মনে পড়েছে! আবার যতবার পালিয়ে গিয়ে নিজেরই গড়া চোরাবালিতে এসে আটকে গিয়েছি, ততবারই সরস্বতীয়ার কথা মনে পড়েছে। আমাদের পাড়ার এস, এন, রায়কে দেখেও মনে পড়েছে সরস্বতীয়াকে, আবার আমার ন-মাসিমাকে দেখেও মনে পড়েছে সরস্বতীয়াকে। সত্যি এক-একবার আজও মনে হয়, হয়তো আমরা—এই সব মানুষেরাই বুঝি কদমকুঁয়ার ছেদি প্যাটেল-এর বউ সরস্বতীয়া।

ছেদি প্যাটেলও বলতো—সাহেব, আপনিই বলুন, সরস্বতীয়া আমার বউ কি না বটে?

আমি বলতাম—হ্যাঁ ছেদি প্যাটেল, সরস্বতীয়া তোমার বউ-ই বটে—

ছেদি প্যাটেল বলতো—আমি সরস্বতীয়ার বাপকে পাঁচ কুড়ি টাকা দিয়েছি কি না বটে?

আমি বলতাম—তা তুমি কি আর মিথ্যে কথা বলতে যাবে ছেদি প্যাটেল।

ছেদি প্যাটেল তখন বলতো—তাহলে সাহেব, সরস্বতীয়া আমার বিছানায় শোবে না কেন বলুন?

এর পরে আমার আর বলবার কিছু থাকতো না।

সরস্বতীয়া যখন একলা থাকতো আমাকে বলতো—তুমি কার দলে সাহেব, আমার দলে না উ-ওর দলে!

আমি বলতাম—আমি তোমার দলে সরস্বতীয়া !

কথাটা শুনে সরস্বতীয়া সে-ও খিল্‌খিল্‌ করে হেসে গড়িয়ে পড়তো।

সরস্বতীয়া বলতো—আমার মরদ তোমাকে সাহেব বলে, আমিও তোমাকে সাহেব বলে ডাকবো কি বল ?

বলতাম—আমি বাঙালী !

সরস্বতীয়া বলতো—তবে তুমি আমার মরদের মত ধুতি কাপড় পর না কেন ?

বলতাম—কাপড় পরে কি শিকার করা যায় ? বনে জঙ্গলে বাঘ-শূয়োরের পেছনে ঘুরে বেড়াই, কাপড় পরলে কি চলে ?

সরস্বতীয়া বলতো—আমাদের চানা ক্ষেতে হরিণ আছে সাহেব—দেখবে ?

বলতাম—তোমাকে দেখাতে হবে না—আমার রামসহায় আছে—

সত্যিই আমার লোকের অভাব ছিল না। কদমকুঁয়ার রামসহায় ছিল আমার শিকারের প্রধান সহায়।

রামসহায়ই আমাকে খবর দিয়েছিল, কদমকুঁয়ায় গেলে শিঙেল হরিণ, ব্ল্যাক্‌-বাকের অভাব হবে না। রামসহায় না বললে আমি কদমকুঁয়ায় যেতামই না। আর কদমকুঁয়াতে না গেলে ছেদি প্যাটেলের বউ মুরলীকেও দেখতে পেতাম না আর তার দ্বিতীয় পক্ষের সরস্বতীয়াকেও দেখতে পেতাম না।

সরস্বতীয়া আমার হাতে চায়ের কাপ দিয়ে বলেছিল—তখন যে বড় তুমি হাসছিলে সাহেব ?

বললাম—তোমাকে দেখে !

সরস্বতীয়া ভয়ে আমার কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে নিজের সর্বাঙ্গ ভাল করে দেখতে লাগলো। বছর সতেরো-আঠারো বয়সের সরস্বতীয়া, নিজের দৃষ্টি দিয়ে কী খুঁজতে লাগলো কে জানে ? তার শরীরের কী দেখে যে আমি হেসেছি তাই বোধ হয় খুঁজতে লাগলো সরস্বতীয়া। কিন্তু খুঁজে-খুঁজে কিছুই না পেয়ে আমার দিকে তাকালো ভয়ে ভয়ে।

ভয় সাধারণতঃ পায় না সরস্বতীয়া। ভয় পাবার মেয়েই নয়। কদমকুঁয়া থেকে রাজনন্দগাঁর বাপের বাড়ি পর্যন্ত সাত মাইল পথ রাত তুপুরেও চলে যেতে পারে একলা—এত সাহস।

বলতাম—যদি কেউ ধরে?

সরস্বতীয়া বলতো—আমাকে ধরে কী নেবে? আমার কী আছে? আমার তো গয়না নেই!

সরস্বতীয়ার যে নেবার অনেক কিছুই আছে সে-কথা সরস্বতীয়াকে বোঝানো তুষ্কর।

সেই প্রথম দিনই অনেকক্ষণ আলাপ করে সরস্বতীয়া যেন ঘরোয়া করে নিয়েছিল আমাকে। কদমকুঁয়ায় জীবনে কখনও আসিনি। কদমকুঁয়ার নামই শুনিনি জীবনে। আর কদমকুঁয়ায় যে হরিণ পাওয়া যায়—তাই-ই কি আমি জানতাম! ছেদি প্যাটেলকে আমি বিলাসপুরে থাকতেই চিনতাম—কিন্তু কদমকুঁয়ায় না এলে সরস্বতীয়াকে তো দেখা হতো না। আর সরস্বতীয়াকে না দেখলে যেন জীবনের অনেকখানি দেখা আমার বাকি থেকে যেত? মধ্যবিত্ত, অল্পবিত্ত, অভিজাত—কত রকম সমাজের কত রকম মেয়েদের দেখেছি। তারা হাসে, খেলে, সংসার ভাঙে। সিনেমায় উপন্যাসে নাটকে আর পাঁচজন মেয়ে যেমন করে আচরণ করে তারা তেমনি। সরস্বতীয়া সত্যিই আলাদা।

আর আলাদা না হলে কি গল্প লিখতে ভালো লাগে?

বুড়ো ডি-কষ্টা সাহেবই একদিন আমায় প্রথম কদমকুঁয়ার নামটা বলে।

আমি তখন বিলাসপুরে। রেলের ঘুঁষ ধরবার চাকরি আমার! দিন রাত কেবল ঘুরে বেড়াই ঘুঁষখোরের খোঁজে।

হাতে অনেক সময়। সময় কাটাবার একটা উপায় হিসেবে বন্দুক কিনেছিলাম।

আশেপাশে বন-জঙ্গল আছে। পেন্ড্রারোডে অমরকণ্টকে গেলে সম্বর, চিতা, ব্ল্যাক-বাক মেলে, টিলডায় গেলে হরিণ মেলে এ-সব জানতাম। ডি-কষ্টা সাহেব এককালে শিকার করতো। এখন বুড়ো হয়ে গেছে। বিলাসপুরে বাড়ি-ঘর-দোর করে স্থিতু হয়েছে। এখন চোখের দৃষ্টি আর নেই—এখন শুধু আমাকে শেখায়। আর শিকার করে আসার পর আমার মুখে গল্প শুনে শিকারের খিদে মেটায়।

ডি-কষ্টা সাহেবই প্রথমে বলেছিল—গো টু টিল্ডাম্যান—টিল্ডায় যাও ভাই—যদি হরিণ মারতে চাও—দেয়ার আর লট্স্—

এর পরেই রামসহায়। আমার আর্দালীর ভাই রামসহায়। তারও টিল্ডায় বাড়ি।

বলেছিল—হুজুর, আপনার কোনও ভাবনা নেই, আমার বাড়িতে থাকবেন আর শিকার করবেন—

তাই ঠিক ছিল। রামসহায়ের বাড়ি যাবো ফোর্টিন আপে। ফোর্টিন আপ টিল্ডা স্টেশনে পৌঁছোয় সন্ধ্যে নাগাদ। সেখান থেকে রামসহায়ের বাড়ি দু-মাইল পথ। সন্ধ্যে নাগাদ খাওয়া-দাওয়া সেরে জঙ্গলে ঢুকবো। তারপর যেমন সুবিধে হয় তেমনি করা যাবে।

কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে সব উল্টে গেল।

বোধহয় তখন সন্ধ্যে হয় হয়। টিল্ডা স্টেশনে নেমে সোজা পশ্চিমমুখো গিয়ে লেভেল ক্রসিং-এর গেট।

দেখি গেটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ পাখা নিয়ে আমাদের বিলাসপুরের ছেদি প্যাটেল।

বললাম—ছেদি প্যাটেল, তুমি ?

ছেদি প্যাটেল আমাদের বিলাসপুরের লোক। আগে বিলাসপুরের লেভেল ক্রসিং-এর গেটে চাকরি করতো। বিলাসপুরে অনেক গাড়ি। চুচিয়াপাড়ার ছোট্ট গেটটাতে লাল আর সবুজ পাখা নিয়ে অনবরত সে পাহারা দিত। আর পাশেই ছিল তার ঝুপড়ি।

আমাকে অনেকদিন বলেছে—পেলেটিয়ার সাহেবকে বলে আমাকে

একটু বদলি করিয়ে দিন না সাহেব—আমার তাহলে বড় কিফায়েৎ হয়—

বলেছিলাম—কিসের কিফায়েৎ ?

—আজ্ঞে সাহেব, টিল্‌ডার কদমকুঁয়ায় আমার বাড়ি, ওখানে যদি বদলি হতে পারি তো ক্ষেতি-খামারটা দেখতে পারি—বাড়ির খেয়ে সরকারী নোকরি চালাতে পারি—

তারপর আমাকে ঝুপড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলতো—ওই দেখছেন তো সাহেব, ওইটুকু ঘরে জেনানা-আওরাৎ নিয়ে থাকি—ঘরে মন ভরে না—

ছেদি প্যাটেল লোকটা ভালো। পঁচিশ বছর রেলের চাকরিতে ; একদিন গর-হাজিরি নেই। ঝড় বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম সব মাথার ওপর দিয়ে কাটিয়েছে বুড়ো। কত দিন কত রাত বিলাসপুরে এসেছি গেছি। বম্বে মেল, নাগপুর প্যাসেঞ্জার, মালগাড়ি। আপ ডাউন যে-ট্রেনেই হোক, স্টেশনে আসবার আগে জানালা নিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেছি, ছেদি প্যাটেল গেটটি বন্ধ করে সবুজ পাখাটা নিয়ে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে। এ-দৃশ্য শুধু আমি নয়, আমার মত যারাই বিলাসপুরে এসেছে গেছে, সবাই দেখেছে। সবাই জানতো ছেদি প্যাটেল যখন আছে তখন দুর্ঘটনা ঘটবে না, ঘটতে পারে না ! ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে—রাত অনেক হয়েছে মালগাড়িতে—আসছি—রেলিংটা ধরে ঝুঁকে দেখলাম ছেদি প্যাটেলের সবুজ আলো গার্ড সাহেবের দিকে লক্ষ্য করে অল্প অল্প দোলাচ্ছে।

ডি-কষ্টা সাহেব বলতো—ওই ছেদি প্যাটেল—ঠিক হ্যায়—

ডি-কষ্টা সাহেব ইংরেজী জানতো হিন্দী জানতো আবার ছত্রিশগড়ী ভাষায় কথা বলতে পারতো।

গার্ডের গাড়িটা পাশ দিয়ে যাবার সময় ছেদি প্যাটেল হাত তুলে সেলাম করতো। ডি-কষ্টাও সেলাম, জানাতো আমিও ছেদিকে সেলাম করতাম।

ছেদি প্যাটেল ছিল বিলাসপুরের সবচেয়ে বুড়ো মানুষ।

বলতাম—কত বছর তোমার চাকরি হলো ছেদি প্যাটেল—

ছেদি প্যাটেল বলতো—এক কুড়ি এক বছর সাহেব—

—আর ক-বছর সার্ভিস আছে তোমার ?

ছেদি প্যাটেল বলতো—তা কি জানি সাহেব।

বলতাম—তা তোমার একটা হিসেব নেই ?

ছেদি প্যাটেল বলতো—সাহেব, আমার ছত্রিশগড়ী, আমরা কি লিখিপড়ি করেছি—হিসেব আছে কোম্পানির খাতায়—

বলতাম—কোম্পানী আর নেই ছেদি প্যাটেল, এখন সরকারীরেল হয়ে গেছে, তা জানো ?

ছেদি প্যাটেল বলতো—সরকারী হোক আর যাই হোক আমরা তো এখনও রেল কোম্পানী বলি—

বললাম—এখন এটা সাউথ ইস্টার্ণ রেল হয়েগেছে,তাজানোতো?

ছেদি প্যাটেল বলতো—এসব জানি নে সাহেব, আমরাতোএখনও বি-এ-নার বলি–

ছেদি প্যাটেল ছিল ওই রকম। কোথায় যে দেশ, কবে কে তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে, কতদিন চাকরী করেছে, আর কতদিন চাকরী করবে, কিছুই জানতাম না। শুধু জানতাম লোকটাকে। নীল একটা কোর্তা থাকতো গায়ে, রেলের ইউনিফর্ম। সেই পরেই ডিউটি দিত, আবার সেই পরেই শনিচরি হাটে যেত।

দেখা হয়ে গেলে জিজ্ঞেস করতাম—একি, হাটে কী করতে ছেদি ?

ছেদি বলতো—সাহেব, মছলি কিনবো—

বলতাম—ভালো, ভালো—

একমাস ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছি ঠিক ছুটির পর আবার জয়েন করতে বিলাসপুরে ফিরে যাচ্ছি, দেখি সবুজ পাখা নিয়ে ছেদি—

আমাকে দেখেই গেট থেকে সেলাম করছে।

—এসেছেন বাবুজী ?

রাস্তাতেই দেখা হয়ে গেছে।

—বাল-বাচ্ছা ভালো আছে ? মাইজী ভাল আছে ?

অজস্র কুশল প্রশ্ন করেছে। বাড়ির খবর নিয়েছে, স্বাস্থের খবর নিয়েছে। অথচ আমি তেমন করে কখনও আমল দিইনি ছেদি প্যাটেলকে। তেমন করে কখনও জিজ্ঞেস করিনি কে-কে আছে ছেদি প্যাটেলের। অথচ ছুটিও নেয়নি বোধহয় কখনও।

একবার শুধু বলেছিল—আপনি পেলেটিয়ার সাহেবকে বলে আমাকে বদলি করে দিন না সাহেব—পেলেটিয়ার মানে পি-ডবলু পার্মানেণ্ট ওয়ে ইনস্পেক্টর। ট্রলি করে রেল লাইন তদারক করা তার কাজ। তখন পি-ডবলু-আই ছিল মূর্তি। ভেক্টটরমণ মূর্তি। আমার খুব জানাশোনা। কতদিন ট্রলিতে করে দু'জনে অমরকণ্টকের জঙ্গলে হরিণ শিকার করতে গেছি। শুধু মুখের কথাটা খসালেই কাজ হতো—শুধু বললেই হতো—ছেদি প্যাটেলকে টিল্‌ডায় বদলি করে দিন মিস্টার মূর্তি। শুধু একটা কলমের আঁচড়েই কাজ হয়ে যেত। টিলডার লোক চলে আসতো বিলাসপুরে আর বিলাসপুরের লোক চলে যেত টিলডায়। এ এমন কিছু শক্ত কাজ নয় মূর্তির পক্ষে!

কিন্তু হয়নি। অর্থাৎ আমিই বলিনি।

আর, সবসময়ে কি আমরা অন্য লোকের কথা ভাবি। অন্য লোকের উপকার করবার চেষ্টা করি। কোথাকার কে ছেদি প্যাটেল বিলাসপুরের লেভেল ক্রসিং এর গেট-কীপার—তার কথা মনে রাখবো, এত সময় আমাদের নেই!

সেই ছেদি প্যাটেলকে হঠাৎ টিলডার গেটে দেখে সত্যি অবাক হয়ে গেলাম।

ছেদি প্যাটেলও অবাক হয়ে গেছে।

বললে—সাহেব, আপনি এখানে ?

ছেদি প্যাটেল জানতো আমি ঘুষখোরদের ধরার চাকরি করি। ঘুষ

ধরি আর না-ধরি অন্তত সেই কাজে যে ঘুরে বেড়াই সারাটা সি পি, তা সে জানতো।

জিজ্ঞেস করলে—কোম্পানীর কাজে এসেছেন সাহেব?

আমার হাসি পেল। কোম্পানীর মানে সরকারের। সরকারী কাজ বহুদিন করেছি, সরকারের নিমকও খেয়েছি। এখন আর খাই না। কিন্তু সরকারী কর্মচারীর ওপরঅলারা যে কতকখানি সরকারভক্ত-তার পরিচয় হাড়েহাড়েই বুঝেছি। যারা 'জাতীয় প্রতিষ্ঠান' বলে কথায় কথায় উপদেশ দেন, তাঁরা যে কতখানি দেশভক্ত তার নমুনাও দেখেছি।

কিন্তু সে-প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

বললাম—আমার কথা থাক, তুমি এখানে কবে এলে তাই বলো ছেদি প্যাটেল!

ছেদি প্যাটেল বলল—এখানকার বুধুয়া বিলাসপুরে গেল, আর আমি তার জায়গায় চলে এলাম!

বললাম—কিন্তু কী করে হলো?

ছেদি প্যাটেল যেন ভয়ে পেয়ে গেল একটু।

বললে—আপনি কিছু বলবেন না তো সাহেব?

বললাম—কিছু বলবো না, তুমি বলো—

ছেদি প্যাটেল বললে—অনেক দরখাস্ত করেছিলাম সাহেব, কিন্তু হয়নি। শেষে কেরাণীবাবুকে জলপানি খেতে দিলাম—

—জলপানি!

—হ্যাঁ সাহেব, জলপানি। পেলেটিয়ার সাহেবের কেরাণীবাবুকে এক মাসের তন্‌খা জলপানি খেতে দিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল অর্ডার—

কত সহজে কত শক্ত জিনিসের সমাধান হয়ে যায় সরকারী অফিসে, তা আমার চেয়ে আর কারো ভালো করে জানা ছিল না। তবুও আর একটা ঘটনা জানা হলো।

ছেদি প্যাটেল বললে—টাকা তো নিল কেরানীবাবু, কিন্তু কাজ করে দিয়েছে—কত জায়গায় কত লোককে টাকা দিয়েও যে কাজ হয়নি সাহেব—

ফোর্টিন আপ হুস্‌হুস্‌ করে নাগপুরের দিকে চলে গেল। লেভেল-ক্রসিং এর দুপাশে ঝিঁ-ঝিঁ পোকাগুলো ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। একজোড়া ইস্পাত এধার থেকে ওধার, একেবারে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেন মাটি আঁকড়ে পড়ে রইল। আউটার সিগন্যালের ওপর মাথায় দুটো আলো টিম্‌টিম্‌ করে জ্বলতে লাগলো—একটা লাল আর একটা সাদা।

পরে ওই টিল্‌ডা স্টেশনেই কতবার গিয়েছি। দু-তিন রাত কাটিয়েওছি। কিন্তু সেই প্রথম দিন ছেদি প্যাটেলের সঙ্গে দেখা হওয়ার দিনটা যেন আজো মনের ভেতর অক্ষয় আছে। সেই ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, সেই সিগন্যালের টিম্‌টিমে আলো, সেই মাটি আঁকড়ে থাকা রেল লাইন আর সেই আদি অন্ত ধূ-ধূ করা শূন্যতাময় আবছা অন্ধকার—সে যেন ভোলবার নয়।

সরস্বতীয়া বলতো—ওখানে ভূত আছে সাহেব—

—কোথায় ?

সরস্বতীয়া বলতো—ওই আমার মরদ যেখানে নোকরি করে—

ছেদি প্যাটেলের কাছেও শুনেছি সেই টিল্‌ডা স্টেশনের লেভেল ক্রসিং-এর কাছে একদিন কোন্ একটা প্যাসেঞ্জার কাটা পড়েছিল। চেনা নয় শোনা নয় কে একজন অচেনা অজানা ভদ্রলোক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওই লাইনের ওপর। তারপর ফোর্টিন আপখানা তার ওপর দিয়ে মড়মড় করে মাড়িয়ে চলে গিয়ে খানিকটা দূরে থেমে গিয়েছিল।

সরস্বতীয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—তোমার ভয় করেনি ?

সরস্বতীয়া বলেছিল—আমি তখন কোথায় সাহেব ? আমি তখন রাজনন্দগাঁয় বাপের বাড়িতে—

—তা এখন তো ভয় করে।

সরস্বতীয়া বলতো—ভূত আমায় কী করবে সাহেব। আমার কী আছে যে নেবে ?

সত্যিই তো, ভূত আর সরস্বতীয়ার কী নিতে পারে! ওই আশে-পাশের যত গাঁ, যত গঞ্জ আছে, যত লোক আছে, কেউ সরস্বতীয়ার কিছু ক্ষতি করতে না! কদমকুঁয়ার প্রথম রাতটার কথা আজো মনে আছে। নতুন অপরিচিত জায়গায় শোয়া, নতুন খাটিয়া, নতুন ঘর-দোর—আর দূর জলাজঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছিল। আমার ভালো করে ঘুমই হয়নি। ঘুম না হবারই কথা। আর ঘুমোবার জন্যে আমি যাইওনি। সরস্বতীয়ার কথাই মনে পড়েছিল শুয়ে শুয়ে, ছেদি প্যাটেলের কথাও মনে পড়েছিল। কে জানতো সেই ছেদি প্যাটেল—বিলাসপুরের সেই বুড়ো ছেদি প্যাটেলের এমন সুন্দর বউ! এত ক্ষেতিবাড়ি, এত ক্ষেতি-খামার, এত চানা-ক্ষেত অড়হড়-ক্ষেতি ছেড়ে কি বিলাসপুরের ময়লা ঝুপড়িতে কেউ থাকতে পারে! এতদিন যে থেকেছে এইটেই আশ্চর্য। এত যার পয়সা, অত যার বউ-এর রূপ, সে কেন বিলাসপুরের ধুলোকাদার মধ্যে পড়ে মরবে!

হঠাৎ যেন কোথায় একটা আর্তনাদ উঠলো।

—মেরে ফেললে, মেরে ফেললে গো—মেরে ফেললে!

মনে হলো রেল-লাইনের ওপর সেই মৃত আত্মা বুঝি সজীব হয়ে এই ছেদি প্যাটেলের ঘরের মধ্যেই আর্তনাদ জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু এ তো মেয়েমানুষের গলা। সমস্ত আবহাওয়া যেন অসাড় হয়ে এল সেই চীৎকারে। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি উঠে বসতে চেষ্টা করলাম।

কিন্তু হঠাৎ ছেদি প্যাটেলের গলা শুনলাম।

—পাজি, বদমাইস, হারামজাদি, চিল্লাতা হ্যায়—

বন্দুকটা বিছানার পাশেই। সেটা দিয়ে আস্তে আস্তে দরজাটা খুলতেই সামনে যা দেখলুম—

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

আগে ছেদি প্যাটেলের গল্পটা বলি।

রামসহায় তখন আমার বিছানার বাণ্ডিলটা নিয়ে পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তারও দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার আরদালীর ভাই। সে-ও বাড়ি গিয়ে রান্নার বন্দোবস্ত করবে। সাহেব এসেছে, সুতরাং আমার জন্যে সে মুরগি বানাবে, পরোটা বানাবে। অনেক দিনের সাধ তার যে আমি তারা বাড়িতে গিয়ে উঠি—তার বাড়িতে জুতোর ধুলো দিই।

বললে—চলুন হুজুর, রাত হয়ে আসছে—

ছেদি প্যাটেল বললে—আজ আমার বাড়িতে থাকতে হবে সাহেব—আমি সাহেবের সেবা দেব—

রামসহাযকে বললাম—তোমার বাড়িতে পরে যাওয়া যাবে এতদিন—ছেদি প্যাটেল আমাদের বিলাসপুরের লোক, দেখছো না—এতদিন পরে দেখা—

ছেদি প্যাটেল বললে—হ্যাঁ সাহেব, কত বছর পরে দেখা—

বলে সবুজ পাখাটা ততক্ষণে গুটিয়ে ফেলেছে। গেট-এর পাল্লা দুটো খুলে কিনারার দিকে সরিয়ে দিয়েছে। দু-একটা বয়েলগাড়ি এতক্ষণ গেট খোলার জন্যে অপেক্ষা করছিল—তারাও এতক্ষণে লাইন পেরিয়ে ওপারে চলে গেল।

ছেদি প্যাটেল বললে—আমার বাড়ি বেশি দূরে নয় সাহেব, আমারও ডিউটি খতম—চলুন আমার সঙ্গে—

রামসহায়কে বললাম—তুমি যাও—ভোর রাত্তিরে এসো আবার—

ছেদি প্যাটেল ততক্ষণ আমার মালপত্র রামহায়ের কাছ থেকে কাঁধে তুলে নিয়েছে।

মেঠো পথে আমরা দু'-জন চলেছি তখন। দু-পাশে ক্ষেত।

ছেদি প্যাটেল বললে—এই দেখুন সাহেব, এবার অড়হড় দিয়েছিলাম এই ক্ষেতিতে, আর ওই দিকের ক্ষেতিতে চানা দিয়েছি—

চেয়ে দেখলাম অন্ধকারের মধ্যেও গাছগুলোর সবুজ আভা যেন

ফুটে বেরোচ্ছে। অন্ধকারে হাওয়ায় দুলছে গাছগুলো। কোথায় সেই বিলাসপুরের অন্ধকূপ, আর কোথায় এই টিলডা।

ছেদি প্যাটেল বললে—সাবধানে আসবেন সাহেব, এদিকটায় জল আছে জুতো নষ্ট হবে—

একটু পরে বললে—এই হলো কদমকুঁয়া—আমার গাঁ—এখানে চল্লিশ বিঘে ক্ষেতি আছে আমার সাহেব—

চল্লিশ বিঘে ?

একটু অবাক হলাম বৈকি। রেলের গেট-কীপারি করে ছেদি প্যাটেল এত জমি-জমা করেছে।

ছেদি প্যাটেল বললে—সবই কোম্পানীর টাকায় সাহেব—কোম্পানী আমার মা-বাপ—

ছেদি প্যাটেলের দিকে চাইলাম। মহাপুরুষ মনে হলো প্যাটেলকে।

ছেদি প্যাটেল বলল—তা বলতে পারেন সাহেব, মছলি খাইনি, কাপড় কিনিনি, রেল কোম্পানীর কুর্তা পরেছি আর টাকা জমিয়েছি—আমার জেনানাটা ছিল ভালো, তাই বেশি খরচ হয়নি, যা দিয়েছি তাই নিয়েছে—

বললাম—তোমার ভাগ্য ভালো ছেদি প্যাটেল—

ছেদি প্যাটেল বললে—ওই যে জলটা চিক্‌চিক্ করছে, ওইটে আমার পুকুর সাহেব, পুকুর কাটিয়ে ঘর বানিয়েছি একটা—ধান বেচি, চানা বেচি, অড়হড় বেচি, টাকা সুদে খাটাই—আর গেট-ম্যানগিরি করি—

—বাঃ।

বললাম—বাঃ, তুমি তো রাজার হালেআছ ছেদি প্যাটেল তোমার আর চাকরি করার দরকার কী। মিছিমিছি নাইট ডিউটি করে-করে শরীর নষ্ট, এবার চাকরি ছেড়ে দাও—তোমার ছেলেপুলে ক'টা ?

ছেদি প্যাটেল সে-কথার কোন উত্তর দিলে না।

হঠাৎ যেন হৈ চৈ গণ্ডগোল চীৎকার গালাগালি কানে এল।

ছেদি প্যাটেল কান খাড়া করে শুনতে লাগলো। চীৎকারটা যত কাছে আসছে ততই জোরে হচ্ছে। যেন ঘর ফাটিয়ে ফেলবে। মেয়ে মানুষের গলা।

ছেদি প্যাটেল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—ওই শুনছেন তো সাহেব—শুনছেন তো—

বললাম—শুনছি তো—ও কারা?

ছেদি প্যাটেল বললে—আবার কারা? আমার দুই ভৌকি—

অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—তোমার বউ। কার সঙ্গে ঝগড়া করছে?

ছেদি প্যাটেলে কিছু উত্তর দিলে না।

ততক্ষণে বাড়ির কাছে এসে গিয়েছিলাম। ছেদি প্যাটেল এগিয়ে গিয়ে চীৎকার করে উঠলো—মুরলী—

যেন মন্ত্র।

মন্ত্রের মতন সব এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল। কোথাও একটুকু টু শব্দ নেই। ছেদি প্যাটেল যেন রাগে ফুলছে সাপের মতন। বুড়ো মানুষ, ভিজে ভালোমানুষ গোছের লোক বলে বরাবর জানতাম ছেদি প্যাটেলকে। কখনও রাগতে দেখিনি মানুষটাকে। সবুজ পাখা নিয়ে চলন্ত গাড়িকে নির্বিঘ্নে চালিয়ে দেওয়াই কাজ ছেদি প্যাটেলের। তার আমলে কখনো কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে দেখিনি। সেই ছেদি প্যাটেলকে রাগলে কেমন দেখায়, তাই প্রথম দেখলাম যেন।

খুট করে ভেতর থেকে দরজায় হুড়কোটা খুলে গেল।

ছেদি প্যাটেল বললে—আসুন সাহেব—

কালো মতন একটা বউ ঘোমটা দিয়ে একপাশে এসে দাঁড়াল।

ততক্ষণে আমিও ভেতরের উঠোনে পৌঁছে গিয়েছি।

ছেদি প্যাটেল বললে—এই ছাখ সাহেব এসেছে নতুন ঘরটায় থাকবে, ঘরে পরিষ্কার করে বিছানা বানাতে বল—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—দেখলেন তো সাহেব, নিজের কানে শুনলেন তো সব—যতক্ষণ বাড়িতে থাকবো না ততক্ষণ কেবল ঝগড়া মারামারি গালাগালি—

তারপর জিনিসপত্র গুছোতে গুছোতে বললো—কেন রে বাপু, দু-দণ্ড একটু চুপ করে থাকতে পারিস না তোরা ? বাড়িতে যেন ডাকাত পড়েছে একেবারে—

বকা—ঝকা আরম্ভ করে দিল ছেদি প্যাটেল। অথচ অন্য দিক থেকে তখন টুঁ শব্দটি দেই! যেন মানুষই নেই বাড়িতে। খাঁ-খাঁ করছে সবকিছু।

ছেদি বললে—হাঁ করে আছিস কেন ? পা ধোবার জল দে—

মনে হচ্ছিল সত্যিই যেন এ-সংসারে এসে অপরাধ করে ফেলেছি আমি। যেন না-এলেই ভালো হতো। ছেদি প্যাটেল তখনও গজগজ করছে—দু-দুটো বউ, একটারও একটু হায়া নেই—দু-দুটো বউ যেন লড়াই করতে এসেছে আমার বাড়িতে—দেব সব ক-টাকে বাড়ি থেকে দূর করে তাড়িয়ে।

বললাম—আমি না হয় রামসহায়ের বাড়িতে যাই ছেদি প্যাটেল—

ছেদি প্যাটেল বললে—কেন ? আমি তো একলা নই, দু-দুটো বউ থাকতে আপনি যাবেন রামসহায়ের বাড়িতে ? কেন আমি কি খেতে দিই না ? মাগনা ?

ওপাশ থেকে তখনও কোন সাড়াশব্দ নেই।

ছেদি প্যাটেল ডাকলে—মুরলী—

একটা কালো-মতন বউ আগাগোড়া ঘোমটা দিয়ে এসে হাজির হল সেখানে।

ছেদি প্যাটেল বললে—নতুন ঘরটায় সাহেবের বিছানা করে দে—সাহেব শোবে এখেনে—নতুন মশারীটা টাঙিয়ে দে আমার, আর চাদর বালিশ দেঁ। সব আছে আমার সাহেব, আমি কদমকুঁয়ার প্যাটেল, আর আমার বাড়িতে কিনা আপনার অযত্ন হবে—

বললাম—দরকার কী প্যাটেল। তোমার বউরা একটু বিশ্রাম করত, আমি এর মধ্যে তো এসে আবার ঝঞ্ঝাট বাড়ালাম কেবল—

ছেদি প্যাটেল বললে—ঝঞ্ঝাট বলছেন কেন ? তাহলে কোন সুখে বিয়ে করা ?

হেসে ফেললাম। বললাম—বিয়ে করেছকি ওদের খাটাবার জন্যে ?

ছেদি প্যাটেল বললে—তা খাটবে না ? শুধু শুধু বসে বসে আমার খাবে কেবল ? টাকা লাগেনি বিয়ে করতে ?

সত্যি অকাট্য যুক্তি ! পয়সা দিয়ে বউ এনেছে ঘরে, খাটিয়ে নেবে বৈকি ? না-খাটলে দাম উসুল হবে কেন ?

ততক্ষণে দেখি এক বালতি জল এসে গেছে।

ছেদি প্যাটেল বললে – আপনি হাত-মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করুন সাহেব—আমি একটু দোকানে যাই—

বললাম—আবার দোকানে যাবে কেন ?

ছেদি প্যাটেল বললে—বাঃ আপনি এলেন, আপনাকে কি যা-তা দিয়ে খেতে দিতে পারি ?

ছেদি প্যাটেল বলে বেরিয়ে গেল।

ছেদি প্যাটেল চলে যেতেই ভেতর থেকে তখন ফিসফিস কথাবার্তার আওয়াজ এল।

নিজেই বালতিটার কাছে গিয়ে বসে জুতো-মোজা খুলে হাতে মুখে জল দিলাম। আরাম হলো একটু। একটা ছোট টুল এগিয়ে দিয়েছিল। তাইতে বসে মুখ-হাত-পা মুছে নিলাম। ছেদি প্যাটেলের বাড়িটা ভালো। অনেকগুলো ঘর। চারিদিকে সার সার ঘরদোর। বেশ গোবর দিয়ে নিকান-মোছানো। একটা খাঁচায় টিয়াপাখি ঝুলছে। উঠোনের মাচার ওপর চাল-কুমড়ো হয়েছে অনেকগুলো। রান্নাঘরের ভেতর একটা বউ উঁকি মেরে আমার দিকে দেখছিল। আমার চোখে চোখ পড়তেই চোখটা সরিয়ে নিলাম। বেশ আছে ছেদি প্যাটেল। বিলাসপুরে এই ছেদিকে দেখে কি ভাবতে পেরেছিলাম

—এমন একটি সংসারের কর্তা সে। চারদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরদোর, একটা পাখি, মাচার ওপর চাল কুমড়ো! আর ওদিকে সরকারি চাকরি। সেখানেও দায়িত্ব নেই। ট্রেন আসবার সময় শুধু গেটটি বন্ধ করে রাখা, আর পাখাটা উড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। তারপর যখন কাজ না থাকে, তখন গুমটির মধ্যে বসে বসে ঘুমোও—। রাস্তার চলতি বয়েলগাড়ি আসতেআসতেহঠাৎ হয়তক্লান্ত হয়ে একবার থামে। তারপর গাড়িটাকে ছায়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে গল্পজোড়ে—বিড়ি খায়—তামাক খায়।

এ-রকম অনেক জায়গায় দেখেছি।

শুধু টিল্‌ডায় নয়, শুধু বিলাসপুরে নয়। হাত্‌বান্ধ, নইলা, ভাটপাড়া, বারদুয়ার, অনেক জায়গাতেই স্টেশনের আশেপাশে রাত কাটাতে হয়েছে। কাজে-কর্মে সমস্ত সি-পি-টাই ঘুরে বেড়িয়েছি এমনি করে। দুপুরবেলা ঝাঁ-ঝাঁ করে রোদ্দুর, সেই সময়ে চানার ক্ষেতে সিরসির করে বাতাস বয়ে আসে স্টেশনের প্ল্যাটফরমে। প্ল্যাটফরম ছোট্ট। যখন ট্রেন এল তখন হৈ-চৈ হট্টগোল, তারপর সব নিঃঝুম। গুড্‌স্ থেকে হয়ত বড় বড় বাদামতেলের টিন বোঝাই হচ্ছে মোষের গাড়িতে। ধুলোয় ধুলো চারিদিকে। মালবাবু মালপিছু চার আনা করে হিসেব করে পকেটে : পুরছে আর সিগারেট ফুঁকছে। চালান দিয়ে দর কষাকষি চলছে একদিকে আর হামালরা মাল ওঠাচ্ছে গাড়িতে। কখনও পেয়ারার টুকরি, কখনও কমলালেবুর ঝোড়া, কখনও বা অড়র ডালের দু-মনি বস্তা। তখন নিরিবিলি সমস্ত দিন। তখন স্টেশনমাস্টারবাবু টরে-টক্কা নিয়ে 'তার' লিখে নিচ্ছে। এদিকে কণ্ট্রোল ডাকলো। থার্টিন ডাউন আসবার সময় হয়েছে। খবর গেল কেবিনে গেট-ম্যানকে খবর দিতে হবে—

ক্রিং ক্রিং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে ছেদি প্যাটেল উঠে গেট বন্ধ করে দিয়েছে।

হুস্‌হুস্ করে একটা ট্রাক এসে ঠিক মুখোমুখি দাঁড়াল।

ড্রাইভার বলে—এই ছেদি—গেট্ খোল—

গুম্‌টির ভেতর থেকে ছেদি বলে—হুকুম নেই, থার্টিন ডাউন আসছে—

- থার্টিন ডাউন আসবে আধঘণ্টা পরে দরজা খোল্ বলছি।

ছেদি প্যাটেল বললে—কোম্পানীর নোকর ভাইয়া, হুকুম নেই, হামরা কেয়া কসুর—লাইন ক্লিয়ার হো গ্যায়া—

লাইন ক্লিয়ার একবার হয়ে গেলে ছেদি প্যাটেলের আবার সাধ্যি নেই গেট খোলে। হেকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। ওই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িতে থাকতে হবে হাঁ করে, তারপর গাড়ি চলে গেলে হুকুম আসবে কেবিন থেকে, তখন ছেদি প্যাটেল গেট খুলে দেবে।

হুস্‌হুস্ করে চলে যাবে গাড়িগুলো।

টিলডায় এ-সব ঘটনা আমি দেখিনি, কিন্তু দেখেছি অন্য জায়গায়। ভাটপাড়া, নইলা, হাত্‌বান্ধ, বারদুয়ার সর্বত্র! দেখে মনে কিন্তু ঈর্ষা হয়নি। ছোট চাকরির ছোট দায়িত্ব দেখে করুণাই হয়েছে। ট্রেনে যেতে যেতে যখন সবুজ পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি কোনও গেট ম্যানকে, তখন তাচ্ছিল্যই করেছি তাদের।

কিন্তু আজ যেন কেমন ঈর্ষাই হলো।

এদের তাহলে ঘর-সংসার আছে। এদেরও সুখ-দুঃখ আছে। এদের বাড়িতেও চাল-কুমড়োর মাচা থাকে, এদেরও চালের বাতায় টিয়াপাখি থাকে, গোয়ালে গোরু থাকে, এরাও বেঁচে থাকে আমাদের মতন বাঁচার আগ্রহে আর হয়ত এরা বেশি ভালো করেই বাঁচে!

হয়ত এরা মিছে কথাকে মিছে বলেই জানে। কিংবা হয়ত সততাকে খাঁটি সততা বলেই বিশ্বাস করে। আমরাও হয়ত একদিন এদের মতই সরল ছিলাম, সৎ ছিলাম হয়ত এদেরমতই পরকে একদিন আপন করে নিতে পারতাম। তারপর লেখাপড়া শিখেছি, ফরসা জামা-কাপড় পরেছি, ভদ্র হয়েছি, সিনেমা, থিয়েটারকে সংস্কৃতি নাম দিয়ে পরকেও ঠকিয়েছি, নিজেরাও ঠকেছি। কেউ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট

হয়েছি, কেউ মিনিস্টার হয়েছি, এখন আর ভালোকে সহজে ভালো বলি না, খারাপকে সহজে খারাপ বলি না। তাতে কার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, কার স্বার্থ সিদ্ধি হয় তা ভেবে তবে ভালো-খারাপ বলি।

—সাহেব!

ছেদি প্যাটেল অনেকক্ষণ চলে গিয়েছিল। একমনে নিজের ভাবনাতেই মেতেছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম। দেখি দুটো বউ বেশ আশেপাশেই ঘোরা-ফেরা করছে। খুব ভাব দু'জনে। বাড়িতে ঢোকবার আগে যে-জনের অত ঝগড়া চলছিল তা আর ওদের দেখে বোঝবার উপায় নেই!

মুরলী বললে—সাহেব, তোমার ঘর সাফাই হয়ে গেছে—ওঠো—

চেয়ে দেখি একটা পাশের ঘরেআমার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে খাটিয়া পেতে দিয়েছে।

মুরলী বললে—সরস্বতীয়া, সাহেবকে চা করে দে—

ঘরের মধ্যে আর একটা বউ তখনও নতুন-পাতা বিছানাটা ঠিক-ঠাক করছিল।

আমি যেতেই বউটা দুড় দুড় করে পালিয়ে গেল।

ইতিমধ্যেই ঘরটা বেশ সাজানো গোছান হয়েছে। দেয়ালের তাকে গোটাকতক বই পত্র জমানো। পাতলা চটি বই সব। ছেদি প্যাটেল কি আবার বই পড়তে পারে নাকি! দেখলাম গোটাকতক হিন্দী সিনেমার ছবি ভর্তি বই। ভেতরে অসংখ্য ছবি। এ-সব সিনেমা কি এখানেও এসেছে, এই কদমকুঁমায়! এখানে শিকার করতে এসেছি হরিণ, আর এই ছত্রিশগড়িয়ার বাড়ির ভেতরে অন্দরমহলে পর্যন্ত এই সব শহরের জিনিসের গতিবিধি!

বাইরে খুব হাসাহাসি চলছে।

খোলা দরজা দিয়ে দেখছি রান্নাঘরের সামনে বসে দুই বউ খুব হাসছে।

মুরলী বলছে—তুই যা, সাহেবকে চা দিয়ে আয়—

সরস্বতীয়া বলছে—আমি যাব না, তুই যা—

মুরলী বলছে—আমি কেন যাবো ? আমি কালো—কুচ্ছিৎ, আমি তো বুড়ী।

সরস্বতীয়া বললে—আর আমি বুঝি ছুঁড়ি ?

বলে খিল্ খিল্ করে হেসে গড়িয়ে পড়বার যোগাড়।

মুরলী বললে—তাহলে চা নিয়ে যাবি কিনা তুই বল্—

সরস্বতীয়া বললে—আমি যাবো না, তোর কী ?

—তোর কী ! তবে রে, আচ্ছা ও আসুক, তোকে আবার মার খাওয়াবো—

সরস্বতীয়া বললে—বেশ মার খাবো তো খাবো, বুড়োর হাতের মার খুব মিষ্টি, জানিস—

মুরলী বললে—যাবি না তো ? তাহলে আমি যাচ্ছি।

সরস্বতীয়া বললে—বাবারে বাবা, যাচ্ছি—

বলে চায়ের বাটি হাতে নিয়ে আমার দিকে আসতে লাগলো উঠোন পেরিয়ে।

আমার খুব হাসি পেল। এ দুটো তো বেশ আছে। এই ঝগড়া, এই ভাব। এতক্ষণ যে ঝগড়া করছিল এমন, কে তা বলবে এখন দেখে !

দেখলাম গায়ের কাপড়টাকে বেশ আঁটসাঁট করে জড়িয়ে-সরিয়ে নিলে। তারপর একহাতে চায়ের বাটী আর একটা বাটিতে কি যেন খাবার।

ঘরের ভেতর আমি তখন না দেখবার ভাণ করে অন্যদিকে চেয়ে বসে আছি।

সরস্বতীয়া বললে—চা নাও সাহেব—

আমি যেন কিছুই জানি না। হঠাৎ চা দেখে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম।

একটা এনামেলের বাটিতে গরম চা আর একটা বাটিতে কতকগুলো পিঠে। দেখে মনে হলো চালের গুড়োর তৈরী।

চা দিয়ে সরস্বতীয়ার চলে যাবারই কথা। কিন্তু চলে গেল না।

মুখ তুলে বললাম—কিছু বলবে আমাকে ?

এবার ভালো করে দেখলাম ছেদি প্যাটেলের দ্বিতীয় পক্ষের ভৌকিকে। বেশ ফরসা গোল-গাল গড়ন, এক হাতে কাঁচের চুড়ি। টক্‌টক্ করছে গায়েব রঙ। দরজার পাল্লাটা দু-হাত উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর মিট মিট করে হাসছে আমার দিকে চেয়ে।

আবার বললাম—কিছু বলবে আমাকে ?

সরস্বতীয়া যেন একটু দ্বিধা করলো প্রথমে, তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—তখন অত হাসছিলে কেন ?

হঠাৎ এই অভিযোগে একটু চমকে উঠলাম।

বললাম—কই হাসিনি তো ?

সরস্বতীয়া বললে—হাসিনি ওম্‌নি 'বললেই হলো, আমি সব দেখেছি—রান্নাঘরে দিদির সঙ্গে যখন কথা বলছিলুম, তখন কে হাসছিল—আমি ?

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে বললাম—এগুলো কী ? এ আমি খেতে পারবো না—

সরস্বতীয়া বললে—না, ওটা খেতেই হবে, চালের পিঠে—আমি বানিয়েছি—

বললাম—তুমি বানাও আর মুরলীই বানাক্—খেতে আমি পারবো না—

সরস্বতীয়া বললে—মুরলী বললে খাবে বুঝি ?

বললাম—মুরলী আর তুমি কি আলাদা ?

সরস্বতীয়া বললে—তবে তুমি খাচ্ছো না কেন ?

তা খেতেই হলো আমাকে শেষ পর্যন্ত। চালের গুঁড়ো করে হাতে-তৈরী পিঠে। মিষ্টি-মিষ্টি স্বাদ। খালি বাটিটা সরস্বতীয়ার হাতে তুলে দিলাম।

বললাম—এবার হলো তো ?

সরস্বতীয়া তাতেও সন্তুষ্ট হলো না।

বললে—তাহলে হাসছিলে কেন বলো এবার—

বললাম—হাসছিলাম তোমাদের দু'-জনের কাণ্ড দেখে—

সরস্বতীয়া বললে—তুমি খুব করে বলে দিও তো আমার মরদকে—আমার সঙ্গে খালি ঝগড়া করে ও—।

বললাম—কেন? মুরলী ঝগড়া করে কেন তোমার সঙ্গে?

সরস্বতীয়া বললে—আমি সুন্দরী বলে—

বললাম—তুমি সুন্দরী বুঝি?

এমন সময় হঠাৎ ছেদি প্যাটেলের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে দুড়দুড় করে পালিয়ে গিয়েছে সরস্বতীয়া। দোকান থেকে আলু পেঁয়াজ আরো সব কী কী কিনে ঘাড়ে করে ঢুকলো ছেদি প্যাটেল। ঢুকেই জিজ্ঞেস করলে—সাহেবকে চা দিয়েছিস মুরলী?

স্পষ্ট মনে আছে প্রথম দিনের সেই সরস্বতীয়াকে যেন আমার কাছে বড় অদ্ভুত মনে হয়েছিল। এমন তো কখনও দেখিনি আগে। বিশেষ করে ছেদি প্যাটেলের বাড়িতে এমন মেয়েকে দেখব আশা করিনি।

খেতে বসে অনেক গল্প করেছিল ছেদি প্যাটেল।

ছেদি প্যাটেল বলেছিল—পেলেটিয়ার সাহেবের খবর কী সাহেব?

বললাম—তোমার কথা গিয়ে বলবো তাকে।

তারপর একটু থেমে বললাম—বদলি হবে নাকি ছেদি?

ছেদি প্যাটেল বললে—আর বদলি চাই না সাহেব, বেশ আছি এখেনে। এবার মকাই দিয়েছিলাম ক্ষেতে—চল্লিশ টাকা আমদানি হয়েছে বেচে, ঘরের খেয়ে কোম্পানীর নোকরি করছি এখন, আর বিলাসপুরে যাবো না সাহেব—

বললাম—এখানে ডিউটি কেমন?

ছেদি প্যাটেল বললে—খুব হালকা ডিউটি সাহেব—বিলাসপুরে বড্ড কাজের ঝক্কি ছিল, গেট পাহারা দিতে হতো সারাদিন—এখেনে

ক্ষেতও দেখা হয়, গেটও পাহারা দিই—গাড়ি ঘোড়ার তেজটা কম এখেনে—সাহেব লোকরা নেই—সব গেঁইয়া, ধমক দিলে কথা শোনে—

বললাম—তাই বুঝি এখেনে এসে ছুটো বিয়ে করেছ?

ছেদি প্যাটেল হেসে উঠলো।

বললে—পয়সা হয়েছে এখন একটু সুখ করবো না সাহেব?

ছেদি প্যাটেল আবার বললে—আমাদের পেলেটিয়ার সাহেব রিটায়ার করলো—চল্লিশ হাজার টাকা পভিডেন্ ফাণ্ড পেল—তারপর আবার এসেছিল চাকরি খুঁজতে—

বললাম—কোন্ পেলেটিয়ার সাহেব?

ছেদি প্যাটেল বললে—টিল্‌ডার পেলেটিয়ার সাহেব হুঁজুর—তার চেয়ে আমার অবস্থা ভালো—আমি তো সব গুছিয়ে রেখে গেলাম সাহেব—

চানার ডাল, মোটা লাল আটার রুটি, আলু পেঁয়াজের তরকারি আর মুরগির আণ্ডার ঝোল।

বললাম—না না ছেদি প্যাটেল—অনেক পিঠে খেয়েছি চায়ের সঙ্গে—

ছেদি প্যাটেল বলতে লাগলো—হরিণ এসে সব চানা খেয়ে যায় সাহেব আমার ক্ষেত থেকে, হরিণগুলোকে সাবাড় করে দিন দিকি—আমি ডিউটিতে থাকি, আর বউ ছুটোও মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ দেখলে মোটে ভয় পায় না সাহেব ওরা—

রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। একবার মুরলী একবার সরস্বতীয়া ছু'জনেই অনেকগুলো রুটি খাইয়ে দিল। রামসহায় রাত্রে এসেছিল দেখতে। একটা হ্যারিকেন নিয়ে লাঠি হাতে এসেছিল।

বললে—হুজুর যাবেন নাকি আজ রাতে?

বললাম—আজকের রাতটা থাক—কাল দিনের বেলা এসো, এই বিকেল নাগাদ—

সব মানুষের জীবনে বোধহয় কোথায় একটা ফাঁকি আছে। হয় হিসেবের ফাঁকি নয়তো অনুভূতির ফাঁকি। সেই ফাঁকির ফাঁক দিয়েই কখন সব সঞ্চয় যেমন অজ্ঞাতে একদিন জমা হয়, আবার নিঃশেষে একদিন খরচও হয়ে যায়। জানতে পারি না কখন ঐশ্বর্যবান হয়ে গেছি আবার কখন নিঃস্ব হয়ে ফতুর হয়ে গেছি। এই যেমন ছেদি প্যাটেল! ভেবেছিল বিলাসপুর থেকে বদলি হয়ে টিলডায় এলে তার সঞ্চয় বৃদ্ধি একেবারে উপচে পড়বে, তার সৌভাগ্য বোধহয় অভ্রভেদী হয়ে উঠবে! তার চল্লিশ বিঘে ক্ষেতি-ক্ষামার। তার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড—প্রভূত ঐশ্বর্য, এ যেন সে আস্তে আস্তে তারিয়ে তারিয়ে চেখে চেখে ভোগ করবে। কিন্তু তখন কি জানতো যে সরস্বতীয়া তার সমস্ত ঐশ্বর্যের মর্মমূলে এমন করে মর্মান্তিক আঘাত করবে অপ্রত্যাশিত ভাবে?

কিন্তু সে কথা এখানে নয়।

সরস্বতীয়া আমার বিছানা-টিছানা ঠিকঠাক করে রেখে দিয়েছিল! আমি গিয়ে শুয়ে শুয়ে অনেক কথাই ভাবছিলাম। ছেদি প্যাটেলের বাড়িতে একদিন আমাকে শয্যাগ্রহণ করতে হবে এ-কথা আমিই কি কোনওদিন ভেবেছিলাম নাকি?

ক্রমে অনেক রাত হয়ে এল। কদমকুঁয়ার ছেদি প্যাটেলের বাড়িতেও ক্রমে ক্রমে সব শব্দ থেমে এল! তারপর মাথার ওপর দিয়ে একটা হুক্কিয়ালের কর্কশ ডাক পুব পশ্চিমে অনেক দূরে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। ছেদি প্যাটেলের চানার ক্ষেতে হয়তো বুনো শুয়োরের ভোঁতা শব্দ কানে এসে লাগলো! কিংবা হয়ত সবই আমার মন-গড়া। আমার শিকারী-মন হয়ত মিছিমিছিই সব জায়গায় শিকার খুঁজে বেড়ায়—। সামান্য একটা শব্দকে নেকড়ের ডাক বলে মনে হয়। ডি-কস্টা সাহেবের কথাও মনে পড়লো।

সাহেব বলতো—শিকারীদের ঘুমের মধ্যেও কেয়ারফুল থাকতে হবে।

ডি-কষ্টা সাহেবের কথা আলাদা। শিকার আমার নেশাও নয়, পেশাও নয়। কবে একদিন কি খেয়াল হয়েছিল—খেয়ালের বশে একটা বন্দুক কিনেছিলাম। অবসর পেলে এই বন্দুক নিয়ে বেরোতাম। এখন ওসব ছেড়েই দিয়েছি। এখন সে বন্দুক কোথায় চলে গিয়েছে, কাকে বেচে দিয়েছি তারও নাম ঠিকানা মনে নাই। বিলাসপুর ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিকারের সে সব কাহিনী মন থেকেও মুছে ফেলেছি। শুধু মনে আছে কদমকুঁয়ার সেই ছেদি প্যাটেলের কথা, ছেদি প্যাটেলের কথা, ছেদি প্যাটেলের বউ সরস্বতীয়া আর মুরলীর কথা। আর সমস্ত কবে ভুলে গেছি।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠবার আগেই উঠোন ঝাঁট দেবার শব্দ পেলাম। খোলা জানালা দিয়ে দেখি ছেদি প্যাটেলের প্রথম পক্ষের বউ মুরলী উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। সকাল আলোয় ভালো করে দেখলাম বউটাকে। চেহারাটা ভাল নয় মোটেই। বছর চল্লিশেক বয়স হবে। উঠোন গোবর দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলেছে এরই মধ্যে।

ছেদি-প্যাটেলের নাইট-ডিউটি ছিল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরই সে চলে গেছে গেট পাহারা দিতে। হয়ত এখনি এসে পড়বে।

উঠবো উঠবো ভাবছি।

হঠাৎ রান্নাঘরের দিক থেকে সরস্বতীয়ার গলার শব্দ কানে এল।

—মুরলী, সাহেবকে চা দিয়ে আয়!

দেখি রান্নাঘরের সামনের দাওয়ায় বসে চা বানাচ্ছে সরস্বতীয়া। রাত্রের সে-সরস্বতীয়াকে আর চেনাই যায় না। এরই মধ্যে স্নান করা হয়ে গেছে। সিঁদুর দিয়েছে মোটা করে। সবুজ একখানা হাতে-বোনা শাড়িও পরেছে।

আবার ডাকলে মুরলীকে—ওরে চা নিয়ে যা সাহেবের—

মুরলী বললে—আমি পারবো না, তুই নিয়ে যা—

সরস্বতীয়া বললে—আমার হাতের চা কাল সাহেবের ভালো লাগেনি—তুই নিয়ে যা।

মুরলী বললে—আজ ভালো লাগবে

সঙ্গে সঙ্গে আমার দরজায় ঘা পড়লো।

আমি তাড়াতাড়ি দরজার হুড়কোট খুলে দিলাম।

সরস্বতীয়া দেখি মুখ টিপে হাসছে আমার দিকে চেয়ে।

বললে—আমার হাতের চা খাবে সাহেব?

বললাম—কেন, তোমার হাতে খেতে দোষ কী?

সরস্বতীয়া হাসি চাপতে না পেরে দৌড়ে চলে গেল! আর রান্নাঘরের কাছে গিয়ে সে কী হাসি। দু'জনেই হাসছে খুব। হাসি একবার চাপে তো একবার হাসে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বার যোগাড়। দুই বউতে খুব হাসি হেসে নিলে একচোট।

তারপর এক বাটি চা নিয়ে আমার ঘরে এল আবার।

বললাম—ও-কথাটা জিজ্ঞেস করছিলে কেন সরস্বতীয়া?

সরস্বতীয়া অবাক হয়ে গেল। বলল—কোন্ কথাটা সাহেব?

বললাম—ওই যে তোমার হাতে চা খাবো কিনা।

সরস্বতীয়া আবার হাসলো।

বললে—কাল সন্ধ্যাবেলা যে তুমি সব চা-টা খাওনি সাহেব—

বললাম—কাল খাইনি অন্য কারণে, পিঠে খেয়ে আমার পেট ভরে গিয়েছিল—তা তোমাদের সেজন্যে অত হাসি কিসের?

সরস্বতীয়া আমার সামনের চৌকাঠের ওপর হঠাৎ বসে পড়লো।

বললে—হাসব না তো কী! আমার মরদ যে বাড়িতে নেই—

বললাম—তোমার মরদ থাকলে বুঝি হাসলে বকে?

সরস্বতীয়া হেসে বললে—বুড়োমানুষ তো, বুড়োয়া হাসির কী বুঝবে সাহেব, তুমিই বলো না?

বললাম—বুড়োমানুষ হলেই বা, তোমারই তো স্বামী, স্বামীকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে হয়—স্বামীর কথা শুনতে হয়—স্বামী যা বলে তাই করতে হয়—

সরস্বতীয়া বললে—আমি শুনতে যাব কেন—শুনবে ওই মুরলী—

অবাক হলাম কথা শুনে।

বললাম—মুরলী একলা শুনবে কেন? তোমারও শোনা উচিত—তুমিও তো বউ—

সরস্বতীয়া বললে—আমি বউ না ছাই—

বললাম—সে কি, তুমি বউ নও?

সরস্বতীয়া বললে—আমি বুঝি বউ ওর? মুরলী তো ওর আসল বউ। মুরলীকেই তো আমার মরদ সাদি করেছে ঠিক-ঠিক—

আর তুমি?

সরস্বতীয়া বললে—আমি তো চুড়ি-পরানো বউ—

চুড়ি-পরানো বউ? কথাটা কেমন বুঝতে পারলাম না।

বললাম—তার মানে?

সরস্বতীয়া হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—মুরলী—

মুরলী বোধহয় তখন সংসারে কাজে করছিল! সকালবেলা সংসারের অনেক কাজ থাকে। সরস্বতীয়ার মত গল্পবাজ কেউ নয়!

বললাম—কেন, মুরলীকে আবার ডাকছো কেন? কাজ করছে হয়ত—

সরস্বতীয়া বললে—কাজ না ছাই। কিসের কাজ আবার—চা আর ভাত রাঁধা—ও আর এমন কী কাজ, সবাই করতে পারে—

বললাম—তুমি তো কই কাজ করো না, সকাল থেকে তো দেখছি কেবল খিল্‌খিল করে হাসছো—মুরলীই তো সব কাজ করে দেখছি—

সরস্বতীয়া ঠোঁট উল্টোল।

বললে—ইস্ কাজ করি না আমি? আমার বুঝি কাজ নেই। আমি ভোরে উঠে চান করে কাপড় কেচে জল তুলে এনেছি তালাও থেকে—তারপর চা করেছি—

বললাম—চা করা কি একটা কাজ নাকি?

সরস্বতীয়া বললে—চা করা কাজ নয়? কাল ডিউটিতে যাবার আগে মরদ আমায় কী বলে গেছে জানো?

বললাম—কী বলে গেছে ?

সরস্বতীয়া বললে—বলে গেছে সক্কালবেলাই তোমায় চা করে দিতে—তুমি বুঝি রেলের বড় অফ্‌সর।

বললাম—সেইজন্যই বুঝি সকালবেলাই চা দেবার এত তাড়া।

সরস্বতীয়া বললে—আমি মুরলীকে বললাম তোমাকে চা দিতে-ও বললে আমাকে চা দিতে।

বললাম—সেই জন্যই সকালবেলা অত হাসির ধুম ?

সরস্বতীয়া বললে—কেন আমি চা দেব ? আমি এ-বাড়ির কে শুনি ?

—সে কি ? তুমি কেউ না ?

সরস্বতীয়া বললে—আমি তো চুড়ি-পরানো ডৌকি—আমি কি আসল ডৌকি ?

—তার মানে ?

আবার অবাক হলাম। চুড়ি-পরানো বউ মানে !

সরস্বতীয়া চৌকাঠের ওপরে বসেই চিৎকার করে ডাকলে—মুরলী ও মুরলী—

এবার মুরলী এল।

বললে—কী বলছিস বল ?

সরস্বতীয়া বললে—চুড়ি পরানো ডৌকি কাকে বলে তাই জিজ্ঞেস করছে সাহেব, তুই বুঝিয়ে দে তো।

মুরলীও হেসে উঠলো এবার।

বললে—তুমি কেন হাসছিলে সাহেব কাল ?

বললাম—কখন।

মুরলী বললে—কাল বিকেলে যখন তুমি এলে ?

বললাম—তোমরা দুজনে সারাদিন ঝগড়াও করো, আবার দুজনের খুব মিলও দেখলাম—তাই হাসছিলাম—তা তোমরা দুজনে এত ঝগড়া করো কেন ? ছেদি প্যাটেলও বলছিল আমাকে।

মুরলী বললে—সে তো সাহেব সরস্বতীয়ারই জন্যে—ওর জন্যেই আমার যত ভোগান্তি—ও যদি আমার কথা শুনতো আমার কপালে কি এত দুঃখ থাকতো ?

সরস্বতীয়া দাঁড়িয়ে উঠলো।

চিৎকার করে বললে সরস্বতীয়ার দোষ। সরস্বতীয়ার দোষ কীসে ? সরস্বতীয়া কি ওই বুড়োর বিয়ে করা বউ যে তোর মত মুখ বুজে সব সইবে ? তুমি ভোগো কেন ? কে ভুগতে বলছে আমার জন্যে ?

মুরলী বললে—তুই এই কথা বললি আমাকে ? তোর জন্যে ভুগি কেন ?

সরস্বতীয়া বললে, বলবো না ? তুমি কেন আসো আমাকে জ্বালাতে ?

মুরলীও রেগে গেল।

বললে—তোর কিসের জ্বালা রে ? তুমি যদি আমার দুঃখু বুঝতিস্ তো আমার ভাবনা ?

সরস্বতীয়া বললে—তোমার দুঃখু বুঝতে আমার বয়ে গেছে ? তুমি আমার কে শুনি ?

মুরলী বললে—কেউ নই ? এই কথা তুমি বললে আমাকে ?

সরস্বতীয়া বললে—কেন বলবো না—একশোবার বলবো, হাজার বার বলবো—তুমি আমার কে যে তোমার দুঃখু আমি বুঝবো ? তুমি আমার দুঃখু বুঝেছ ? বুঝতে চেয়েছ কখনও ?

মুরলী বললে—আমি তোর দুঃখু বুঝিনি ? তুই বলছিস কি ?

সরস্বতীয়া বললে—হ্যাঁ বুঝেছ, ছাই বুঝেছ, বুঝলে আর এমন করতে না আমায়, এমন করে আমার গলা টিপে মারতে চাইতে না—আমায় তো তোমরা দু'জনে মিলে মেরে ফেলবার মতলব করেছ—আমায় পাগল করে দেবার মতলব করেছ—

বলতে বলতে সরস্বতীয়া হঠাৎ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাউ-হাউ

করে কাঁদতে শুরু করে দিলে। শেষে বুঝি নিজের কান্না এড়াবার জন্যে হঠাৎ আমার ঘর ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে বাইরে গিয়ে লুকোল—

সরস্বতীয়ার এই ব্যবহারে আমি কেমন অবাক হয়ে গেলাম।

মুরলীর দিকে তাকালাম!

মুরলী বললে—দেখলে তো সাহেব? দেখলে তো তুমি নিজের চোখে?

বললাম—কেন? কাঁদলো কেন ও?

মুরলী বললে—কেন কাঁদলো তা ওকেই জিজ্ঞেস করো না সাহেব—

বললাম—তোমাদের দুজনকে ঘরে এনে ছেদি প্যাটেলের তো খুব সুখ দেখছি—তোমরা যদি মিলেমিশে সংসার না করতে পারো তো কেমন করে চলবে—সে বেচারী দিনরাত খেটে এত টাকা জমিয়েছে—ক্ষেত-খামার করেছে—সব যে নষ্ট হয়ে যাবে—তা বোঝ না—

সরস্বতীয়া হঠাৎ ঘরে ঢুকলো।

বললে—নষ্ট হবে, বেশ হবে—নষ্ট হয়ে যাক্, পুড়ে যাক্—তাতে আমার কী! বুড়োর টাকা আছে তো আর আছে—আমার কী?

বললাম—ও-কথা বলতে নাই সরস্বতীয়া—কে তোমাকে খেতে পরতে দিচ্ছে, কে তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছে?

সরস্বতীয়া মুরলীর দিকে চেয়ে বলতে লাগলো—সুখ তো আমার ভারী সুখের আর সীমা নেই আমাদের—বলুক না মুরলী—বল্ না তুই? বুড়ো আমাদের সুখে রেখেছি কি না বল্—

মুরলী বলল—তুই চলে গিয়েছিলি—আবার এলি কেন শুনি?

সরস্বতীয়া বললে—কেন আসবো না, একশোবার আসবো হাজারবার আসবো, আমার খুশি আমি আসবো তুই বলবার কে?

মুরলী আমার দিকে চেয়ে বললে—দেখছো তো সাহেব সরস্বতীয়ার কাণ্ড—একে পাগল বলবো না কী বলবো?

সরস্বতীয়া লাফিয়ে উঠলো। বললে—আমি বুঝি পাগল?

আমাকে পাগল বলা? আমি যদি পাগল হই তবে তোমরাই তো আমাকে পাগল করেছ—এই তুমি, তুমি আমাকে পাগল করেছ—আমি কি পাগল ছিলাম? তোমাদের সংসারে এসে পাগল হয়েছি আমি—বলতে বলতে আবার চলে গেল সরস্বতীয়া আমার ঘর থেকে। এরপর আমিও মুরলীর দিকে চাইলাম, মুরলীও আমার দিকে চাইল। কেউ কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলাম না।

মুরলী বললে—দেখলে তো সাহেব—

কিছু বলতে পারলাম না। কোনও কথা বেরুল না আমার মুখে।

মুরলী বললে—সেই বুড়ো মানুষ সারারাত ডিউটি করে আসছে তো, এখন যদি কানে তুলিএ-সব কথা তো মনটাকেমন হয় বলো তো সাহেব?

এবারও কোন কথা বলতে পারলাম না। কোনও উত্তর যেন এল না আমার মুখে। আমার কী,ই বা বলবার ছিল! হুদিনের জন্যে কদমকুঁয়ায় এসেছি, আবার চলে যাব নিজের কাজ সেরে—দরকার কি এদের সংসারের মধ্যে মাথা গলিয়ে। আমি কে? এই ছত্রিশগড়ী পরিবারের অন্দরমহলের সমস্যা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কী। ওদের সমস্যা ওদেরই সমস্যা হয়ে থাক। আমি কেন তার মধ্যে নিজের বুদ্ধি খাটাই। কী দরকারে ওদের মধ্যে থেকে? আমি এখান থেকে চলে যাবো। এদের বিষয় নিয়ে আমার কৌতূহল দেখানো ভালো নয়। ছেদি প্যাটেলকেও এ নিয়ে উপদেশ দিতে যাওয়া বৃথা। সত্যিই তো আমি ওদের কে?

সকাল হয়েছে। এখনই হয়ত ছেদিলাল এসে পড়বে। তার নাইটডিউটি এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে হয়ত। এখনও হয়ত তার রিলিভার আসেনি। এখনও হয়ত রিলিভারের জন্যে অপেক্ষা করছে টিল্‌ভার গেট ছেড়ে ছেদিলাল বাড়ি চলে আসতে পারে না!

রিলিভারকে গেট-এর চাবি, গুমটির চাবি, লাল-সবুজ ঝাণ্ডা বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে!

নিজের বন্দুকটাও ঠিক করে নিলাম। বারো বোরের বন্দুক। ডি-কষ্টা সাহেব নিজে দেখে-শুনে কিনে দিয়েছিল। টোটাও কিছু পুরে নিলাম ঝুলিতে। রামসহায় এখনি এসে পড়বে। দরকার নাই এখানে থেকে। রামসহায়ের বাড়িতেই থাকবো।

ভেতরে হঠাৎ মুরলীর গলা শুনতে পেলাম।

মুরলী বলছে—সাহেবের কাছে যা তো সরস্বতীয়া—সাহেব তোর ওপর রাগ করে চা খায় নি—

সত্যিই আমি চা খাই নি। সরস্বতীয়া এলো কাছে। আমার চায়ের কাপের দিকে চেয়ে বললে—তুমি যে চা খেলে না সাহেব?

বললাম—আমি খাবো না এখানে চা—কোন কিছুই খাবো না—

—কেন?

সরস্বতীয়া যেন করুণ হয়ে উঠলো আমার দিকে চেয়ে।

বললাম—তোমরা দুজনে এত ঝগড়া-ঝাঁটি করো—আমার এখানে থাকতে ভালো না, আমি চলে যাবো রামসহায়ের বাড়ি—

সরস্বতীয়ার দিকে চেয়ে দেখলাম। সত্যিই সরস্বতীয়ার কচি মুখখানা যেন শুকিয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে বললে—তুমি থাকো সাহেব, আমি আর ঝগড়া করবো না—

বললাম—না, সরস্বতীয়া, দরকার কি তোমাদের মধ্যে থেকে? তোমরা ঝগড়া করোঝাঁটি করো, যা ইচ্ছেতাই করো, তোমার মরদের সেবা করো না-করো আমার দেখবার কি? আমি তো দু দিনের জন্যে এসেছি, আবার চলে যাবো কাল পরশু—আমার এ-সব অশান্তি মধ্যে থেকে লাভ কী?

সরস্বতীয়ার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। মুখখানা আরো গম্ভীর হয়ে গেছে মনে হলো! এত হাসিখুশী যে মুখে ছিল সেই মুখই যে এ-রকম হতে পারে ভাবা যায় না।

বললাম—তোমরা দু-বউতে ঝগড়া করবে, করো—আমি থাকলে মিছিমিছি তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে—আমি চলে গেলে, আমিও বাঁচি তোমরাও বাঁচো—এখন দেখছি ছেদিলালের কথায় রাজী হওয়াই আমার অন্যায় হয়েছে।

সরস্বতীয়া গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তখনও।

বললাম—আমার বিছানা বেঁধে দাও বরং, রামসহায় এলেই চলে যাবো এখান থেকে—তোমাদের আর আমার জন্যে চা করতে হবে না, রুটি করতে হবে না—

এবার হঠাৎ সরস্বতীয়া কথা বললে। বললে—আমাকে মাপ করো সাহেব, আমি আর ঝগড়া করবো না—

বললাম—ঝগড়া করবো না তো বলছো, কিন্তু হয়ত এখুনি আবার ঝগড়া শুরু করে দেবে—

সরস্বতীয়া বললে—না সাহেব, আমি বলছি, আর মুরলীর সঙ্গে ঝগড়া করবো না—তুমি চা-টা খেয়ে নাও—তারপর হঠাৎ আঁচলের তলা থেকে একটা চালের মেঠাই বার করে মুখে দিয়ে কামড়ালো।

বললে—এই দেখ সাহেব, মুরলীর বানানো মেঠাই আমি খেলুম—ওর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল, এবার তুমি চা খেয়ে নাও—

হেসে ফেললাম।

বললাম—চা আমি খেলাম, কিন্তু তোমার কথা থাকে যেন—

সরস্বতীয়ার মুখে দেখি আবার হাসি ফুটে উঠেছে—আবার যেন আগের দিনের মতনটি হয়ে উঠেছে। আবার আগের দিনের মতন হেসে বুঝি এখনি গড়িয়ে পড়বে রান্নাঘরে গিয়েই।

সত্যি, আমার চা খাওয়া না-খাওয়ার ওপর যেন এতক্ষণ তার জীবনমরণ নির্ভর করছিল, এমনি ভাব। অথচ কত সহজে কত অনায়াসে সরস্বতীয়া আবার আপন হয়ে গেল। সত্যি, কত দেশে-বিদেশে আমাদের কত আত্মীয় কত আপনজন ছড়ানো আছে, আমি

তাদের চিনি। না—যেদিন চিনতে পারবো, মনে হবে তারা যেন কতকালের চেনা। কত যুগের পরিচিত! জীবনে আরো কত ঘাটে আমাদের নৌকা ভিড়বে, সব জায়গাতেই কত দেনা-পাওয়া থেকে যাবে কে বলতে পারে!

হঠাৎ ছেদি প্যাটেল এসে গেল হুড়মুড় করে। হাতে লাঠি, লণ্ঠন। লণ্ঠনটা নেভানো। ডিউটিতে যাবার সময় জ্বেলে নিয়ে গিয়েছিল।

বললে—সাহেবকে চা করে দিয়েছিস মুরলী—

বলতে বলতে আমার ঘরে এসে ঢুকলো সোজা।

বললে—চা খেয়েছেন হুজুর? ওরা খাবার-টাবার দিয়েছে তো? রাত্রে ঘুম হয়েছিলো ভালো?

বললাম—কোনও কষ্ট হয় নি ছেদি, তুমি কিছু ভেবো না—

ছেদি প্যাটেল বললে—সাহেব আপনি জানেন না, ও দুটো কি মানুষ,—মানুষ নয় হুজুর, কেবল দিনরাত ঝগড়া করতে জানে আর মারামারি চুলোচুলি করতে জানে—মেহ্‌মানের খাতির ওর জানবে কী করে?

বললাম—না ছেদি, ওরা চা দিয়েছে, খাবার দিয়েছে—

ছেদিলাল বললে—রাতে ঘুমোতে পারিনি মোটে সাহেব, মাথাটা দপ্‌—দপ্‌ করছে—

বললাম—কেন, অনেক গাড়ি ছিল বুঝি?

ছেদি প্যাটেল বললে—দুটো ইসপিশ্যাল আর দুটো ডাক-গাড়ি—একেবারে জান্‌ খেয়েছে মাস্টারবাবু—

খানিক পরে রামসহায় এসে গেল।

যাবার আগে ছেদি প্যাটেল বললে—আজ থেকে আমার নাইট-ডিউটি খতম সাহেব, রাত্রে অনেক গল্প করবো একসঙ্গে—আজকে খাসি কাটবো, দেরি করবেন না বেশি—

শিকার আমার শখের। আগেই বলেছি নেশাও নয়, পেশাও নয়। কিন্তু কদমকুঁয়ায় শিকার করতে গিয়ে যে-অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, তাতেই আমার খরচ মেহনত সব উশুল হয়ে গিয়েছিল।

মনে আছে সারা গায়ে কাদা-মাটি মেখে যখন ফিরলাম তখন সন্ধ্যে। রামসহায় আগে এসে ঝুলি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল।

সরস্বতীয়ার দেখি আর এক রূপ তখন। খোঁপায় ফুল গুঁজেছে। বেলকাঁটা গেঁথেছে। আমি ঘরে আসতেই সরস্বতীয়া এল।

বললে—কী শিকার মিললো সাহেব!

বললাল—শিকার কিছু পাই নি আজ।

হঠাৎ সরস্বতীয়া বললে—সাহেবের সাদি হয়েছে?

সাদি! সাদির কথা কেন জিজ্ঞেস করছে!

বললাম—সাদির কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

সরস্বতীয়া বললে—তবে হরিণ-ছানাটা ছেড়ে দিলে কেন সাহেব?

বুঝলাম রামসহায় আমার আগে এসে সব কথাই বলে গেছে।

হেসে ফেললাম—রামসহায় বলেছে বুঝি?

বেল্লারি জঙ্গলের মধ্যে জলার ধারে ঝোপের আড়ালে বসেছিলাম আমি আর রামসহায়। পালে পালে হরিণ আসছে কচি কচি ঘাস খেতে। সে এক দৃশ্য বটে। ঠিক দুপুরবেলা। ঝা-ঝা করছে রোদ্দুর। তবু যেখানটা বসেছিলাম, সেখানটায় ঝোপে জঙ্গলে অন্ধকার হয়েছিল।

রামসহায় বললে—মারুন হুজুর—

চুপ করতে ইঙ্গিত করলাম রামসহায়কে। তখন একটু শব্দ করলেই সবাই পালিয়ে যাবে। আস্তে আস্তে বন্দুকটা নিয়ে এগোতে যাচ্ছিলাম। মাঝখানে একটা শিঙেল হরিণ ছিল তাকে লক্ষ্য করে বন্দুকটা উঁচিয়েছিলাম,হঠাৎ রামসহায়েরগলার আওয়াজেসবাই দৌড় দিলে! ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সব। সব আয়োজন নষ্ট হলো। তাড়াতাড়ি বন্দুকটা লক্ষ্য করে মারলে একটা না-একটা পড়ত ঠিকই, কিন্তু তাতে

আনন্দ পেতাম না। ঠিক যেটাকে লক্ষ্য করেছি, সেটা না পড়লে যেন আনন্দ হয় না!

রামসহায়ের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠে আসছিলাম।

হঠাৎ দেখি একটা ছোট্ট ছুমাসের বাচ্চা হরিণ পাঁকের মধ্যে একেবারে ডুবে যায়-যায়! যতবার পালাতে যায় ততবার ডুবে যায় পাঁকের ওপর। ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লাম বাচ্চাটার ওপর। ঠ্যাংটা ধরে কাঁধে তুলে নিলাম। সারা গা কাদা হয়ে গেল।

রামসহায়ের খুব আনন্দ। বললে—ছেদি প্যাটেলের আজ খুব সুখ হবে হুজুর—

বললাম—কেন?

রামসহায় বললে—কচি হরিণের মাংস বুড়ো খুব খাবে—বুড়োর নোলা আছে খুব!

কাঁধের ওপর বাচ্চাটা ছটফট করছিল। হঠাৎ পাশের একটা ঝোপের দিকে কেমন একটা শব্দ হলো—চেয়ে দেখি একটা বড় মাদি হরিণ! নির্ভয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

রামসহায়ও দেখতে পেয়ে বললে—হুজুর—আর একটা—

কিন্তু তখন আর বন্দুক ছোড়বার উপায় নেই। বাচ্চাটা আমার কাঁধে। রামসহায়ের তাড়াহুড়োতে হরিণটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। একটা সরসর করে শব্দ হলো শুধু। বেল্লারির জঙ্গলে ঝোপে একটা শিরশির শব্দ কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াল। কোথাও কোনও দিকে হরিণের সাড়া শব্দ নেই। এপাশে-ওপাশে চেয়ে দেখলাম শুধু বুনো ঝাউ আর মহুয়ার বন, দূরে কয়েকটা চানা-ক্ষেত। ক্ষেত কাটা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে একটা-ছটো ক্ষেতে বড় বড় ঘাস জন্মেছে। জলার আশেপাশে শালুক আর নলখাগড়া। থমথমে পড়া জল। দুর্গন্ধ। স্রোত নেই, তরঙ্গ নেই। এই একটু আগেই পাল পাল হরিণ এখানেই জল খেতে এসেছিল, আবার তারা কোথায় চলে গেছে! তাদের চিহ্নমাত্রও নেই কোথাও। বাতাসে তাদের স্পর্শ গন্ধ কিছু

নেই। আরো কয়েক মাইল পথ গেলে তবে কদমকুঁয়া। সারাদিন পরিশ্রম গেছে খুব। মাথার ওপর রোদ্দুর নেমেছে এবার। কাদা জল মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছি আমি আর রামসহায়। হঠাৎ পাশে যেন আবার শব্দ হলো।

রামসহায় বললে—সেই হরিণটা হুজুর—

চকিতে ফিরে চেয়ে দেখি সত্যিই তাই। কাতর চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে আমার কাঁধের ওপর বাচ্চাটা রয়েছে—তার দিকেও যেন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই, দ্বিধা নেই—কিছু নেই। মনে আছে সেদিনের সেই হরিণটার দৃষ্টিতে যেন বড় এক জাদু ছিল।

রামসহায় বললে—বাচ্চাটা আমাকে দিন হুজুর—আপনি বন্দুক ধরুন আবার আসবে ও—

রামসহায়ের হাতে বাচ্চাটা দিলাম। সে সেটাকে জাপটে ধরে রইল জোর করে।

আমরা চারিদিকে চাইতে চাইতে চলতে লাগলাম এবার। জলাজমি পেরিয়ে এবার ডাঙায় উঠে এসেছি। সারা শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে। যখনি ছায়ায় এসে দাঁড়াই শরীরটা যেন জুড়িয়ে যায়।

হঠাৎ একটা ঝোপের পাশেই আবার শব্দ হলো খস্-খস্-খস্—

রামসহায় চুপিচুপি বললে—ওই এসেছে হুজুর—

এত কাছে! এত কাছে তো কোনও হরিণ কোনও শিকারীর কাছে আসেনা। মনে হলো প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যেন আমার দিকে তাকিয়ে কী বলছে।

রামসহায় বললে—দেরি করবেন না—মারুন, মেরে দিন—

বন্দুকটা বাগিয়ে ধরলাম—

রামসহায় পাশেই চুপ করে হরিণটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হরিণটাও আমাদের দিকে চেয়ে দেখছিল।

রামসহায় আবার বললে—মারুন, মারুন,—দেরি করবেন না—

মনে আছে সেদিন সেই হরিণটার দিকে কিছুতেই বন্দুক ছুড়তে পারিনি। বারো বোরের বন্দুকটা যেন হঠাৎ বড় ভারী মনে হয়েছিল আমার কাছে। আস্তে আস্তে বন্দুকটা নামিয়ে ফেললাম। মনে হল—হরিণটার চোখ দিয়ে টস্‌টস্ করে জল পড়ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে রামসহায়ের কোল থেকে বাচ্চাটা নিয়ে ছেড়ে দিলাম তার সামনে—

রামসহায় বললে—করলেন কী হুজুর—করলেন কী—

বাচ্চাটা ততক্ষণে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে!

কেন যে সেদিন বাচ্চা হরিণটাকে অমন করে ছেড়ে দিয়েছিলাম জানি না, কিন্তু অন্তরে বড় তৃপ্তি পেয়েছিলাম এইটুকু শুধু মনে আছে। শিকারের নেশা বেশীদিন ছিল না। বিলাসপুর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার শিকারের নেশাও ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু ঘটনাটা স্পষ্ট মনে আছে আজও। আর মনে আছে ওই সরস্বতীয়ার জন্যেই—

সরস্বতীয়া বললে—তোমার লেড়কার কত বয়েস সাহেব?

বললাম—তোমার যখন ছেলে হবে তখন বুঝবে, মা-র কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিতে কেমন লাগে?

সরস্বতীয়া খিল খিল করে হাসতে লাগল মুখে কাপড় চাপা দিয়ে।

বললাম—হাসছো যে?

হাসির শব্দ শুনে মুরলীও এসে দাঁড়াল।

বললাম—দেখছ মুরলী, তোমাদের সরস্বতীয়ার হাসি দেখছ—

মুরলী বললে—থাম্ থাম্ পোড়ারমুখী, থাম্ অত হাসি কেনলো? হাসি বেরিয়ে যাবে তোর, আজ ওর দিন-ডিউটি জানিস্ না—?

মুরলীর কথার মানে আমি বুঝতে পারলুম না! কিছু হয়ত একটা ছিল। কথাটা শুনেই সরস্বতীয়া যেন কেমন ভয়ে আঁতকে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে হাসি থামিয়ে ভেতরে পালিয়ে গেল। বললাম, দিন-ডিউটির কথা শুনে সরস্বতীয়া অমন করে পালিয়ে গেল কেন?

মুরলী বললে—পোড়ারমুখীর মরণ হয়েছে সাহেব, পোড়ারমুখীও মরবে, আমাকেও মেরে ফেলবে দেখে নিও—

টিল্‌ডা এক অদ্ভুত জায়গা! শুধু টিল্‌ডা নয়। রাজনন্দ্‌গাঁ, হাতবান্ধ্‌, ডোঙ্গরগড়—ছত্রিশগড়ের সব জায়গাই অদ্ভুত! লোকে কথায় বলে—ছত্রিশ স্বামীর ঘর করলে তবে ছত্রিশগড়ী মেয়ের জীবন সার্থক হয়—যৌবন ধন্য হয়!

প্রথম যখন বিলাসপুরে এসেছিলাম স্টেশনের প্লাটফরমে মেয়ে-কুলি দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। হাটেবাজারে মেয়ে-কুলি! গোলগাল চেহারা, নধর গড়ন। আর পুরুষগুলো ক্ষয়াক্ষয়া, রোগা-রোগা, কুৎসিত।

বিলাসপুরের ডাক্তার সিন্‌হা বলেছিলেন—এখানকার জল হাওয়ার গুণ এটা মশাই, এখানে এলে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যায়—পুরুষদের চেহারা খারাপ হয়ে যায়—

বলেছিলাম—কেন?

কেন-র উত্তর ডাক্তার সিন্‌হা দিতে পারেন নি। আমিও কেন-র উত্তর পাইনি কোনও দিন। দেখেছি দিনের পর দিন মেয়েরা মাথায় মোট বয়ে বয়ে বেড়িয়েছে, রাত্রে রঙিন শাড়ি পরে মদ খেয়েছে পেট ভরে। কোথা থেকে যে এত যৌবন এত স্বাস্থ্য পেত ওরা, কে জানে। রায়পুরে গেছি, মহেন্দ্রগড়ে গেছি, মাল নিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি নির্দিষ্ট জায়গায়-একটা মাল খোয়া যায়নি। বাজারে গিয়ে হাটের মধ্যে সাইকেল রেখে দু-ঘন্টা ধরে বাজার করেছি-কেউ ছোঁয়নি সে-সাইকেল। বুঝলাম—ছেদি প্যাটেলের এই যে বোল-বোলা সব ওর বউদের জন্যে। সকালবেলাই ওর বড় বউ যে কাজ করতে নামে—আর থামে সেই রাত্রে। ছেদি প্যাটেলের সাতদিন দিন-ডিউটি আর সাতদিন রাত-ডিউটি। সাত দিন দিনের বেলায় কাজ, আর সাত দিন রাতের বেলা।

রাত্রে ছেদি প্যাটেল বললে—এবার আমিও আপনার সঙ্গে বিলাস-পুরে যাবো সাহেব।

বললাম কেন ? বিলাসপুরে তোমার কী কাজ ?

ছেদি বললে—বিলাসপুরে চানার দর ভালো উঠছে শুনেছি—

বললাম—কোথায় বেচ তুমি চানা ?

ছেদি প্যাটেল বললে—রায়পুরে, রায়পুরে মাড়োয়ারী মহাজন ভালো দর দেয় না—

বললাম—দর দেয় না কেন ?

দর কেন দেয় না ছেদি প্যাটেল খুলে বললে আমাকে।

বললে—আমরা যে লিখিপড়া জানিনা সাহেব, মহাজন আমাদের দাদন দেয়, চাষের আগে টাকা দেয়, তারপর ক্ষেতি হলে আপোস হয়ে যায়—

বললাম, তা তুমি টাকা নাও কেন আগাম ? তোমার অভাব কী ?

ছেদি প্যাটেল বললে—ওই সরস্বতীয়া। সরস্বতীয়াকে দেখেননি—আমার ছোট ডোকিটা ওর জন্যে --

বললাম—ওর জন্যে মাড়োয়ারীর কাছ থেকে আগাম নিয়েছিলে ?

ছেদি প্যাটেল বললে—হাঁ সাহেব, টাকা আমার দরকার ছিল না, কিন্তু দরকার ছিল সরস্বতীয়ার বাবার—

বললাম—সরস্বতীয়ার বাবা কে ?

সরস্বতীয়ার বাবার গল্পও বললে ছেদি প্যাটেল।

সেই গল্পটা শুনুন।

রাজনন্দ্গাঁ এখান থেকে সাত মাইল দূর ! সাত মাইল দূরে ছেদি প্যাটেল গিয়েছিল ছট্-পরবের মেলা দেখতে। হলুদ-ছোপানো কাপড় পরে ওই সরস্বতীয়ার বাপ জেঠু রাউত এসেছিল শনিচরির মেলায়। সেদিন ভিড়ে ভিড় হয়ে যায় মেলার মাঠ। ওই রাজনন্দ্গাঁ, ওই হাতবান্ধ্, ওই শিউ-তালাও, বুধনপুর থেকে দলে দলে লোক আসে। কাঁদি কাঁদি কলা, কুলোয় করে কড়ি আর ক্ষেতির চাল এনে পূজো দের। আছপা নদীর ধারে-গিয়ে পিদিম ভাসিয়ে আসে সার সার।

সেই ভোর থেকে শুরু হয় তাদের পূজো—রাত ন-টা দশটা পর্যন্ত সে ভিড় কাটে না। রাস্তায় চলতে পারি না - এত ভিড়। বিলাসপুরেও আমি দেখেছি, রায়পুরেও দেখেছি, ডোঙ্গরগড়েও দেখেছি। তেলে-ভাজার দোকান বসে যায় মেলা-তলায়। পাঁপর ভাজার গাদি লেগে যায় দোকানে দোকানে। ছত্রিশগড়ী মেয়েদের ভিড়ে নড়বার জায়গা পাওয়া যায় না। গায়ে গা ঠেকে যায়! গায়ে গা ঠেকে গেলে হেসে গড়িয়ে পড়ে। এ ওর গা ঠেপে, ও ওর গা টেপে। সেদিন তেল-সিঁদুর হলুদ বেরোয় হাঁড়ি থেকে। কাঠের চিরুনি আয়না বেরোয়। আঁট তেল-চপ্‌চপে করে খোঁপা বাঁধে। তেল গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে। এ-গাঁয়ের প্যাটেলের সঙ্গে ও-গাঁয়ের প্যাটেলের দেখা হয়। খবরাপবর আদান-প্রদান হয়।

একজন বলে—তোমাদের শিউ-তালাওএর খবর কী গো?

আর একজন বলে—তোমাদের বুধনপুরের খবর কী?

খবরাখবর নেবার বেশি সময় থাকে না। ছত্রিশগড়ের ধুলোর ঝড় উঠে চোখে-মুখে ঢুকে পড়ে। ভিড়ের ঠেলায় কাছের মানুষ ছিটকে চলে যায় দূরে। হলুদ-মাখা গায়ে গায়ে ধাক্কা লেগে নিজের মেয়ে পরের মেয়ে হয়ে যায়। ওই দিন ঘরের বউ চিরকালের মত পরের বউ হয়ে যায়। সারা জীবনে আর তার পাত্তা পাওয়া যায় না। জোয়ান মেয়ে বাপ-মায়ের সঙ্গে মেলায় এসে কোথায় হারিয়ে গিয়ে যে কার ঘরে ওঠে, আর কখনও তার হদিস পাওয়া যায় না। রাজনন্দগাঁর মেয়ে চলে যায় কুদমকুঁয়ায়—কুদমকুঁয়ার ছেলে চলে যায় শিউ-তালাওতে। ওই দিন পশরা সাজিয়ে আসে শেঠজীরা। সোনা-চাঁদির দোকানে গয়না সাজিয়ে বাহার করে। সেখানে গিয়ে চুড়ি পড়িয়ে নতুন বিয়ে হয় ছত্রিশগড়ী ছেলে-মেয়ের। পাঁচ বউকে নিয়ে বেড়াতে এসেছে স্বামী—হঠাৎ ভালো লাগলো আর একটা মেয়েকে তখনই কথাবার্তা হয়ে গেল বাপ-মায়ের সামনে—শেঠজীর দোকানে গিয়ে রূপোর চুড়ি পরিয়ে দিলে দু-হাতে—সঙ্গে সঙ্গে ছ-টা বউ হয়ে

গেল। এক মুহূর্তে। পাঁচটা বউ নিয়ে মেলায় গিয়েছিল:একটা মরদ—বাড়ি ফিরলো ছ-টা বউ নিয়ে।

বললাম—তা তুমি বুঝি চুড়ি পরালে সরস্বতীয়াকে ?

ছেদি প্যাটেল বললে—হুজুর, মুরলীকে জিজ্ঞেস করুন, আমার চুড়ি পরানোর সাধ ছিল না মোটে—আমি বুড়ো হতে চললাম—আমার কি আর চুড়ি পরানো মানায়—

সেই কথাই বলেছিল জেঠু রাউত। রাজনন্দগাঁও-এ জেঠু রাউত।

জেঠু রাউতের ভাগ্য ভালো।

ছেদি প্যাটেল বললে—জেঠু রাউতের কপালটা ভালো সাহেব, মেয়েগুলো হয়েছে সব দুধের মত সাদা ধপধপে ফরসা—

সরস্বতীয়াকে দেখে সত্যিই ছত্রিশগড়ী সমাজের বলে হঠাৎ মনে হয় না। বললাম—হঠাৎ অত ফরসা হলো কেন ছেদি ? জেঠু রাউত বুঝি খুব ফরসা—

ছেদি প্যাটেল বললে—কে জানে কেন ফরসা হলো অত। ওই মুরলীই তো ধরলে অত করে—বললে—ওকে চুড়ি পরাও, তোমার ফরসা বিটা হবে—

ফরসা ছেলের সাধের কথা শুনে খুব হাসি এলো আমার। ছেদি প্যাটেলও খুব হাসতে লাগলো আমার সঙ্গে। আমিও যত হাসি, ছেদি প্যাটেলও তত হাসে। হাসির কথাই বটে। কালো তেল-কুচকুচে ছেদি প্যাটেলের ছেলে দুধের মত ফরসা হবে ভাবলে হাসি আসাই স্বাভাবিক।

ছেদি প্যাটেল বললে—ওই আমার মুরলীকে জিজ্ঞেস করুন হুজুর, আমার কোনও দোষ নেই, আমি তো বলেছিলাম—দরকার নেই মুরলী—

বললাম—তা থাক্ গে, তারপর ?

ছেদি প্যাটেল বললে—তারপর শেঠজীর দোকানে গেলুম সাহেব, চুড়ি পরালুম আর সরস্বতীয়াকে নিয়ে এলুম কদমকুঁয়ায়—

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—তা ওর বাপ জেঠু রাউত কিছু বললে না? বুড়োর কাছে দিতে আপত্তি করলে না?

ছেদি প্যাটেল অবাক হয়ে গেল।

বললে—আপত্তিটা কেন করবে জেঠু রাউত? জেঠু রাউতের তো ক্ষেতি হয় নাই—ক্ষেতিটা তার কী হলো বলুন?

বললাম—তার ফরসা মেয়েটা তোমার মত বুড়োর হাতে না-হক্ দিয়ে দেবে তা বলে?

ছেদি প্যাটেল হাসলো। বললে—তেমন পাঁচ কুড়ি টাকা যে দিয়ে দিলাম জেঠুর হাতে নগদ-নগদ?

ছেদি প্যাটেলের কাছেই শুনেছিলাম সে-ইতিবৃত্ত।

শেঠজীর তেজারতী কারবার। ছত্রিশগাড়ী মেয়ে-মরদের লেন-দেন সব তার হাতে। রাজনন্দগাঁওয়ের স্টেশন-পটিতে তার গঁহুর কারবার। গঁহু, চাউল, বাজার, জোয়ার। রেলগাড়িতে চালান যায় দূর-দূর দেশে। মুড়ির চালান যায় শালিমারে। আরমেনিয়ান ঘাটে যায় তামাকপাতার চালান। শেঠ বনোয়ারী বললে সারা ছত্রিশগড়ের লোক চিনতে পারে তাকে। বিলাসপুরের হেড-অপিসে বনোয়ারীর লোক আছে, তার মাসোহারা বন্দোবস্ত আছে। এমাসে বিশখানা ওয়াগন যাবে আরমেনিয়ান ঘাটে, ওমাসে তিরিশখানা ওয়াগন-পিছু রেল অফিসের বড়বাবু পাবে একশো টাকা, মেজবাবু পাবে পঞ্চাশ টাকা। আর সব চেয়ে বড় ডি-টি-ও-র বাড়ি সরু চাল, খাঁটি গাওয়া ঘি, মিহি ময়দা সব বরাদ্দ আছে। বনোয়ারীর ব্যবস্থা ভালো।

সেই বনোয়ারী শেঠ মেলার দিনে সেখানে গিয়ে দোকান পাতে। কখনও রাজনন্দগাঁওয়ে, কখনও শিউ-তালাওএ, কখনও রামটেক-এ। টাকা ধার দেয় ছত্রিশগড়ীদের গয়না বন্ধক রেখে। প্যাটেলদের গয়না বন্ধক দিতে হয় না। হাতের টিপ-ছাপই যথেষ্ট। ক্ষেতের চানা আছে তাদের, ক্ষেতের অড়হর আছে তাদের। টাকা আদায়ের জন্য তাদের

ভাবতে হয় না। বনোয়ারীর লোক গিয়ে ফসল ক্রোক করে! টাকা আদায় হয়ে যায়।

বনোয়ারী বললে—তোর কি চাইরে ছেদি প্যাটেল?

ছেদি প্যাটেল, মুরলী, জেঠু রাউত, জেঠু রাউতের মেয়ে সরস্বতীয়া সবাই দোকানে গিয়ে বসলো। রুপোর হাঁসুলী, রুপোর পয়জোর, রুপোর চুড়ি, সবই সার সার সিন্দুকে সাজানো আছে।

বনোয়ারী আবার বললে—কাকে চুড়ি পরাবি রে ছেদি?

ছেদি প্যাটেল বললে—পাঁচ কুড়ি টাকা চাই শেঠজী সাহেব—টিপ-ছাপ্ দেব -

বনোয়ারী যে বনোয়ারী সে-ও একবার সরস্বতীয়ার দিকে চাইল। বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করতে চাইলে পাঁচ কুড়ি টাকা দেবার মত গস্ত কি না। ফরসা রঙ মেয়েটার, দুধের মত ধব্‌ধবে। বছর ষোলো আন্দাজ বয়েস। পান খেয়েছে, শাড়িতে হলুদ ছুপিয়েছে। চুলে তেল মেখে আঁট-খোপা বেঁধেছে। ছটফট করছে ছুঁড়িটা। যৌবনের ছট্‌ফটানি ধরেছে।

বনোয়ারী চোখ ফিরিয়ে নিলে। ছত্রিশগড়ী মেয়েমানুষ অনেক দেখছে। তবু এ-ছুঁড়িটা যেন সস্তায় গস্ত হচ্ছে মনে হল তার।

বনোয়ারী বল্লল পাঁচকুড়ি টাকা?

জেঠু রাউত বললে—পাঁচ কুড়ি টাকার কমে আমি ছাড়ব না শেঠজী সাহেব, দেখ না আমার মেয়ের দিকে, চোখ মেলে দেখ।

বলে জেঠু রাউত মেয়েকে বললে—দাঁড়া, ঘুরে দাঁড়া—

সরস্বতীয়া ঘুরবে না। তবু এদেরও গোঁ কম নয়। ছেদি প্যাটেল তো আগেই ভালো করে দেখে নিয়েছে। মেলার ভিড়ের মধ্যে গায়ে গা-ও ঠেকিয়েছে। মুরলীও দেখে শুনে পরখ করে পছন্দ করে দিয়েছে। দেখে নি শুধু বনোয়ারী। বনোয়ারী শেঠই তো টাকা দেবার মালিক। তাকেও দেখানো দরকার বটে!

জেঠু রাউত বললে—ঘোর্ না, ঘুরে দাঁড়া না সরস্বতীয়া—

সরস্বতীয়া খিল্‌খিল্‌ করে হাসছিল এতক্ষণ। এবার রেগে গেল। কী দেখবে আমার, দেখুক না—বলে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো।

ছেদি প্যাটেল বললে–তা পাঁচ কুড়ি টাকা তুমি একটু বেশিই নিচ্ছ জেঠু রাউত—পাঁচ কুড়ি টাকাটা কম হলো ?

জেঠু রাউত বললে—আমার বউ নাই, এই একটি মেয়ে—বউ থাকলে না হয় আরেকটা মেয়ে হতো—আর তো মেয়ে হবে না—মহাজনের দেনা শোধ করতে হবে তাই বেচেছি মেয়েকে, নইলে কি—

মেযেটা তখনও দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল।

জেঠু রাউত দর-কষাকষি দেখে তেতে উঠেছে। বললে—দেখ তো সরস্বতীয়া ভালো করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখা তো

সরস্বতীয়া ঠোঁট উল্টে বললে– দেখলে তো এতক্ষণ আবার কত দেখবে

জেঠু রাউত বললে দেখুক না, তাতে তোর ক্ষতি কি ?

বলে জেঠু মেয়েকে হাত ধরে ঘুরিয়ে পেছনে ফিরিয়ে দিলে।

সরস্বতীয়া পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল।

জেঠু রাউত বললে—দেখ, মেয়ের গড়ন পেটন দেখ দেখছো গো প্যাটেল, শেষে বলতে পারবে না। জেঠু রাউত মেলার ভিড়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি টাকার লোভে ঠকিয়ে দিয়েছে বেশ ভালো করে চক্ষু জুড়ে দেখে নাও তুমিও সাক্ষী থাকলে শেঠজী সাহেব—

সত্যিই সেদিন সাক্ষী ছিল সবাই। সবাইকে সাক্ষী রেখে ছেদি প্যাটেল সরস্বতীয়াকে ঘরে নিয়ে এসেছিল।

বনোয়ারী গুনে গুনে টাকা দিয়েছিল। পাঁচকুড়ি টাকা।

ছেদি প্যাটেল বললে আমি পাঁচ কুড়ি টাকা গুনে শোধ করেছিলাম সাহেব, জেঠু রাউত সেই টাকা গুনে গুনে ট্যাঁকে পুরে নিয়েছিল তবে ছেড়ে ছিল সরস্বতীয়াকে --

বললাম তারপর ?

ফুরফুরে মেয়েটা কোথায় কোন রাজনন্দগাঁ-র গ্রামে চানা, ক্ষেতের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। হয়ত বর্ষার দিনে তালাওতে জল তুলতে গিয়ে আনমনা হয়ে পড়তো মেঘ দেখে। মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ছুটতো তার মন। এ-গাঁ থেকে ও গাঁ। তারপর রেললাইন পেরিয়ে বুধনপুর ছাড়িয়ে টিলডার মিশনারী সাহেবদের আস্তানা টপ্‌কে অনেক অনেক দূরে চলে যেত সরস্বতীয়া যেখানে বেল্লারীর জঙ্গলের বুনো শূয়োর এসে শহুরের ক্ষেত নষ্ট করে যায়, চানার চারা নষ্ট করে দিয়ে যায় হরিণের পাল—সেখানেও চলে যেত একেক দিন।

জেঠু রাউত চিৎকার করে ডাকতে—সরস্বতীয়া, ওসরস্বতীয়া-দূরে রেললাইন ধরে একটা মালগাড়ি আসছিল ঝিক্-ঝিক্ করে। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে ছুটে হয়রান হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তো সরস্বতীয়া। তারপর গার্ড সাহেবের দিকে চেয়ে 'আয়' 'আয়' করে হাত নেড়ে ডাকতো!

জেঠু রাউত বলতো - সরস্বতীয়ার বিয়েতে পাঁচ কুড়ি টাকা নেব।

তখন সরস্বতীয়া ছোট। বিয়ের কিছু বুঝতো না। মিশনের বুড়ো পাদরি সাহেব এসে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াত।

পাদরি সাহেব বলত—জেঠু রাউত, তোমার মেয়েকে মিশনে দাও। লেখাপড়া শিখবে, মানুষ করে নেব ওকে আমরা!

জেঠু বলত, মেয়ে আমার লেখা-পড়া শিখে কি করবে পাদরিবাবা?

পাদরি সাহেব বলতো—মানুষ হবে লেখাপড়া শিখে জ্ঞান হবে, খ্রীষ্টান হবে, আমাদের লর্ড সব পাপ ক্ষমা করবে।

জেঠু রাউত বলত—পাপ কিসের সাহেব, আমার মেয়ের পাপ কী! উ-ও তো পাপের কিছু করে নাই।

পাদরি সাহেব ভয় দেখাতো - পাপ করে নাই? তাহলে তোমরা মাটির ঘরে কেন বাস করো, কেন তোমাদের রোগ হয়?

জেঠু রাউত বলতো—আমাদের তো রোগ-জারি নাই?

পাদরি সাহেব বলতো—বলছো কী! রোগ নাই?

জেঠু রাউত বলতো—কী রোগ আছে ?

পাদরি সাহেব বলতো—গর্মী রোগ, পারারোগ—তোমাদের পাপ আছে, তাই রোগ আছে, তোমাদের পাপ দূর করো, তোমাদের রোগও দূর হবে।

পাদরিদের হাতে জেঠু রাউত মেয়েকে ছাড়েনি সেদিন।

শিউ-তালাও-এর মোহন বেয়ারা, সে-ও এসে খোসামোদ করেছিল অনেকদিন। বলেছিল—আমার ডৌকিটা মরে গেল—জেঠু, এবার তোমার বেটিটাকে দাও—চুড়ি পরাবো।

মোহন বেয়ারাকে মেয়ে দিতে আপত্তি ছিল না জেঠু রাউতের। শিউতালাওএ তার নিজের ঝুপড়ি আছে। মেহনত করবার মত শরীরের জুত আছে, তেমন ডৌকি একটা পেলে মোহন বেয়ারা মনের মত ঘর বানায়। তারপর ক্ষেতি-খামারে কাজ করে টাকা জমাবে, ডৌকিকে শাড়ি দেবে গয়না দেবে, সুখে রাখবে। অনেক কথা অনেক আশার কথা শোনালে মোহন বেয়ারা।

জেঠু বললে—টাকা কতগুলি দেবে, সেটি বড় কথা আছে !

মোহন বেয়ারা বললে—আমি দুকুড়ি টাকা দিব নগদ—

—দু-কুড়ি। জেঠু রাউত ঘেন্নায় এক ধাবড়া থুতু ফেললে উঠনে।

বললে—তোমার দু-কুড়িতে হবে না মোহন বেয়ারা—বুধনপুরের শিবু কাহার তিনকুড়ি টাকা দিতে চেয়েছে, নাই-ই বলে দিইনি—

মোহন বলেছিল—তা আমিও তিনকুড়ি টাকা দিচ্ছি, নাও না, সরস্বতীয়াকে মনে ধরেছে বলেই বলছি, নইলে টাকা আমার সস্তা নাকি ? আমারও তো মেহনতের টাকা—

জেঠু রাউত বলেছিল—তিন কুড়ি টাকা দেবে তো শিউ-তালাওএর সুখমোচন কুর্মির কাছে যাও—তাও কালোপেঁচি মেয়ে আছে, তাকে পাবে, তাহলে আর আমার দিকে নজর দিও না—

এ-সব কথা সরস্বতীয়ার মনে আছে। ছেদি প্যাটেলের মনে আছে শিউ তালাও, কদমকুঁয়ার সমস্ত গাঁয়ের লোকের মনে আছে। সেদিন

জেঠু রাউত মোহন বেয়ারার হাতে তুলে দেয়নি মেয়েকে। তিন কুড়ি নগদ টাকার লোভও অতি কষ্টে সম্বরণ করেছিল সে, ইচ্ছে ছিল আরো দর উঠবে। চার কুড়ি দর উঠলে তখন বেচবে মেয়েকে। কিন্তু হাতের কাছে একেবারে পাঁচ কুড়ি টাকা পেয়ে যাওয়ায় বুড়ো ছেদি প্যাটেলের হাতে সরস্বতীয়াকে তুলে দিলে।

ছেদি প্যাটেল রাজনন্দগাঁ-র মেলা থেকে চুড়ি পরিয়ে যেদিন প্রথম নতুন ডৌকি নিয়ে এসেছিল, সেদিন সবাই দেখতে এল।

যারা জানত না তারা জিজ্ঞেস করলে—কোথাকার মেয়ে।

মুরলী বললে—রাজনন্দগাঁ-র জেঠু রাউতের মেয়ে।

ওরা বললে—নাম কী গো তোমার ডৌকি?

মুরলী বললে—সরস্বতীয়া।

—চুড়ি পরাতে কত টাকা লাগলো গো?

মুরলী বললে—পাঁচ কুড়ি টাকা জেঠু রাউত গুনে নিয়েছে গো বনোয়ারী শেঠের দোকান থেকে। এই দেখ রূপোর চুড়ি পরেছে হাঁসুলী পরেছে—পায়ের বিছে মল, সব দিয়েছে এই আমার মরদ।

ডৌকি দেখে সবাই খুশী। হাত পা টিপে টিপে দেখলো সবাই। চুল টেনে মেপে দেখলো। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলো। পাঁচ কুড়ি টাকার চুড়ি পরানো ডৌকি! ছেদি প্যাটেলের ডৌকি। টিল্‌ডা রেল-গেটের গেট-ম্যান ছেদি প্যাটেল।

সরস্বতীয়া সেদিন সেখানে এসে ভাবতো রাজনন্দগাঁর কথা। সেই শিউ-তালাওএর রেল-গাড়ির কথা। ঝিক্‌ঝিক্ করতে করতে রেলগাড়ি যেত জোয়ারের ক্ষেতের ধার দিয়ে দিয়ে। খুব জোরে যেত রেলগাড়ি-গুলো। ছুটে ছুটে পাল্লা দিয়ে দৌড়িয়েও নাগাল পাওয়া যেত না। পিছনে বসে থাকতো সাদা-মুখো গাড সাহেব। সরস্বতীয়া কখনও ভেঙচি কাটতো, তার দিকে চেয়ে থুতু ছুঁড়তো। তারপর আকাশের

মেয়গুলোর দিকেও চেয়ে দেখতো সরস্বতীয়া। ওগুলোও আর দেখতে পাবে না।

মুরলী এসে তালাও-এ নিয়ে গেল। সাজিমাটি দিয়ে গায়ের ময়লা পরিষ্কার করে দিলে। চুলের উকুন বেছে দিলে।

মুরলী বললে—মন কেমন করছে জেঠু রাউতের জন্যে ? হ্যাঁরে সরস্বতীয়া—বল্ না।

সরস্বতীয়া ঠাণ্ডা তালাও-এর ভেতর গলা-ডুবিয়ে দিয়ে রইল। কিছু বুঝতে পারলে না। জেঠু রাউতের জন্যে মন-কেমন করার কথা নয়। জেঠু রাউত পাঁচকুড়ি টাকা নগদ নিযে আবার কত কুড়ি টাকা দিয়ে কাকে চুড়ি পরাবে কে জানে !

গায়ে হাতে বুকে পায়ে সর্বত্র সাজিমাটি ঘষে দিতে লাগলো মুরলী। বললে—মরদ এখন দিন-ডিউটিতে গেছে, রাতের বেলা বাড়ি থাকবে—জানিস্।

সরস্বতীয়া কিছু কথা বললে না। মুরলী বললে—মরদ আজকে তোর ঘরে শোবে, ভয় পাসনি যেন, বুঝলি তো ?

সরস্বতীয়া বললে—আমি তবে তোমার কাছে শুবো দিদি।

মুরলী বললে—ছিয়া ছিয়া, আমি তো বুড়ি ডৌকি, আমার কাছে মরদ শুবে কেন, তুই নতুন ডৌকি, মরদ তোর ঘরে শুবে আজ।

সরস্বতীয়া বললে—আমার ভয় করবে দিদি।

মুরলী অভয় দিলে। বললে প্রথম-প্রথম ভয় করবে—তারপর মনে লাগবে আমি নিজে তোকে মরদের ঘরে ঢুকিয়ে আসবো, তুই চেঁচাস্ নে যেন ভয় পেয়ে।

সরস্বতীয়ার প্রথম জীবনের এ-সব ইতিহাস আমার জানার কথা নয়। আমি সরস্বতীয়ার জীবনে আগে কখনও আসি নি। ছেদি প্যাটেলকেই চিনতাম। ছেদি প্যাটেলের একটা সমস্যার কথা জানতাম। বিলাসপুর থেকে তার টিল্ডায় বদলি হওয়ার সমস্যা। সেই সমস্যার

কথাই সে আমাকে বার বার বলেছে ; কিন্তু এ-সব কথা আমি পরে শুনেছিলাম রামসহায়ের কাছ থেকে।

সেদিন খুব ক্লান্তই ছিলাম। সারা দিন বিল্লারির জঙ্গলে জলা-জমিতে হরিণের পেছনে কাঠফাটা রোদের মধ্যে কাটিয়ে শরীর আর বইছিল না ! ছেদি যখন উঠোনের খাটিয়ায় বসে বসে তার সুখ-দুঃখের কথা বলছিল তখন একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।

ছেদি প্যাটেল বলছিল—ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি সাহেব ?

বললাম—তোমার বুঝি আজ রাতে ডিউটি নেই ?

ছেদি প্যাটেল বললে—আজকে তো বেশ আরাম করে ঘুমোব সাহেব—কাল ভোরে আবার ডিউটি দিতে যাবো !

—তোমার সকাল বেলার ভাত ?

ছেদি প্যাটেল বললে—হ্যাঁ হুজুর, তারপর ওই মুরলী ভাত দিয়ে আসবে গেট-এ গিয়ে, সরস্বতীয়া তো যাবে না।

—কেন, সরস্বতীয়া যাবে না কেন ?

ছেদি প্যাটেল বললে—ওই যে বলেছিলাম হুজুর, ভাতটা, তা-ও দিয়ে আসতে পারবে না সরস্বতীয়া, অথচ দেখুন সাহেব, বনোয়ারী শেঠের কাছে টিপ-ছাপ দিয়ে পাঁচ কুড়ি টাকা দিয়েছি তো জেঠু রাউতকে ওরই জন্যে।

বললাম—একটু বয়স কম তো, লজ্জা করে, ভয় করে হয়তো।

ছেদি বললে—হুজুর ভয় না ছাই, লজ্জা না ছাই, অপগেরাহ্যি।

বললাম—না না, একটা তোমার ভুল ধারণা ছেদিলাল। তোমাকে অপগ্রাহ্য করবে কেন ? তোমারই তো চুড়ি-পরানো ডৌকি সরস্বতীয়া !

ছেদি প্যাটেল বললে—হুজুর, আপনি হলেন বাঙালী, আপনি ছত্রিশগড়ীদের চুড়ি-পরানো ডৌকির কী জানবেন ? আপনাদের ডৌকিরা কত সেবা করে, যত্ন করে আপনাদের। আমি তো পেলেটিয়ার সাহেবের বউকে দেখেছি !

পি-ডব্লু-আই সাহেবের পারিবারিক কাহিনী শোনবার ইচ্ছে ছিল না আমার, সুতরাং আমি সে-কথায় কান দিলাম না। ক্রমে মুরলীর খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল, সরস্বতীয়ারও খাওয়া-দাওয়া সারা। কদম-কুঁয়ার আকাশে ঘন-ঘন তারা ফুটছে। চিত হয়ে খাটিয়ার ওপর শুয়ে শুয়ে ছেদি প্যাটেলের গল্প শুনছিলাম।

বললাম—এবার তুমি শুতে যাও ছেদি, আমার ঘুম পেয়েছে।

মনে আছে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজের খাটিয়ার ওপর।

আজ ছেদি প্যাটেলের দিন-ডিউটি আরম্ভ হলো। ছেদি বাড়িতেই শুয়েছে আজ, তবু টর্চটা বালিশের কাছে রেখে শুয়েছিলাম। শিকারীর টর্চ। বন্দুকটাও মাথার কাছে দাঁড় করানো ছিল!

হঠাৎ একটা আচমকা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। সামান্য শব্দতেই ঘুম ভাঙে আমার। ঘুম আমার খুব সজাগ। ডি-কস্টা সাহেবের কাছে শিখেছি। শিকারে গিয়ে অঘোরে ঘুমোতে নেই।

ডি-কস্টা সাহেব বলতো—স্লিপ লাইক এ ডগ্ মিস্টার, ডোণ্ট্ স্লিপ লাইক এ স্নেক্।

কুকুরের মত নাকি ঘুমোন উচিত শিকারীর, সাপের মত নয়। সাপ ছ-মাস নাকি না-খেয়ে ঘুমিয়ে কাটাতে পারে। আমি অবিশ্যি এ-কথা জানি না। ডি-কস্টা সাহেব যখন বলেছে তখন মিথ্যে হবার কথা নয়।

শব্দটা যেন উঠোনের দিক থেকে আসছে!

কী হলো! ছেদি প্যাটেলের বাড়িতে চোর পড়লো নাকি!

মনে আছে সেদিন ভয় যে পাইনি তা নয়। খুব ভয়ই পেয়েছিলাম। অন্ধকারের মধ্যেই টর্চটা হাতে নিলাম—বন্দুকটা ধরলাম আর একটা হাতে সবই ঠিক জায়গায় আছে।

যেন খুব বকাবকি চলেছে বাইরে। কেউ যেন কাকে মারছে খুব। চাপা কান্নার শব্দ আসছে। মুখে আঁচল চেপে ধরেছে—চিৎকার না করতে পারে।

আর একটা পুরুষের গলা! চোর, না বদমাইস, না গুণ্ডা! অত্যাচার করছে কেউ মেয়েদের ওপর! সরস্বতীয়া কি? ছেদি প্যাটেল হয়ত কয়েক রাত নাইট ডিউটির পর অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। হয়তো কিছুই টের পায়নি সে!

জেঠু রাউত নাকি তবে। হয়ত পাঁচ কুড়ি টাকায় আশ মেটেনি, আরো চায়, তাই সরস্বতীয়াকে লুকিয়ে চুরি করে নিয়ে যেতে এসেছে। আরো এক কুড়ি টাকার চাপ দেবে। কিংবা এসেছে শিউ-তালাও এর মোহন বেয়ারা। তিন কুড়ি টাকায় চুড়ি পরাতে চেয়েছিল সরস্বতীয়াকে। টাকার জোরে ছেদি প্যাটেল নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। রাত্রের অন্ধকারের সুযোগে তাই এখানে এসেছে মোহন বেয়ারা! কিংবা বুধনপুরের শিবু কাহার, সেও পায়নি সরস্বতীয়াকে।

এ রকম ঘটনা আগেও দেখেছি। বিলাসপুরের যে বাড়িতে থাকতাম তার সামনে ছত্রিশগড়ীদের ঝুপড়ি।

হঠাৎ কতদিন সেখানে রাতদুপুরে হৈ চৈ হট্টগোলে ঘুম ভেঙে গিয়েছে। সে রাত্রে কিছু টের পায় নি। পরের দিন শুনেছি কার বৌটিকে কোথাকার কে এসে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল—ধরা পড়ে গেছে। এরকম ঘটনা হামেসা ঘটে ছত্রিশগড়ে। এ এমন কিছু নতুন নয়। তাই প্রথমটায় চুপ করে রইলাম।

মনে হলো কে যেন খিল খুললো সদর দরজার।

হয়ত কাল ভোরে উঠেই শুনবো সরস্বতীয়া পালিয়ে গেছে বুধন-পুরের শিবু কাহারের সঙ্গে। কিংবা মোহন বেয়ারার সঙ্গে। কিংবা আর কারো সঙ্গে। পালিয়ে যাবার লোকের অভাব নেই।

কিন্তু হঠাৎ মুরলীর গলা পেয়ে চমকে উঠলাম। মুরলী চিৎকার করে উঠেছে—মেরে ফেললে গো, সরস্বতীয়াকে মেরে ফেললে।

গলা-ফাটানো চিৎকার। মনে হলো যেন কদমকুঁয়ার আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেল সেই চিৎকারে। এক মুহূর্তে দরজার হুড়কো খুলে বাইরে টর্চের আলোটা ফেলেছি।

আর সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল।

দেখি ছেদি প্যাটেলের হার্তে একটা চ্যালাকাঠ, আর তার সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে সরস্বতীয়া। তার পাশেই মুরলী মুখে কাপড় দিয়ে হাঁফাচ্ছে।

আমার টর্চের আলো পড়তেই ছেদি প্যাটেল চ্যালাকাঠটা ফেলে দিয়ে পাঁচিলের ও-পাশে লাফিয়ে পড়লো।

বাইরে বেরোলাম আমি। ডাকলাম—ছেদি—

কিছুক্ষণ কারো সাড়া-শব্দ নেই। মুরলী আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে রয়েছে। আর কাঁদছে না তখন। সরস্বতীয়া মাটিতে তখনো লুটোচ্ছিল। কাপড়-চোপড় খোঁপা সামলে উঠে বসলো।

আমি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যেন এদের ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে ঢুকে পড়ে নিজেই লজ্জিত হলাম। হয়ত এদের অন্দর-মহলের একান্ত গোপনীয় ব্যাপারে আমার উপস্থিতি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। নিজের ব্যবহারে নিজেই কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে নিজের ঘরে এসে নিজের খাটিয়ায় আবার বসলাম।

আমার ডাকলাম—ছেদিলাল।

সমস্ত আবহাওয়াটা যেন এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেছে। যদি কিছুই না হয়ে থাকে তবে ছেদি প্যাটেলের হাতে চ্যালাকাঠ কেন! কেন সরস্বতীয়া অমন করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল? কেন তার কাপড়-ছোপড় ঠিক ছিল না? কেন তার খোঁপা খুলে গিয়েছিল? কেন মুরলী অমন করে আর্তনাদ করে উঠেছিল! এ সমস্তর মানে কি?

ছেদিলাল অনেক আস্তে আস্তে আমার ঘরে এল।

বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। বললাম—আলোটা নিয়ে এস।

ছেদিলাল আলোটা নিয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে।

বললাম—বসো।

ছেদিলাল বোসলো।

বললাম—সরস্বতীয়াকে মারছিলে তুমি ?

ছেদিলাল কোনও উত্তর করলে না। মুখ নিচু করে রইল। চোখ দিয়ে তার জল পড়ছে মনে হলো।

বললাম—কেন, মারছিলে কেন তুমি সরস্বতীয়াকে ?

ছেদিলাল হাউ-হাউ করে উঠলো হঠাৎ।

বললে—হুজুর, মালিক আমার মা-বাপ ! আমার কিছু কসুর নেই সাহেব। আমার কোনও দোষ নেই। আমাকে ক্ষমা করুন হুজুর, আমি পাগল হইনি, বেসামাল হইনি—যা করেছি জেনে ভেবেচিন্তেই করেছি হুজুর—আমার দোষ মাফি হয়।

বললাম—সরস্বতীয়া যে-দোষই করে থাকুক, তা'বলে তুমি মারবে ওকে ? মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলবে ? তোমার এত বড় সাহস ?

ছেদি প্যাটেল আমার বকুনি খেয়ে চুপ করে গেল।

আবার বললাম—জানো, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা অপরাধ ? তোমার ডৌকি বলে তুমি তাকে মারতে পার না ! আর তুমি কিনা তাকে চেলাকাঠ দিয়ে মারছিলে ? জানো, টিল্‌ডার পুলিশ-সুপারকে ডেকে তোমায় আমি গ্রেপ্তার করিয়ে দিতে পারি ?

ছেদিলাল আমার পা ধরতে এল !

বললে—হুজুর মা-বাপ, আমার কসুর নেবেন না সাহেব, আমি আর করবো না সাহেব, এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি।

বললাম—কিন্তু কেন মারছিলে, কেন মারছিলে এই রাত্তিরবেলা ?

ছেদি প্যাটেল বললে—আপনাকে কি বলবো সাহেব, বলবার আমার মুখ নেই ! আমার লজ্জা লাগছে।

—কেন ? লজ্জা কিসের তোমার, বলো না ? সরস্বতীয়া তোমার কথা শোনে না ?

ছেদি প্যাটেল বললে—ন্না হুজুর, তা নয় !

বললাম—তাহলে সরস্বতীয়া কী তোমার সংসারের কাজ করতে চায় না ?

ছেদি বলল—না সাহেব, তা-ও নয়। নতুন ডৌকি, সব কাজ তো মুরলীই করে, ওকে তো কোনও কাজ করতে বলি না আমি, আর ওর তো করবার দরকারই হয় না কোন সময়ে।

বললাম—তবে ? তবে কী করেছে ও ? কী জন্যে মারছিলে ?

ছেদি প্যাটেল একটু যেন ইতস্ততঃ করতে লাগলো। মাটিকে নখ দিয়ে কী খুঁটতে লাগল। তারপর মুখ উঁচু বললে—আপনি তো জানেন সাহেব, সরস্বতীয়া আমার ডৌকি কিনা বটে—

বললাম—হ্যাঁ তা তো জানি, সরস্বতীয়া তোমার চুড়ি পরানো ডৌকি। রামসহায় আমাকে সব কথা বলেছে।

ছেদি প্যাটেল বললে—আমি পাঁচ কুড়ি টাকা দিয়ে চুড়ি পরিয়েছি কিনা বলুন বটে ?

বললাম—তাও রামসহায় বলেছে আমাকে, রাজনন্দগাঁর জেটু রাউতের হাতে পাঁচ কুড়ি টাকা দিয়েছ তুমি বনোয়ারী শেঠের কাছে টাকা ধার করে।

ছেদি প্যাটেল বললে—আপনি তো সবই জানেন সাহেব—হুজুর মা-বাপ আমার, আমি আর কী বলবো, ছট্‌ পরবের মেলায় গিয়ে পাঁচ কুড়ি টাকা দিয়ে আমি সরস্বতীয়াকে চুড়ি পরিয়েছি—রামসহায় জানে, মুরলীয়া জানে, শেঠ বনোয়ারী জানে—আরো অনেকে জানে হুজুর, এতে লুকো-চাপা কিছু নেই, কিন্তু—

যেন বলতে গিয়ে দ্বিধা করতে লাগলো ছেদি প্যাটেল।

বললাম—কিন্তু কি—বলো ?

ছেদি প্যাটেল বললে—কিন্তু সরস্বতীয়া একদিনের তরে আমার ঘরে শোবে না হুজুর—

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ছেদি প্যাটেল বলতে লাগলো—

—এই আট মাহিনা সরস্বতীয়া আমার ঘরে এসেছে সাহেব, আট-মাহিনার একদিনও একমিনিটও আমার কাছে শোয় নি সাহেব আমার ভৌকি, আমার নিজের ডৌকি। চুড়ি পরানো ডৌকি মরদের কাছে শোবে না—এমন কথা কখনও শুনেছেন সাহেব ?

বললাম—কেন, শোয় না কেন ?

ছেদি যেন ভারি সহানুভূতি পেলে আমার কথায়। বললে—তাই বলুন তো হুজুর, ডৌকোর কাছে ডৌকি শোবে না, এ কেমন কথা ?

বললাম – কিন্তু কেন শোয় না, জিজ্ঞেস করেছিলে ওকে ?

ছেদি প্যাটেল বললে—আমাকে কি শয়তানী তা বলবে হুজুর ? আমার সঙ্গে কথাই বলে না, এই আট মাস চুড়ি পরিয়েছি, এই আট মাসের মধ্যে একদিনও কথাই বলে নি—আমাকে দেখতে পারে না ও হুজুর।

বললাম—কেন, শোয় না কেন ?

ছেদি বললে—তা কি করে জানবে হুজুর, কেন দেখতে পারে না—মুরলী ওকে কত বুঝিয়েছে, যেদিন প্রথম ঘরে নিয়ে এলুম হুজুর, মুরলী ওকে তালাও থেকে চান করিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে আমার ঘরে ঢুকিয়ে দেবার ইন্তেজার করলে, কিছুতেই এল না।

কেমন যেন অবাক লাগলো। প্রথম দিন থেকেই সরস্বতীয়া স্বামীর কাছে শোয় না, ও-কেমন কথা ?

ছেদি প্যাটেল বলতে লাগল—আমি প্রথম প্রথম ভাবতাম হুজুর ছোটডৌকি, বোধ হয় ভয় পায় কাছে শুতে, শেষে মুরলীয়াও আমার কাছে শুতে চাইল, আমি মধ্যখানে আর দু-পাশে ওরা, একপাশে মুরলীয়া আর একপাশে সরস্বতীয়া—কিন্তু কিছুতেই এল না হুজুর, মুরলীয়াকে আঁচড়ে কামড়ে একসা করে দিয়ে ছাড়লে।

বললাম—তারপর ?

ছেদি বললে—শেষে কি করব হুজুর, ভাবলাম পাঁচ কুড়ি টাকাই আমার লোকসান গেল—তবু হাল আমি ছাড়লুম না হুজুর।

ছেদি প্যাটেল সত্যিই দুঃখ পেয়েছিল মনে। দুঃখ পাবার কথাই বৈকি। দুঃখ পেয়েছিল চরম। নতুন ডৌকি ঘরে এনেছিল ছেদি প্যাটেল। খাসি কেটেছিল একটা। দু-এক ঘর লোক নেমন্তন্ন খেয়ে গিয়েছিল। কদমকুঁয়ার দু-পাঁচজন চেনা-জানা লোক। মুরলী তালাওতে নিয়ে গিয়ে চান করিয়ে তেল মাখিয়ে সাজিমাটি ঘষে সরস্বতীয়াকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছিল।

সরস্বতীয়া বলেছিল—আমায় ভয় করছে দিদি—

টিল্‌ডা মিশনের মেম-ডাক্তার এসেছিল সেদিন। মেম-ডাক্তার বলেছিল—এটা তোমার কে মুরলীয়া ?

মুরলীয়া বলেছিল—এটা আমার মরদের নতুন ডৌকি, আমার মরদ চুড়ি পরিয়েছে একে।

মুরলীয়া সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়েছে তখন সরস্বতীয়াকে! মেম-ডাক্তার ভালো করে দেখলে সরস্বতীয়ার দিকে। আপাদ-মস্তক দেখলে। ফরসা টক্‌টকে রঙ। বহুদিনের মেম-ডাক্তার। মেম-ডাক্তার ছত্রিশগড়ীদের মধ্যে অনেকদিন কাজ করেছে। এদের সভ্য হতে শেখাচ্ছে, মানুষ হতে শেখাচ্ছে, লেখাপড়া শেখাচ্ছে। ওষুধ দিচ্ছে, চিকিৎসা করছে। এমনি মেম-ডাক্তার ছিল রাজনন্দ্‌গাঁয়েও। পাদরি সাহেব জেঠু রাউতকে বলেছিল একদিন, দাও না সরস্বতীয়াকে। তোমার মেয়েকে লেখা-পড়া শেখাবো আমরা।

সেদিন জেঠু রাউত ছাড়েনি সরস্বতীয়াকে। ছাড়েনি টাকার লোভে। ইচ্ছে ছিল, সেই টাকা নিয়ে সে আবার কাউকে চুড়ি পরাবে।

সেসব কথা আর আজ মনে পড়ে না সরস্বতীয়ার। সেই বুড়ো পাদরি সাহেব, সেই রাজনন্দ্‌গাঁ, সেই আয়ি বুড়ি। ছোটবেলাটা যেন যেন ছিল ভালো।

মেম-ডাক্তার বললে—দেখি, এদিকে এসো তো দেখি, এদিকে একবার এসো তো—

সরস্বতীয়াকে ডেকে নিয়ে মেম-ডাক্তার আড়ালে কী যেন বললে।

মুরলীয়া বললে—কি বললে রে তোকে মেম-ডাক্তার ?

রাতের অন্ধকারে সরস্বতীয়ার মুখখানা ভালো করে দেখা গেল না। একে একে সবাই চলে গেছে। কেউ মাংস খেয়েছে। কেউ কেউ মহুয়া খেয়েছে। রামসহায়ও এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে, সে-ই আমাকে এ-সব কাহিনী বলেছে।

বললাম—তারপর তুমি চলে এলে ?

রামসহায় বলেছিল-ছেদি প্যাটেল সেদিন খুব মহুয়া খেয়েছিল হুজুর। নতুন ডৌকি এসেছে, রাতে একসঙ্গে এক বিছানায় শোবে, মদ খাবে না ?

বললাম—তারপর ?

তার পরের কথা রামসহায় জানে না। কিন্তু আমি কল্পনা করে নিতে পারি।

ছেদি প্যাটেল বিছানায় গিয়ে শুয়েছে।

মুরলী সরস্বতীয়াকে বললে-চল ঘরে চল।

সরস্বতীয়া বললে—আমি যাবো না।

—যাবি নে কেন ?

—না যাবো না, তোমার খুশী হয়, তুমি শোও গে যাও।

শেষকালে টানটানি। কিছুতেই শোবে না সরস্বতীয়া।

মুরলীও ছাড়বে না, সরস্বতীয়াও যাবে না।

মুরলী বললে—তোর এত বড় বাড় হয়েছে, তুই কথা শুনবি না।

সরস্বতীয়া বললে—না শুনবো না, তোমার কী ?

—তোর বাপ পাঁচ কুড়ি টাকা নেয় নি। ওম্‌নি শুতে বলছি ?

সরস্বতীয়া বললে—পাঁচ কুড়ি টাকা নিয়েছে আমার বাপ, তাতে আমার কী ?

—তোর বাপ আর তুই কি আলাদা ?

সরস্বতীয়া বললে—আমার বাপ টাকা নিয়েছে। তার জন্যে আমি ভুগতে যাব কেন শুনি ?

—তবে রে, শুনবিনে !

মুরলীর গায়েও জোর ছিল বেশ। এক টানে সরস্বতীয়াকে ভেতরে পুরতে যাচ্ছিল মুরলী। কিন্তু হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠেছে—ওঃ মাগো, আমায় কামড়ে দিলে ছুঁড়ি—খুন করে ফেললে গো।

শুধু সেই প্রথম দিনই নয়। এমনি করে এক সপ্তাহে বার বার দিন-ডিউটি আসে ছেদি প্যাটেলের আর সরস্বতীয়ার ধুকধুকুনি বাড়ে। ছেদি প্যাটেল রাতডিউটি থেকে ফিরে সমস্ত দিন ঘুমোয়। বিকেলবেলা উঠে জল খায়, চা খায়, বিড়ি খায়। তারপর ক্ষেতি-খামারে যায়। নিজের টাকায় ক্ষেতি করেছে। চানার ক্ষেতি, ভুট্টার ক্ষেতি, সরষে, তিসি, সব রকম ক্ষেতি আছে ছেদি প্যাটেলের। মহাজন আছে। শেঠ বনোয়ারী আছে। সুদ, লগ্নি, তমসুক, বন্ধকী কারবার আছে।

এত কাজ, এত কারবার সব দেখতে হবে নিজেকে। দেখবার আর লোক নেই ছেদি প্যাটেলের। তারপর ঘুরে ঘুরে এসে হাজির হয়।

বলে—রুটি দে মুরলীয়া।

রুটি দেয় মুরলী। রুটি খেয়ে আখের গুড় খায় ছেদি প্যাটেল। আর ভইসের দুধ খায় সে। সরকারী নোকরির সুখ আছে, ক্ষেতি-খামারের সুখ আছে, কেন খাবে না। কেন ভোগ করবে না !

রাত্রে শোবার ঘরে গিয়ে ডাকে—মুরলীয়া, সরস্বতীয়াকে ডাক্।

মুরলী বললে—চল, সরস্বতীয়া, শুবি চল ঘরে।

সরস্বতীয়া বলে—না আমি যাবো না।

সেই একঘটনার পুনরাবৃত্তি। সেই একই টানাটানি গালি-গালাজ, একই অভিনয়।

সব শুনে বললাম—কিন্তু ও যখন শুতে যেতে চায় না তোমার সঙ্গে, তখন তুমি নাই-ই আর চেষ্টা করলে ছেদিলাল।

ছেদি প্যাটেল বললে—ছেষ্টা করি কি সাধ করে হুজুর। চেষ্টা না করে কি করি বলুন ?

বললাম—না হয় আর একটা ডৌকি আনো ঘরে, আর একটা মেয়েকে চুড়ি পরাও।

ছেদিলাল বললে—কিন্তু ও শোবে না কেন, তাই আপনি বলুন হুজুর আগে।

বললাম—কিন্তু তোমারই বা অত জিদ কেন বলো তো? তুমি তো বুড়ো হতে চললে, আর হুদিন বাদে মারা যাবে।

ছেদি প্যাটেল বললে—আজ্ঞে সেই জন্যেই তো জিদ-জবরদস্ত করছি, আমি তো বুড়ো হতে চললুম, আর হু দিন বাদে মারা যাবো—তখন ? কে খাবে এ-সব ? কে রাখবে এ-সব ? আমার কি একটা ছেলে আছে।

কথাগুলো বলে ছেদি প্যাটেল কাতর ভাবে আমার দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

আমিও কিছুক্ষণ কথা বলতে বলতে পারলাম না।

খানিক পরে ছেদি প্যাটেল আবার বলতে লাগলো—বলুন হুজুর আপনিই বলুন, আমার কি ছেলে আছে ? এই যে চল্লিশ বিঘে জমি, চানা-ক্ষেতি, ভূট্টা-ক্ষেতি, এ-সব আমি চলে গেলে কে দেখবে, কে খাবে, কার জন্যে এ সব করা ?

বললাম—তুমি সরস্বতীয়াকে বলেছ এ-সব কথা ?

ছেদি প্যাটেল বললে—বলি নি হুজুর, বলেন কি আপনি ? আমি সব বলেছি। সরস্বতীয়াকে আমি কত বুঝিয়েছি, বলেছি একটা শুধু ছেলে দে তুই আমাকে, আর কিছু চাই না, আর কোনও দিন আমার কাছে শুতে বলবো না।

বললাম—তা শুনে কী বললে ?

ছেদি প্যাটেল বললে—শুনে বলবে কি, আর কথাই শোনে না মোটে। আমি যদি এদিক দিয়ে যায় তো ও যাবে ওদিক দিয়ে।

বললাম—মুরলীকে দিয়ে বলো না কেন ?

ছেদি প্যাটেল বললে—মুরলীয়াকে দিয়ে বলি নি ভাবছেন, মুরলীয়াও কি ওকে কম বুঝিয়েছে ভাবছেন। কত বুঝিয়েছে, কত করে বলেছে সরস্বতীয়াকে, মুরলীয়া আমার খুব ভালো ডৌকি আজ্ঞে, বলেছে হ্যাখ্ সরস্বতীয়া, আমরা দুজন মেয়েমানুষ, আমাদের মরদ বুড়ো মানুষ, একটা ছেলে যদি তোর হয় তখন আর তোর কষ্ট হবে না একটা ছেলে হলে তখন মরদ কিছু বলবে না আর, তখন তোর যা খুশি করিস—তা ও কি সেই শোনবার মেয়ে।

কিছু বলবার ছিল না আমার।

তবু বললাম—সরস্বতীয়াকে দেখে তো তা মনে হয় না—ও তো তোমার অবুঝ ডৌকি নয় ছেদিলাল।

ছেদি প্যাটেল বললে—অবুঝ কেন হবে সাহেব, বেশি বোঝন্‌দার সেই তো হয়েছে গোল, অত বেশি বোঝন্‌দার না হলেই ভালো হতো। অথচ দেখুন তো মুরলীয়াকে। সংসারের যত কাজ সবই তো একা করে মুরলীয়া, একটা কথা কোনদিন শুনেছেন মুরলীয়ার মুখে কখনও।

বললাম—তুমি এখন যাও ছেদিলাল, অনেক রাত্তির হলো—আমি সরস্বতীয়াকে ডেকে একবার কথা বলছি।

ছেদি প্যাটেলের মুখে যেন এতক্ষণে হাসি বেরোল।

বললে—একটু বুঝিয়ে বলবেন সাহেব, মুরলীয়া তো বুঝিয়ে হায়রান মেনে গেছে—আপনি একটু বুঝিয়ে বললে শুনবে—বলবেন একটা শুধু ছেলে হলেই আমি আর কিছুই চাই না—না ছেলে আমার এত সম্পত্তি সব বরবাদ হয়ে যাবে।

বললাম—তোমার কিছু ভাবতে হবে না, যা বলবার আমি বলবো তুমি যাও—তোমার আবার সকালবেলাই ডিউটি, যাও একটু শোও গে যাও।

ছেদি প্যাটেল গেল।

সত্যিই রাত অনেক হয়েছে। শিউ-তালাওের দিকে আকাশটা ফিকে-ফিকে ঠেকছে। বেল্লারির জঙ্গলের দিনটা তখন মিশকালো কুচকুচে আকাশ। আজকে আর ঘুম আসবে না।

সরস্বতীয়া ঘরে এল।

তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। এতক্ষণ যেন কাঁদছিল।

বললাম—বোসো।

ঠিক ছেদি প্যাটেল যেখানে বসে ছিল, সেইখানেই সেই চৌকাঠের ওপর তেমনি করে বসল সরস্বতীয়া।

বললে—আমাকে ডেকেছিলে সাহেব ?

বললাম—হ্যাঁ।

কিন্তু বলতে গিয়েও যেন কিছু কথা মুখ দিয়ে বেরোল না। কেমন করে কথাটা বলবো ! কী করে বলবো ! স্ত্রী স্বামীর ঘরে শুতে চায় না, তার জন্যে আমিই বা কী করতে পারি। আর আমার কথা শুনবেই বা কেন ? আমি এদের কে ?

কিছু কথা বলছি না দেখে সরস্বতীয়া নিজেই বললে—আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি হুজুর।

বললাম—তাহলে তো ভালই হয়েছে—তুমি শোও না কেন তোমার মরদের সঙ্গে। কেন ? শুতে তোমার আপত্তি কী ?

সত্যিই রাগ হয়েছিল আমার।

বললাম—ছেদিলালের অত সম্পত্তি কে খাবে বলো দিকিনি ? তোমরা তো দু-জন রয়েছ, দু'জনেই মেয়েমানুষ, ওই ছেদিলাল একলা রেলের চাকরি করবে না ক্ষেতি-খামার দেখবে—একটা ছেলে থাকলে তো আর এ-সব ভাবতে হতো না ! হয় মুরলীর নয়, তোমার একটা তো ছেলে থাকা উচিত।

আমার কথা শেষ হবার আগেই সরস্বতীয়া বললে—ওর ছেলে হবে না সাহেব !

—হবে না ?

সরস্বতীয়া বললে—না, ছেলে মুরলীর হবে না, আমি ওর পাশে শুলেও আমার ছেলে হবে না, এই আপনাকে বলে রাখলুম।

বললাম—কেন? কী জন্যে ছেলে হবে না?

সরস্বতীয়া বললে—আমাকে মেম ডাক্তার বলেছে!

—কোথাকায় মেম-ডাক্তার?

সরস্বতীয়া বললে—টিল্‌ডা মিশনের মেম ডাক্তার, যেদিন আমি চুড়ি পরে এ-বাড়ীতে এলুম, সেই ছট্‌-পরবের দিনই মেম-ডাক্তার এসেছিল। আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেছিল—মুরলীয়ার মত তোরও ছেলে হবে না।

অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—কেন, মুরলীর যদি ছেলে না হয়, তোমার হবে না কেন?

সরস্বতীয়া বললে—আজ্ঞে মুরলীর যে-জন্যে হয় না, আমারও সে জন্যে হবে না।

বললাম—কী জন্যে হবে না?

সরস্বতীয়া বললে—ছেদিলালেয় পারা-রোগ আছে সাহেব!

পারা রোগ।

বললাম—কী করে জানলে তুমি?

সরস্বতীয়া বললে—মেম-ডাক্তার যে আমাকে বলেছে সাহেব। মেম-ডাক্তার আমাকে কেন মিছে কথা বলতে যাবে। আর তাছাড়া—

বলে থেমে গেল সরস্বতীয়া।

বললাম—আর তা ছাড়া—?

সরস্বতীয়া বলতে লাগলো—আর তা ছাড়া নিজের চোখে যে দেখেছি সাহেব মুরলীর সে-কি কষ্ট, কী কষ্ট যে পায় মুরলী কী বলবো। এক-একদিন যেদিন পেটে ব্যথা ওঠে, বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে মুরলী, তুমি তার কী জানবে সাহেব, তুমি তো আর থাকো না।

বললাম—ব্যথা তো অন্য কারণেও হতে পারে। হয়ত অন্য কোনও রোগ আছে।

সরস্বতীয়া বললে—তা হলে মুরলীর কেন ছেলে হয় আর মরে যায়। কেন মেম-ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে তবে ব্যথা সারায়? আমি কিছু বুঝি নে?

আমার যেন বলবার কথা ফুরিয়ে গিয়েছে।

তবু বললাম—কিন্তু এ-সবে অশান্তি বাড়ার, ছেলেপুলে না হলে কি সংসার মানায়, তোমারও তো মন চায়ও-সব।

সরস্বতীয়া বললে—না সাহেব, আমার মন ও-সব চায় না। আমি আর এখানে থাকবো না—

সরস্বতীয়ার কথা শেষ হলো না। তার আগেই ছেদি প্যাটেল ঘরে এসে ঢুকলো এবং চীৎকার করে উঠলো—তুই থাকবি না তো কোথায় যাবি শুনি?

সরস্বতীয়া বসে ছিল। এবার ছেদি প্যাটেলের কথায় দাঁড়িয়ে উঠে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল।

ছেদি প্যাটেল সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ধরে ফেলেছে। বললে—বল, হুজুরের সামনে বল তুই কোথায় যাবি, সাহেব সাক্ষী থাক আজ।

সরস্বতীয়া কোন কথা বললে না। প্রাণেপণে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো।

বললাম, ওর হাত ছেড়ে দাও ছেদিলাল।

ছেদি প্যাটেল আমার কথায় সরস্বতীয়ার হাতটা ছেড়ে দিলে।

বললাম, শোন সরস্বতীয়া, তুমি কোথাও যেওনা, আমি ছেদিলালকে বুঝিয়ে তোমাকে যা বলবার বলে যাবো।

সরস্বতীয়া চলে গেল। ছেদি প্যাটেলকে বললাম, তোমার পারা রোগ আছে, আমাকে বলো নি তো তুমি?

ছেদি প্যাটেল আবার বসলো সেই পুরোন জায়গাটায়।

বললে, রোগ আছে আমার আছে, তাতে ওর কী?

বললাম, সেই জন্যেই তোমার ছেলে হয় না।

ছেদি প্যাটেল হেসে উঠলো।

বললে, কী যে বলেন সাহেব, আপনি হাসালেন! এ রোগ কার না আছে। এই কদমকুঁয়ার ঘরে ঘরে তো এই রোগ। শিবু কাহারের আছে, বিশু রাউতের আছে, ওই রাজনন্দ্‌গাঁর জেঠু রাউতেরও আছে, তাদের ছেলে-মেয়ে হচ্ছে না হুজুর? তাহলে সরস্বতীয়া নিজেই বা হলো কী করে?

ছেদি প্যাটেলকে আর এ নিয়ে বেশী কথা বলা বাহুল্য মনে হলো। মানুষের শত্রু কোথায় কোন্‌ স্তরে কী ভাবে কাজ করছে, এ দেখে তাই আমার মনে পড়তেলাগলো। এমন তো হবে ভাবি নি। ছেদি প্যাটেল, কদমকুঁয়া গ্রামের বর্ধিষ্ণু লোক, তারই এই কথা!

ছেদি প্যাটেল বলতেলাগলো—আমার বাবারও তো এ রোগ ছিল হুজুর, আমার আগে অনেক ভাই হয়ে মারা গেছে, আমি হলুম কী করে? আমি তো বেঁচেছি, এখনও বেঁচে আছি।

বলে আমার দিকে চাইলে ছেদি প্যাটেল একবার।

বললে—আর যদি আমার কথায় বিশ্বাস না-হয় তো চলুন আমার সঙ্গে কদমকুঁয়ায়, চলুন শিউ-তালাওতে, চলুন রাজনন্দ্‌গাঁতে, চলুন হাত্‌বান্ধে—সকলের এ রোগ আছে—তাতে কী হয়েছে? তাবলে একটা ছেলে বাঁচবে না? একটা ছেলে তো বাঁচবে। মুরলীয়ার যদি ছেলে হয়ে না বাঁচে তো সরস্বতীয়ার বাঁচবে, সরস্বতীয়ার ছেলে বাঁচবে না কেন বলুন?

মনে আছে সে-রাত্রে আমার সারা মন যেন কেমন বিষিয়ে উঠেছিল সমস্ত পরিস্থিতিতে। এ আমি কোথায় এলাম। এখানে আমি কেন এলাম! এখানে কেন আমি আসতে গেলাম!

বিরক্ত হয়ে বললাম. তুমি এখন যাও ছেদিলাল, সকালে উঠে তোমার ডিউটি আছে, আমিও চলে যাবো, এখন একটু ঘুমোব, তুমি যাও।

ছেদিলালের বোধ হয় যাবার ইচ্ছে ছিল না। বললে, আপনি

এই মামলার একটা ফয়সালা করে দিয়ে যান সাহেব। আপনি যা বলবেন তাই শুনবো—এই বলে সে চলে গেল।

কিন্তু ঘুম কি আসে? ভাবলাম ছেদিলাল চলে যেতেই একটু ঘুমোবার চেষ্টা করবো শেষ বারের মত।

রাত অনেক হয়েছে। কদমকুঁয়ার মাটিতে তখন আবার নতুন করে বুঝি ঘাসের চারা গজাচ্ছে, কুঁড়ি ফুটছে।

দরজার হুড়কোটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

হঠাৎ সেখানে খুট খুট করে আওয়াজ হলো।

উঠে খুলে দিতে গিয়েই দেখি—সরস্বতীয়া!

বললাম—আবার কী চাও!

সরস্বতীয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ! যেন কিছু বলবে ও আমাকে! বললাম—কিছু বলবে?

সরস্বতীয়া বললে—আমি আমার মরদের সঙ্গে কোনও দিন শোব না সাহেব, তুমি যেন শুতে বোল না।

বললাম—আমি শুতে বলবো, কে বলেছে তোমাকে?

সরস্বতীয়া বললে. না আমি বলে রাখছি তোমাকে, তোমার কথা এড়াতে পারবো না! তুমি যেন শুতে বোল না আমাকে।

বললাম—ও-ও তো একটা রোগ, রোগ সেরে গেলে শুতে তোমার আপত্তি কি?

সরস্বতীয়া বললে, ওর ও-রোগ আর সারবে না সাহেব।

অভয় দিয়ে বললাম—কেন সারবে না? আজকাল অনেক ভালো ভালো ওষুধ বেরিয়েছে, ডাক্তার ডাকলেই সারবে।

সরস্বতীয়া বললে—তাহলে সাহেব, একটা কথা—

বললাম, বলো তোমার কী কথা।

সরস্বতীয়া বললে, তুমি যেদিন এসে বলে যাবে ওর রোগ সেরে গেছে, সেদিন ওর সঙ্গে শোব, তার আগে নয়।

বললাম—ঠিক আছে, এবার তুমি যাও, আমি ঘুমোব।

বিধাতার দরবারে অনেক মানুষ আরজি জানায়, বিধাতাপুরুষ সকলের আরজি শোনেন কিনা, তার খবর কেউ জানে না। কিন্তু যদি শুনতেন তো একটা আর্জি তাকে জানাতাম। মাত্র একটা আরজি। শুধু বলতাম, ছেদি প্যাটেলকে তুমি' ছেলে দাও আমার কোনও আপত্তি নেই—কিন্তু সরস্বতীয়াকে তুমি এমন করে কষ্ট দিও না।

কষ্ট? কষ্টের কথা কদমকুঁয়ার কেউ জানে না! কিন্তু জানে শুধু একজন। সে হলো দেওকীনন্দন। দেওকীনন্দন ঝা! শিউকিষণের রামলীলা দলের যে লছমন সাজতো!

সত্যিই দেওকীনন্দনকে আমি দেখিনি। শুধু সরস্বতীয়ার মুখে তার নাম শুনেছি। সেই সরস্বতীয়ারই রূপ দেখেছিলাম পরে।

সে যেন বর্ষার ঢল্! একেবারে উপছে পড়ছে। ছল্-ছল্-ছলাৎ শব্দ করে গ্রাম জনপদ সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, এমন ঢল্। হলুদ-ছোপানো শাড়ি, কানে বেলকুঁড়ির গয়না। চোখে আবার সানগ্লাস।

যেন অন্য চেহারা। চেনাই যায় না সরস্বতীয়াকে।

বললাম, সানগ্লাস কার? কে কিনে দিয়েছে তোমাকে।

সরস্বতীয়া সারা ঘরময় ছটফট করে বেড়াচ্ছে। আমার কথা শুনতে পায়নি যেন। নিজের কোন্ আনন্দে নিজেই উচ্ছল! গুন্‌গুন করে বোম্বাই সিনেমার গান গাইছে।

আবার বললাম—কে দিয়েছে তোমায় সানগ্লাস?

সরস্বতীয়া বললে—দেওকীনন্দন।

দেওকীনন্দন। নাম শুনেই চিনতে পারার মত বিখ্যাত নয় নামটা।

বললাম—দেওকীনন্দন কে?

সরস্বতীয়া সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—দেওকীনন্দন আমাদের বাড়ি 'এসেছিল সাহেব, আমি তাকে খাইয়েছি, নিজের হাতে তাকে রান্না করে খাইয়েছি সাহেব। তোমার এই ঘরে বসে খেয়ে গেছে, এই খাটিয়ায় শুয়েছে।

বললাম—কে সে ? তোমার কে হয় ?

সরস্বতীয়া বললে—হুজুর, দেওকীনন্দনকে তুমি চিনতে পারবে না, সে যে লছমন।

সরস্বতীয়া বললে—হ্যাঁ, কদমকুঁয়ায় তিন রাত রামলীলা গাইতে এসেছিল শিউকিষণের দল, দেওকীনন্দন যে রামলীলা দলের লছমন সাজে।

আমি অবাক হয়ে চেয়েছিলাম।

সরস্বতীয়া বললে—আমায় এই চশমাটা দিয়ে গেছে দেওকীনন্দন।

সরস্বতীয়া চশমাটা চোখে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কালো কাঁচ, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ভেতরে। হয়ত আমার কাছে কিছু তারিফ শুনতে চেয়েছিল সরস্বতীয়া।

সরস্বতীয়া আমাকে দেখে চমকে দেবার জন্য বললে—জানো সাহেব, দেওকীনন্দন বোম্বাই যাবে।

—বোম্বাই ? বললাম, বোম্বাই যাবে দেওকীনন্দন ?

সরস্বতীয়া বললে—হ্যাঁ সাহেব, সত্যি যাবে।

বললাম, কেন ? রামলীলা করতে ?

সরস্বতীয়া বললে—দূর, ফিলিম্ করবে দেওকীনন্দন—দেওকীনন্দন বলেছে রামলীলা আর করবে না—ফিলিম্ করবে, ফিলিম্ করলে নাম হয়, অনেক টাকা হয়।

তারপর একটু থেমে বললে—আচ্ছা হুজুর, বোম্বাই কত দূর ?

থাক্ গে, এ-সব অনেক পরের কথা পরেই বলা ভালো।

সেদিন ভোরবেলাই উঠে পড়েছি ! রামসহায় ভোরেই এসে উঠিয়ে দিয়েছে। উঠে দেখি মুরলীয়া সরস্বতীয়া দুজনেই কখন উঠে সংসারের কাজে লেগে গেছে। ছেদি প্যাটেলও তৈরী হচ্ছে ডিউটিতে যাবার জন্যে।

আমারও যাবার সময় হয়েছিল।

ছেদি প্যাটেল এল।

বললে—সাহেব, আমি আপনার মালগুলো নিয়ে যাচ্ছি, চলুন—

বললাম—রামসহায়আসবে,সেই-ই নিয়ে যাবেখন,তোমার দরকার হবে না।

রামসহায় সত্যিই তখনও আসে নি। সারা রাতই প্রায় ঘুম হয়নি বলতে গেলে। কেমন যেন ক্লান্তি লাগছিল। কোথায় যেন কোন্ অলক্ষ্যে একটা ব্যথা জমে উঠেছিল মনের মধ্যে, তার ক্লান্তিতেও বেশ ভারি লাগছিল নিজেকে। মনে হচ্ছিল ছেদি প্যাটেলের সঙ্গও যেন আর ভাল লাগবে না। ছেদি প্যাটেলকে আগেও দেখছি, অনেক বারই দেখছি, কিন্তু তাকে এমন কুৎসিত কখনও মনে হয়নি। হয়ত এমনই হয়। এমনি হওয়াটা স্বাভাবিক।

কিন্তু মনে হলো ছেদি প্যাটেলের অন্দরমহলের খবর যেন না-জানলেই আমার ভালো হতো!

বাড়ির ভেতরে মুরলীকে দেখতে পাচ্ছি। কাজ-কর্ম করছে।

সরস্বতীয়া যে কোথায় তা টের পাচ্ছি না। হয়ত কোথাও আড়ালে রয়েছে, সামনে আসতে চাইছে না। বিশেষ করে দিনের আলোয়। মুরলীয়াই-চা দিয়ে গেল! মুরলীয়াই চালের পিঠে দিয়ে গেল একটা রেকাবী করে। কিন্তু খেতে মন যেন মন উঠছিল না আর।

ছেদি প্যাটেল সবুজ কুর্তাটা পরে পরে নিলে। বললে,চলুন হুজুর—

বললাম—কেন তুমি তোমার এখানে আসতে বলেছিলে ছেদি, আমি তো নিজে আসতে চাইনি—

ছেদি প্যাটেল বললে, সাহেব আমার মা-বাপ, সাহেব আমার সব গোস্তাকি মাপ করতে হবে হুজুর, আমি আপনার পায়ে পড়ছি হুজুর।

কথা বলতে বলতে ছেদি প্যাটেল সত্যিই আমার পায়ে পড়তে গেল। বাধা দিলাম। পা টেনে নিয়ে বললাম—থাক, তুমি তোমার ডিউটিতে যাও।

ছেদি বললে, বলুন হুজুর আপনি আমাকে মাপ করেছেন।

বললাম—ছেদি, তোমার রোগ আছে তা আগে বলো নি কেন আমাকে?

ছেদি আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

বললাম, বিয়ে করে একটা কচি মেয়ের জীবন তুমি বরবাদ করে দিতে চাও নাকি? বিয়ে করেছ বলে ভেবেছ সে তোমার কেনা বাঁদি হয়ে থাকবে, তুমি ভেবেছ কী?

ছেদি প্যাটেলের মুখ দিয়ে এতক্ষণে কথা বেরুল। বললে, হুজুর আপনি বলছেন কী! আমি বউ-এর ওপর জুলুম করবো না তো কার ওপর করবো, সরস্বতীয়া তো আমার চুড়ি-পরানো বউ হুজুর, আমি তো পরের বউ-এর গায়ে হাত দিইনি।

বললাম, কিন্তু তোমার রোগ আছে তা তুমি জানো না? রোগটা সারাও না কেন?

ছেদি প্যাটেল বললে, রোগ কিসের হুজুর, সরস্বতীয়া আপনাকে বলেছে বুঝি? এ-রোগ কার নেই ছত্রিশগড়ে? আমার কি একলার রোগ আছে? বলুক তো সরস্বতীয়া আমার সামনে, বলুক ও।

ছেদি প্যাটেল বেশ রেগে গেছে মনে হলো।

বললাম, রোগটা তো ভালো নয়, সারিয়ে নাও না কেন?

ছেদি প্যাটেল বললে, কে সারাবে হুজুর? মুরলীর ছেলেটা যখন মরলো তার আগে টিল্‌ডা-মিশনের মেম-ডাক্তারের কাছে গিয়ে কত কান্নাকাটি করলুম, কত হাতে পায়ে ধরলুম, কিছুই হলো না সাহেব, মাঝখান থেকে খালি আমার তিন কুড়ি টাকাই নষ্ট হয়ে গেল।

বললাম, তুমি তোমার নিজের চিকিৎসা করাও আগে।

ছেদি প্যাটেল বললে, ডাক্তাররা যে টাকা নেয়কেবল, রোগ সারায় না হুজুর।

বললাম, সে কি? মিশন তো টাকা নেয় না, তারা তো রোগ সারাবার জন্যেই ডাক্তারখানা খুলেছে এখানে?

মনে আছে সেদিন কদমকুঁয়া থেকে ফেরবার আগে অনেক করে বুঝিয়েছিলাম ছেদি প্যাটেলকে যে সে যদি রোগটা সারিয়ে ফেলে তো তার নিজেরও শান্তি, তার বউদেরও শান্তি! তাদেরও ছেলে-পুলে হবে আর তার অবর্তমান তার জমি-জমা সম্পত্তি দেখবারও একটা লোক হবে।

ছেদি প্যাটেল কিছুতেই শোনেনি শেষ পর্যন্ত।

বলেছিল, টিল্‌ডা মিশনের ডাক্তারখানায় আমাকে যেতে বলবেন না হুজুর, অনেক টাকা দিয়েছি, কিছুই কাজ হয়নি।

বলেছিলাম, কাকে টাকা দিয়েছ, ডাক্তারকে?

ছেদি প্যাটেল বলেছিল, ডাক্তারখানার খানসামাকে দিয়েছিলাম হুজুর ডাক্তার চেয়েছিল।

বলেছিলাম, তুমি এবার বিলাসপুরের ডাক্তারখানায় এসো, ডাক্তারকে আমি বলে রাখবো, দেখো একটা পয়সাও লাগবে না।

রামসহায় শেষ-পর্যন্ত যখন আমাকে থার্টিন ডাউনে তুলে দিয়েছিল, তখন আমি মনে করে দিয়েছিলাম ছেদি প্যাটেলকে—ঠিক যেও কিন্তু বিলাসপুরে, ডাক্তার সেনকে আমি বলে রাখবো, একটা পয়সাও—

তারপরেই আমার ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল।

কদমকুঁয়ার কথা হয়ত ভুলেই যেতাম। কিন্তু ভোলা হলো না। কেন ভোলা হলো না তাই বলি।

কদমকুঁয়া থেকে ফিরে এসে এবার নিজের কাজেই ডুবে গিয়েছিলাম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আবার যে শিকারে যাইনি তা নয়। ডি-কস্টা সাহেবের কথামত গিয়েছিলাম খোদ্‌রিতে, খোংশাড়াতে। সে এখানে অবান্তর।

হঠাৎ রামসহায় একদিন বিলাসপুরে এল। প্রায় মাস পাঁচ-ছয় পরে। বললাম, কী খবর রামসহায়?

রামসহায় বললে—হুজুর, সরস্বতীয়া আপনাকে ডেকেছে।

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, আমাকে ? কেন ?

রামসহায় বললে, তাদের চানা-ক্ষেতে আবার হরিণ নেমে হুজুর, বড় উৎপাত করছে, তাই আপনাকে যেতে বলেছে !

বললাম, আর ছেদি প্যাটেল ? সে কেমন আছে ?

ছেদি প্যাটেলের কথা কিছু বলতে পারলে না রামসহায়। শুধু বললে সেই রকমই চাকরী করে টিল্‌ডার গেট-এ।

· শেষ পর্যন্ত একদিন আবার ঝোলা নিয়ে, বিছানাপত্র নিয়ে, বন্দুক নিয়ে রওনা হলুম। ছেদি প্যাটেলের তখন ডিউটি ছিল না। বাড়িতে গিয়ে উঠতেই দেখি মুরলীয়া।

মুরলীয়া লললে—সাহেব, তুমি এসেছ, আমরা খবর দিয়েছিলাম শিউতালাও-এর রামসহায়কে দিয়ে।

বললাম—ছেদি প্যাটেল কোথায় ?

মুরলী বললে—ক্ষেতি দেখতে গেছে।

বললাম—আর সরস্বতীয়া ?

মুরলী বললে—ওই তো ঘরে রয়েছে।

উঠনে ঢুকতেই আমার গলার আওয়াজ পেয়েছে সরস্বতীযা। ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেই হেসে আমায় অভ্যর্থনা করলে।

বললে—জানো সাহেব, দেওকীনন্দন এসেছে।

দেওকীনন্দন ? বললাম—কে দেওকীনন্দন ?

দেখি ঘরের ভেতর একটা ছোকরা বসেছিল ! কালো লম্বা প্যান্ট্-ওয়া। চোখে সানগ্লাস। আমাকে দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর আস্তে আস্তে সদর দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সরস্বতীয়া আমাকে সেই ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালো। দেখি অনেকগুলো সিনেমার চটি বই খাটিয়ার উপব ছড়ানো। মনে হলো যেন এতক্ষণ এই সব ছবির বই দেখছিল দুজনে।

সরস্বতীয়া বললে—এই দেওকীনন্দনকে তুমি চেন সাহেব ?

বললাম—না, কে ও ?

সরস্বতীয়া বললে—এখানে রামলীলা করতে এসেছে,লছমন সাজে সাহেব, এত ভাল গান গায় : কি বলবো,—ওকে আজকে নেমতন্ন করেছিলাম হুজুর, আমাদের এখানে খেল।

তারপর হঠাৎ বোধ হয় খেয়াল হয়েছে যে দেওকীনন্দন চলে গেছে, বললে—দাঁড়াও সাহেব, একবার আমি দেওকীনন্দনকে বলে আসি—বলে সরস্বতীয়া এক ছুটে ঘরের বাইরে চলে গেল।

ঘরের ভেতর ভালো করে আবার চেয়ে দেখলাম। ঘরটার শ্রী যেন এবার ফিরে গেছে। একটা টিনের আয়না ঝুলছে দেয়ালে। ঘরের ভেতর সিগারেটের গন্ধ পেলাম। আগেও এ-ঘরে এসেছি, কিন্তু তখন এ-রকম চেহারা ছিল না এ-ঘরের! সারা ঘরটা গোবর দিয়ে নিকোন হয়েছে। একটা কেমন-গোছানো গোছানো ভাব।

খাটের ওপর বসেছিলাম। রামসহায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। রামসহায় এলে তবে বেরোব। সে তার বাড়ি থেকে খেয়ে-দেয়ে আসবে। চারিদিকে ধূসর দুপুর।

হঠাৎ টিপিটিপি পায় ঘরে এল মুরলীয়া।

বললাম—কোথায় গেল সরস্বতীয়া?

মুরলীয়া বললে—সাহেব, সরস্বতীয়া আজকাল বড় বদ্‌লে গেছে, কারো কথা আর শোনে না—দেখো না ওই দেওকীনন্দনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

বললাম—কোথায় গেল?

মুরলীয়া বললে—কী জানি কোন্ চুলোয়, আগে তবু আমার কথা-একটু-আধটু শুনতো, এখন মোটে শোনে না।

বললাম—ওই দেওকীনন্দনটা কে?

মুরলীয়া বললে—ওই তো জুটেছে একটা, এখানে কদমকুঁয়ার রামলীলা করতে এসেছিল, আমার মরদ ওর গান শুনে বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছিল, ভগবানের নাম-টাম করে কিনা—তাই ওকে নিয়েই পড়েছে সরস্বতীয়া।

জিজ্ঞেস করলাম—ছেদি প্যাটেল কিছু বলে না ?

মুরলীয়া বললে—প্রথম প্রথম কিছু বলতোনা, ভাবতো ভগবানের নাম করে, ভারি ভালো ছেলেটা, নিজে এনে বাড়িতে একদিন খাইয়েছিল আর গান শুনেছিল, এই উঠোনে বসে অনেক গান গাইলে হুজুর, কিন্তু সরস্বতীয়া ছাড়লে না, বললে—আর একদিন গান গাইতে হবে।

বললাম—তারপর ?

মুরলীয়া বললে—তারপর থেকে রোজ দুপুরবেলা ঘরে আসে, সরস্বতীয়ার সঙ্গে ফুস্থুর ফুস্থুর করে—মরদের ডিউটি থাকলে ওর সুবিধে হয় ভারি, এই দেখো না সাহেব, আজ ঠিক খবর পেয়েছে যে মরদ ক্ষেতি দেখতে গেছে আর এসেছে, তুমি না এলে আরো কিছুক্ষণ থাকতো।

মুরলীয়া আরো অনেক কথা বলতে লাগলো।

বললে—সবই নসিব হুজুর, আমি জোর করে ওকে ঘরে আনলুম, ভাবলুম আমার ছেলে হয় না, সরস্বতীয়ার যদি ছেলে হয় তবু মরদটা মনে একটু শান্তি পাবে, আদমিটা মনে একটু সুখ পাবে! তার মনে মোটে সুখ নেই সাহেব, এতযে খাটে,রাত জেগে ডিউটি করে, ক্ষেতি-খামার করে—বলতে পারেন কার জন্যে করে ?

সত্যিই তো কার জন্য এ-সব! কার জন্যে এই টাকা-কড়ি, ক্ষেত-খামার!

মুরলী বলতো—দেওকীনন্দন তোর ঘরে কেন আসে রে সরস্বতীয়া ?

সরস্বতীয়া বলতো—বেশ করবে আসবে, তার খুশি সে আসবে।

—এবার তাহলে মরদকে বলে দেব।

সরস্বতীয়া বলতো—দে না বলে, আমি কি ভয় করি! আমি কি তোর মত বিয়ে-করা বউ, আমি তো চুড়ি-পরানো বউ! আমার যার সঙ্গে খুশি মিশবো—আমার যা-খুশি তাই করবো, তোর কী ?

মুরলী বললে—কাল থেকে এখানে আসতে বারণ করে দিবি ওকে।

সরস্বতীয়া বললে—কেন বারণ করবো শুনি ! ও তো চলেই যাবে।

—কোথায় চলে যাবে ?

সরস্বতীয়া বললে—বোম্বাই, ফিলিম্ করবে ! নাগিন ছবি দেখেছিস, সেই রকম ছবি করবে দেওকীনন্দন, রামলীলা আর করবে না ও আমাকে বলেছে।

মুরলী বললে—কবে যাবে ও ?

সরস্বতীয়া বললে বোম্বাইতে চিঠি লিখে, ফিলিমের চাকরি করবে দেওকীনন্দন, জানিস্ ?

আমাকে মুরলী বললে, তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বলো সাহেব, মরদের সংসার ভেঙে যাবে একেবারে, সব ভেসে যাবে হুজুর, সরস্বতীয়াই কি সুখ পাবে ভেবেছ।

মনে আছে সেদিন ছেদি প্যাটেলের সংসারের ভাঙনের ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছিলাম আমি। ছেদি প্যাটেল তো আর পাঁচজন মানুষের মতই ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। তার বেশি কিছু চায়নি তারা। একটা বাঁধা-চাকরি, কিছু জমিজমা আর একটা নিশ্চিন্ত-ভবিষ্যৎ যেমন সবাই চায়। সারা পৃথিবীর লোক তাই চায়। আর কিছু নয়। কতদিন দেখেছি ছেদি প্যাটেল ঘামতে-ঘামতে এসেছে ডিউটি করে, এসে একটা টুলের ওপর বসেছে। মুরলী জল দিয়েছে, গামছা দিয়েছে এগিয়ে। আর সরস্বতীয়া ?

সরস্বতীয়া যেন ভিন দেশের লোক। এ বাড়িতে এসে যেন বন্দী হয়ে আছে। তারই বা কি দোষ ! সমস্ত সংসারটা যেন অনেকখানি আশা নিয়ে তারই মুখের দিকে চেয়ে থাকতো কেবল। যেন সে-ই একমাত্র এ-সংসারকে বাঁচাতে পারে ! দিনের পর দিন মাসের পর মাস ছেদি প্যাটেল ডিউটি করেছে আর আশা করেছে একদিন হয়ত সরস্বতীয়া বুঝবে, একদিন সরস্বতীয়ার সুমতি হবে, তার ঘরে আসবে রাত্রে তার বিছানায় এসে শোবে। তারপর এ-সংসারের সমস্ত নিরানন্দ

একদিন একজনের আবির্ভাবে দূর হয়ে যাবে। এই জমি জমা এই বাড়ি-ঘর-দোর আবার এক নতুন মানে খুঁজে পাবে। ভগবানের আশীর্বাদ তো সেই জন্যেই চেয়েছিল ছেদি প্যাটেল। ঈশ্বরের নাম-গানের অনুষ্ঠান সেই জন্যেই বসিয়েছিল বাড়িতে। রামজীর কৃপায় সব দুঃখ সব নিরানন্দ ধুয়ে মুখে যাবে এ-সংসার থেকে।

মেম-ডাক্তার আসে দেখতে মুরলীয়াকে। ছেদি প্যাটেল মেম-ডাক্তারকে দূর থেকে দেখেই বাড়ির বাইরে পালিয়ে যেত।

মুরলীয়া খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে কাতরাতো এক-একদিন।

—ও মাইয়া গো, ও মাইয়া গো—

কোথায় কোন্ দূরে কাদের বাড়িতে তার জন্ম হয়েছিল, আজ আর তা মনে নেই তার। ছোটবেলায় বিয়ে হয়ে গেল একদিন ছেদি প্যাটেলের সঙ্গে। এক কাঁদি কলা, একটি টিনের তোরঙ্গ আর রুপোর হাঁসুলী পরে বউ হয়ে এসেছিল মুরলীয়া এই প্যাটেলের পরিবারে। তারপর কত জায়গায় বদলি হলো ছেদি প্যাটেল। চাকরি পেয়ে চলে গেল রামগড়ের গেটম্যান হয়ে। মুরলীয়াও গিয়েছিল সঙ্গে। ধুলোর ঝড় আর লু চলতো বাইরে। আর একলা ঝুপড়ির ভেতর বসে বসে মুরলীয়া প্রহর গুনতো। ছেদি প্যাটেল তখন মদ খেত। কিন্তু মদ খেলেও ডিউটির কখনও খেলাপ করতো না। ডিউটির কামাই করতো না। ঝাণ্ডি নিয়ে গেট সামলাতেই ব্যস্ত। ঘরের বউয়ের দিকে দেখবার তার সময় ছিল না।

মুরলীয়ার সে সব দিনগুলোর কথা মনে আছে বৈকি।।

সব সহ্য করেছে মুরলীয়া। শুধু একটা আশা বুকে নিয়ে একটি ছেলে হবে তার। বিটা ছেলে।

মেম-ডাক্তারকে কতদিন কেঁদে পায়ে ধরতে গেছে মুরলীয়া।

বলেছে—আমাকে একটি ছেলিয়া দাও মেম-ডাক্তার।

মেম-ডাক্তার বলেছে—আগে তোর মরদের রোগ সারা, তবে তো ছেলে হবে তোর।

ছেদি প্যাটেলকে সে-কথা বলতেই সে হুমকী দিয়েছে।

বলেছে—রাখ তোর মেম-ডাক্তারের কথা; আমি মরদ আছি, আমি কিছু বুঝি না! ওষুধে যদি রোগটা সারাতে পারবে তবে তোর হওয়া ছেলেকে বাঁচাতে পারল না কেন মেম-ডাক্তার? কেন তিন কুড়ি টাকাটা নিল মিছামিছি?

মুরলীয়া কিছু জবাব দেয়নি। শুধু কেঁদেছে মনে মনে! মরদ তো পুরুষ মানুষ! গাঁয়ের প্যাটেল! সব বোঝে সে। রেলে কাজ করে তার মরদ। লাল ঝাণ্ডি দেখিয়ে ডাক-গাড়ি থামিয়ে দেয়। কত তার ক্ষমতা, কত তার ইজ্জৎ! সে বুঝবে না তো কে বুঝবে?

ছেদি প্যাটেল বলে—জগাই-এর ছেলে হলো কী করে তবে বল্? আমাদের পেলেটিয়ার সাহেবের ছেলে হচ্ছিল না, শেষে আর একটা বিয়ে করলো প্রথম বউ মারা যাবার পর, তার কি করে ছেলে হলো, সত্যি কিনা চল্, দেখে আসবি চল্?

মেম-ডাক্তার মুরলীকে দেখে যাবার সময় সরস্বতীয়াকে আড়ালে ডাকে। বলে, কি রে মরদের কাছে শুস্ না কি?

সরস্বতীয়া হাসে! বলে—না মেম-সাহেব, তুমি বলে দিয়েছ আমি আর শুই?

মেম-ডাক্তার বলে—খুব সাবধান সরস্বতীয়া, তাহলে তোরও ছেলে হবে না, ছেলে হলে সেও মারা যাবে।

সরস্বতীয়া বলে—আমার ছেলিয়া হবে না মেম্-সাহেব, আমি শুবোই না মরদের কাছে।

মেম ডাক্তার আরো ভয় দেখায়। বলে—আরও তাহলে অসুখ হবে, রোগে মুরলীয়ার মত ছট্‌ফট্ করবি আর কাঁদবি।

মেম-ডাক্তার চলে যায়। মুরলীয়া জিজ্ঞেস করে, মেম-ডাক্তার তোকে কী বললে রে সরস্বতীয়া!

সরস্বতীয়া বললে—মরদের কাছে আমাকে শুতে বারণ করলে মেম-সাহেব।

মুরলীয়া আরো কাঁদে! বলে—তুই মরে যা না সরস্বতীয়া, তুই মরে যা, আমি মরে যাই, সবাই মরে যাক্, দরকার নাই ছেলিয়ার—তুই মর, মর তুই সরস্বতীয়া।

সরস্বতীয়া খিল্‌খিল্ করে হাসে। বলে—তুমি মরো না আমি কেন মরতে যাবো শুনি?

মুরলী বলে—মরবি না তো কী করবি শুনি?

সরস্বতীয়া আরো জোরে হেসে ওঠে। বলে, আমি বোম্বাই যাবো।

মুরলী বলতো—বেরো হারামজাদী, বেরো তুই আমার সামনে থেকে—বেরো তুই, বেরো, বেরো।

সেদিন ছেদি প্যাটেলকে মুরলীয়া বললে—বিলাসপুরের ডাক্তার-খানায় একবার চলো না, সাহেব বলে গিয়েছিল যেতে, বলেছিল টাকা লাগবে না, চলো না একবার।

ছেদি প্যাটেলের দিন দিন যেন কী হয়েছিল। কিছুতেই কিছু বিশ্বাস হচ্ছিল না। সব ঝুটবাজি। বিলাসপুরের ডাক্তারও যা, ও তোরে টিল্‌ডা মিশনের ডাক্তারও তাই। রোগ সারবে না, শুধু ক-কুড়ি টাকা গুণে দিয়ে আসতে হবে।

মুরলীয়া বলেছিল—সাহেবের চেনা ডাক্তার, ওর ভালো লোক—চলো না গো একবার।

শেষ পর্যন্ত ছেদি প্যাটেল ট্রেনে উঠেছিল মুরলীয়াকে নিয়ে। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠে বিলাসপুরে গিয়ে হাজির। পুরনো জায়গা অনেক বছর কেটেছে ছেদি প্যাটেলের বিলাসপুরে।

সোজা ডাক্তারখানায় গিয়ে টিকিট করলে। লোহার চাকতি দিল হাসপাতালের চাপরাশি।

জিজ্ঞেস করলে—কী রোগ?

ছেদি প্যাটেল বললে—পারা রোগ সরকার!

—কার?

প্রাথমিক ভয় কিছুটা গোপন করে ছেদি প্যাটেল মুরলীয়াকে দেখিয়ে বললে, এর আর আমার।

চাপরাশি বললে—টাকা লাগবে, ডাক্তারের হুকুম আছে, পারা হলে নোকরি চলে যাবে।

ছেদি প্যাটেল আরও ভয় পেয়ে গেল।

বললে—নোকরি চলে যাবে?

চাপরাশি বললে—কোম্পানীর চাকরি, টাকা দিলে ডাক্তারসাব ছিপে দেবে।

ছেদি প্যাটেল বললে, কত টাকা?

চাপরাশি বললে—কত টাকা আছে তোর কাছে?

ছেদি প্যাটেল বললে—টাকা তো আনি নি সরকার!

চাপরাশিটা রেগে গেল। বললে, টাকা নেই তো ডাক্তারখানায় এসেছিস কেন? যা, তোর নোকরি চলে যাবে।

তাড়াতাড়ি চাকৃতি ফেরৎ দিয়ে ছেদি প্যাটেল আবার টিল্‌ডায় ফিরে চলে এসেছিল।

এ-ইতিহাস তারপর মুরলীয়াই কাঁদতে কাঁদতে আমাকে একদিন বলেছিল।

বলেছিল—আমার মরদের তো কোনও দোষ নেই হুজুর, সবাই খালি টাকা চায়, টাকা নিতেই চায় সবাই, টিল্‌ডার মিশনের ডাক্তারও যা, ওই বিলাসপুরের রেল-ডাক্তারও তাই।

আবার সেই টিল্‌ডা, আবার সেই কদমকুঁয়া, আবার সেই রোগ যন্ত্রণা। আবার সেই কান্নার পুনরাবৃত্তি। ছত্রিশগড়ের মানুষের কান্নায় সমস্ত কদমকুঁয়া যেন ভরে গিয়েছিল সেদিন। বিলাসপুরের ডাক্তারকেই আমি বলে এসেছিলাম কিন্তু তার আপিসের চাপরাশিকে তো বলে আসা হয়নি। সেদিন হতাশ ছুটি প্রাণী যে হাসপাতাল থেকে ফিরে এল তার জন্যে কে দায়ী তা আমি আজও ঠিক করতে পারি নি। রেলের যে

ঘুষ ধরা চাকরি আমার, ঘুষ বন্ধ করার জন্যেই যে আমাকে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে—সেই আমিই কোন উপকার করতে পারলাম না ছেদি প্যাটেলের, এ-ও কি আমার কম লজ্জা! মুরলীয়ার সামনে আমি যেন লজ্জায় আধমরা হয়ে গেলাম। কোথায় এর প্রতিবিধান আর কিসে এর প্রতিকার হয়, তা যে আমারও জানা নেই!

ছেদি প্যাটেল পরে আমাকে বলেছিল—দেখবেন সাহেব, সব মানুষের একদিন আমার মত দশা যেন হবে, আমি যেমন কাঁদছি, সবাই এমনি করে কাঁদবে—কারোর ভালো হবে না।

আমার তো তখন কিছু বলবার ছিল না। শুধু মনে হয়েছিল পৃথিবীর সব মানুষেরই দশা যেন ছেদি প্যাটেলের মত। কোথাও কোনওখানে যেন তার সান্ত্বনা নেই। অথচ কী নেই পৃথিবীতে। রোগ আছে কিন্তু তার ওষুধও তো আছে। দুঃখ আছে কিন্তু তার প্রতি-বিধানও তো আছে। যাদের জন্যে পুলিশ, পাহারা, ডাক্তার, ওষুধ, আদালত কলকারখানা, সেই মানুষেরা কতটুকু তার উপকার পায়। এই তো আমি। আমিই তো আছি ঘুষের প্রতিবিধান করতে, কিন্তু পেরেছি কি ছেদি প্যাটেলের দুঃখ দূর করতে।

দুপুরবেলা কদমকুঁয়ার মাঠে ঘুরতে ঘুরতে সেই কথাই ভাবছিলাম।

ছেদি প্যাটেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি আসার পর থেকে। মুরলীর কথাগুলোই ভাবছিলাম। রামসহায়ও ছিল আমার সঙ্গে। চানার ক্ষেতগুলোর ভেতরে লুকিয়ে লুকিয়ে বন্দুক নিয়ে ঘুরছিলাম। শিকারের নেশা। ডি-কস্টা সাহেব কী যে শিকারের নেশা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কিছুদিনের জন্যে শিকার ছাড়া যেন কিছুই ভাবতে পারতাম না। অথচ কিসের দরকার ছিল? কী আনন্দ পেতাম? কার উপকার হতো?

ছেদি প্যাটেল আরো বলছিল—আমি তো কারোর মন্দ করিনি সাহেব, তবে আমার এই দশা হলো কেন?

সত্যিই তো, পরের মন্দ না করলেও কেন নিজের মন্দ হয়?

মানুষের সব ভালো-মন্দের যারা জিম্মাদার, তারা কেন মানুষের মন্দ করে। কার ভালো হয় তাতে?

ডি-কষ্টা সাহেবের কথা আলাদা!

ডি-কষ্টা সাহেব বলতো—এন্‌জয় ইয়োর লাইফ্ ম্যান, আনন্দ করে নাও মিষ্টার, পৃথিবীতে ওইটুকুই তোমার লাভ, আর সবকিছুতো ব্লাফ্।

হঠাৎ রামসহায় সর্তক হয়ে উঠল।

বললে—ওই যে হুজুর হরিণ আসছে।

শিউতালাওএর দিক থেকে একেবারেদিক-চক্রবাল ঘেঁষে উঁচুজমি থেকে ঢালুতে নেমে আসছে হরিণের পাল! চানাক্ষেতের সবুজ ডাঁটা-গুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ঠায় দুপুর। একটা শিশুগাছের আড়ালে নিচু হয়ে বসলাম। আজ আর শুধু হাতে ফিরব না। ছেদি প্যাটেলের আর একটা কথা মনে পড়লো—আমাকে বেঁধে রাখছে কেন সাহেব, আমি তো পাগল হইনি, আমার শেকলটা খুলে দ্যাও সাহেব।

হঠাৎ বন্দুকটা তুলে টিপ করতেই বুঝি একটা খস্‌খস্ শব্দ হলো আর চোখের নিমেষে সব হরিণের পাল কোথায় যেন অদৃশ্যহয়েগেল। রামসহায় হতাশ চোখে আমার দিকে চাইল।

আমিও কেমন ব্যর্থ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলাম।

রামসহায় বললে—হুজুর গল্‌তি হো গয়া—আবার আসবে, একটু চুপ করে বসে থাকুন--

আমার কিন্তু তখনই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সারাদিন মাথার ওপর দিয়ে তপ্ত রোদে কেটে গেছে। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেছি আমি। আগুন জ্বলছিল মনে! কিসের বিরক্তি, কী জানি। কতকগুলো প্রাণীকে হত্যা করতে পারলাম না—এ কি তারই আফশোষ!

বললাম—তুমি যাও রামসহায়, এখন আর হবে না—

বার বার চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হয় মন তখন বোধহয় বিশ্রাম চায় শরীর !

রামসহায় বললে—চা করে আনবো হুজুর, ছেদি প্যাটেলের বাড়ি কাছে—আমি এখুনি আসছি নিয়ে—

রামসহায় চলে গেল হতাশ মনে।

কিছুতেই সেদিন আর শিকারে মন বসাতে পারলাম না। বন্দুকটা নিয়ে একাই ফিরছিলাম ছেদি প্যাটেলের বাড়ির দিকে। চানা-ক্ষেত পেরিয়ে শিশুগাছের খানিকটা জঙ্গল। তারপর ছেদিপ্যাটেলের এলাকা! মেঠো পথ এঁকেবেঁকে গেছে ছেদি প্যাটেলের বাড়ির দিকে সেখানেই ছেদি প্যাটেলের তালাও। খুব জল-তেষ্টাও তখন পেয়েছে আমার।

পথ দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকলে, সাহেব—ফিরে দেখি সরস্বতীয়া! বাসন্তী রঙ-এর পাড়ি তার পরনে। একটা মাটির কলসী নিয়ে তালাও থেকে জল তুলতে এসেছে। বিকেলের সূর্য তখনও হেলে পড়ে নি। সরস্বতীয়ার মুখের ওপর চিক্‌চিক্ করছে পড়ন্ত রোদ। আমাকে দেখে হাসছে সরস্বতীয়া মুখ টিপে টিপে—

সরস্বতীয়া আমার খালি হাতের দিকে চেয়ে বললে—ক-টা হরিণ মারলে গো সাহেব ?

লজ্জা হয়েছে বৈ কি একটু। হাসলাম আমিও।

কলসিটা পাড়ের ওপর রেখে তর্‌তর্ করে আমার দিকে ছুটে এল সরস্বতীয়া। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে আলো ঠিকরে উঠে পিছলে যাচ্ছিল বার বার। একেবারে কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো সে। কোমরে হাত দিয়ে।

বললাম—জল তুলতে এসেছ বুঝি ?

সরস্বতীয়া সেই রকম করে হেসে উঠলো।

বললে—না, তোমার শিকার দেখতে এসেছি সাহেব—

বললাম—শিকার কিছু মেলে নি আজ সরস্বতীয়া—

সরস্বতীয়া বললে—দেওকীনন্দনকে দেখলে তো সাহেব, তখন ?

বললাম—দেখলাম তো—

সরস্বতীয়া বললে—কেমন দেখলে বলো ?

বললাম—ভালোই !

সরস্বতীয়া বললে—দেওকীনন্দন বলছিল তোমাকে একটা খত্ লিখে দিতে।

বললাম—খত্ ! কাকে ? কোথায় ?

সরস্বতীয়া বললে—ও তো ইংরেজী লিখিপড়া জানে, না, বলছিল সাহেব যদি খত্ লিখে দেয় তো ওর একটা নোক্‌রি হয়ে যায়।

বললাম—কোথায় লিখতে হবে !

সরস্বতীয়া বললে—বোম্বাইয়ে ফিলিম্ কোম্পানীতে। ওকে মানাবে না ?

বললাম—আমি তো ভাল করে দেখি নি—

সরস্বতীয়া বললে—'নাগিন' দেখেছ সাহেব, 'নাগিন' ?

বললাম—না, আমি দেখি নি—

কী জানি, আমার কথায় যেন আমার ওপর করুণা হলো সরস্বতীয়ার। এতদিনের সব শ্রদ্ধা ভক্তি যেন এক নিমেষে তুচ্ছ হয়ে গেল। আবার বললে—সত্যি 'নাগিন' দেখনি ?

কী করে বোঝাব সরস্বতীয়াকে যে আমি সিনেমা দেখি না, ভেবে পেলাম না। বিলাসপুরে সিনেমা আসে বটে, কিন্তু সিনেমার কোনও আকর্ষণই যে আমি বোধ করি না, এ-কথা বললে সরস্বতীয়া হয়তো বিশ্বাসই করতো না ! শুধু বললাম—কেন, ও-কথা জিগ্যেস করছো কেন ?

সরস্বতীয়া বললে—দেওকীনন্দন যে 'নাগিনে'র গান গাইতে পারে। ঠিক সিনেমায় যেমন সুর, তেমনি গান দেওকীনন্দনের—ঠিক একরকম সুর—

বললাম—তবে যে মুরলীয়া বলছিল দেওকীনন্দন ভগবানের নাম-গান করে!

সরস্বতীয়া বললে—সে তো রামলীলার গান সাহেব। আমার মরদের সামনে ভগবানের নাম-গান করে, কিন্তু আমার কাছে গায় 'নাগিনে'র গান। আমার চোখের সামনে দেওকীনন্দনের সান-গ্লাস-পরা চেহারাটা আবার ভেসে উঠলো!

সরস্বতীয়া বললে—আমার মরদ তো বুড়ো মানুষ, তাই ভগবানের নাম গান ভালো লাগে তার—আমার ও-সব ভালো লাগে না সাহেব।

মনে আছে সেদিন সরস্বতীয়া দেওকীনন্দনের কথা বলতে যেন পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। বার বার শুধু দেওকীনন্দনের কথাই বলছিল। আগের বারও এসেছি কদমকুঁয়ায়, সেবার কিন্তু সরস্বতীয়া এমন ছিল না। সেবার ছিল সরস্বতীয়ার শুধুই রূপ, এবার যেন চটক। এবার যেন চোখ ঝল্‌সানো ধার! চোখে মুখে দেহে যৌবনে সরস্বতীয়া যেন সত্যিই ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। দেখে আমার ভয় হলো।

সরস্বতীয়া বললে—দাঁড়াও সাহেব, গাগরিতে জল নিয়ে আসি, তোমায় চা করে দেব—

বললাম—কেন? মুরলীয়া তো চা করতে পারে—

সরস্বতীয়া বললে—না সাহেব, মুরলীয়া আবার এলিয়ে পড়েছে, বোখার হয়েছে তার—

বললাম—কেন, সকালবেলা তো দেখে এলাম বেশ ভাল ছিল—হঠাৎ কী হলো?

সরস্বতীয়া বললে—আবার কী হবে? তোমাকে তো সব বলেছি সাহেব—

বললাম—মেম-ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছে না?

সরস্বতীয়া বললে—ওর আর সারবে না সাহেব, মেম-ডাক্তার বলেছে—

হঠাৎ সরস্বতীয়া করলে কি, আমার একটা হাত চেপে ধরলে।

সরস্বতীয়ার দিকে ফিরে চাইতেই দেখি সরস্বতীয়া ইঙ্গিতে আঙুল দিয়ে দূরের দিকে দেখালে।

সেই দিকে চেয়ে দেখি আর একদল হরিণ শিউ-তালাওএর দিক থেকে চানা-ক্ষেতের দিকে আসছে!

একটু দ্বিধা করলাম। তারপরেই বন্দুকটা সামনে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ সরস্বতীয়া বললে—দাঁড়াও সাহেব—তোমাকে শাড়ি দিচ্ছি—বলেই মাটির কলসিটা নামিয়ে রেখে একটা শিশুগাছের ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকোল। হঠাৎ সরস্বতীয়ার ব্যাপার দেখে একটু অবাক হয়ে গেলাম। কোথায় লুকোল সরস্বতীয়া। বুঝতে পারছিলাম না, সরস্বতীয়ার কী মতলব।

হঠাৎ ঝোপের দিক থেকে সরস্বতীয়ার বাসন্তী রঙ-এর শাড়িটা মাথার ওপর এসে পড়লো। শাড়িটা নিয়ে কি করবো বুঝতে পারছিলাম না।

ঝোপের ভেতর থেকে সরস্বতীয়া বললে—জেনানা সেজে যাও সাহেব, নইলে পালিয়ে যাবে—

এক মুহূর্তে বুঝে নিলাম ব্যাপারখানা। সার্ট-প্যাণ্টের ওপর সরস্বতীয়ার ছাড়া বাসন্তী রঙ-এর শাড়িখানা মেয়েমানুষের মত সারা গায়ে জড়িয়ে নিলাম। তারপর আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম বন্দুকটা আড়াল করে। ডি-কস্টা সাহেব আমাকে বলেছিল বটে যে মেয়েমানুষ দেখলে হরিণরা পালায় না। পুরুষদেরই যত ভয় করে ওরা। তারপর মেঠো পথটা কোনও রকমে পার হয়ে চানা-ক্ষেতে পড়লাম। চানা-ক্ষেতের সবুজ-ডাঁটার আড়ালে বসে পড়লাম মাথায় ঘোমটা টেনে। হরিণের পাল দলে দলে আসতে লাগলো এগিয়ে। অনেক কাছে এসেছে। তারপর ক্রমে ক্রমে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এসে পড়লো।

শেষে আরো কাছে এল।

সরস্বতীয়ার সামনে লজ্জায় না পড়ি।

বন্দুকটাতে এল-জি পুরে ঠিকঠাক টিপ করে ট্রিগার টিপে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা শিঙেল হরিণ পড়ে গেল। বাকিগুলো কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

পেছন থেকে হঠাৎ চীৎকার শুনতে পেলাম—সাহেব—সাহেব—আমার শাড়ি দাও—

তখন মনে পড়লো। তাড়াতাড়ি শিশুগাছের ঝোপের কাছে এসে ছুঁড়ে দিলাম ভেতরে।

এক মুহূর্তে সরস্বতীয়া বেরিয়ে এল। বললে—আমি দেখছি সাহেব—

ঘটনাটা মনে থাকবার মত। তাই এতদিন পরেও সরস্বতীয়ার সেদিনকার ব্যাবহারটা মনে পড়ে হাসি পাচ্ছে। আমি ছেদি প্যাটেলের সংসারের শান্তির জন্যের কি-ই-বা করতে পেরেছি। না দিতে পেরেছি ছেদি প্যাটেলকে কোনও উপদেশ, না করতে পেরেছি সরস্বতীয়ার কোনও উপকার। কোনও কিছুতেই ফল হয়নি। শুধু আতিথ্য স্বীকার করে চির-ঋণী হয়ে আছি। কতদিন জীবনে কত উত্থান-পতনের সঙ্গে সংর্ক হয়ে কাটিয়েছি। ভেবেছি যদি হেরে যাই সেদিন উপহাস করবার লোকের অভাব হবে না। কিন্তু জিতে গেলে সে আনন্দ কৃপণের মত কেবল নিজে একলাই তা ভোগ করবো। এমনি স্বার্থপরই তো আমরা। ছেদি প্যাটেল যদি হেরে গিয়েই থাকে তো তার জন্যে যেন কখনও উপহাস না করি! আর সরস্বতীয়া। সরস্বতীয়া কি জিততে পেরেছিল জীবনে?

অনেকদিন পরে, যখন আমার বিলাসপুর-জীবনের আয়ু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, সেদিন আমার দেখা হয়েছিল সরস্বতীয়ার সঙ্গে। দেখে হাসব কি কাঁদব ভেবে পাইনি বটে কিন্তু অবাকও তো হইনি।

বলেছিলাম—কেমন আছো সরস্বতীয়া ?

সরস্বতীয়া সে কথার উত্তর না দিয়েবলেছিল—এবার আমাদের এখানে উঠলে না কেন সাহেব ?

বললাম—আমি সব জানি—সব শুনেছি সরস্বতীয়া—

সরস্বতীয়া ম্লান হাসি হেসে বললে—চা করে দেব সাহেব ?

বললাম—আমি রামসহায়ের বাড়িতে চা খেয়ে এসেছি—

সরস্বতীয়া বলেছিল—আমার হাতে খেতে ঘেন্না করে ?

বললাম—তোমার হাতে কি খাইনি কখনও ?

মনে আছে কথাটা শুনে সরস্বতীয়া কিছু উত্তর দেয়নি। উত্তর দেবার কিছু ছিলও না। ছেদি প্যাটেলের তখন কোনও দিকেই হুঁস্ থাকবার কথা নয়। ঘরের মধ্যে কী যেন বকছিল নিজের মনে ?

সরস্বতীয়া বলেছিল—আর হরিণ মারবে না সাহেব ?

বললাম—আমি এবার বিলাসপুর থেকে চলে যাবো সরস্বতীয়া—বন্দুক বেচে দিয়েছি—

কথাটা শুনে কেমন যেন মুখটা কৌতূহলে ভরে উঠলো ওর।

কিন্তু সেদিন কি আমি জানতাম বিলাসপুর আমাকে অত শিগ্‌গির ছেড়ে চলে যেতে হবে। হেড অফিস থেকে রিপোর্ট গিয়েছিল আমাকে দিয়ে ঘুষ ধরাবার কাজ ভালোমত হচ্ছে না। আমি দয়ালু, আমি অল্পতেই মুষড়ে পড়ি,আমিএকটুতেই কাতর হই। মানুষের অপরাধকে আমি যে বড় করে দেখি না—মানুষই আমার কাছে কেমন করে জানি না কখন যেন বড় হয়ে ওঠে। যে-মানুষ দোষ করে, সে মানুষ আবার ভালোও বাসে। যে-মানুষ অপরাধ করে সে-মানুষ আবার ক্ষমাও করে একজনকে। এ-কথা কর্তাদের বোঝাতে পারিনি আমি—তাই আমাকে ফিরে যেতে হয়েছিল, তাই আমাকে অক্ষম হতে হয়েছিল। কিন্তু সে-কথা এখানে অবান্তর।

ছেদি প্যাটেল সেদিন ফিরে এল অনেক পরে।

আমাকে দেখেই বললে—সাহেব আপনি !

তখন সরস্বতীয়া মাংস চড়িয়েছে হাঁড়িতে। মাংসের গন্ধে ভুরভুর করছে বাড়ি। ছেদি প্যাটেলের নাইট-ডিউটি, সে খেয়ে ডিউটিতে যাবে! খাওয়া-দাওয়া সেরে নীল-কোর্তা পরে নিয়েছে।

বললে—এবার সব চানা হরিণে খেয়ে গেল সাহেব, ভালো দাম পাবো না।

মুরলীয়া ঘরের ভেতর যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছিল। তার কাতরানি শোনা যাচ্ছিল বাইরে থেকে।

বললাম—এবার আর তোমার টাকা লাগবে না ছেদিলাল, আমি নিজে তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো, তুমি বিলাসপুরে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা কোরো—তোমার রোগ আমি নিশ্চয়ই সারিয়ে দেব, দেখো।

ছেদি প্যাটেল বললে—আমার রোগের জন্যে আমি ভাবছি না সাহেব, মুরলীয়ার জন্যেও ভাবছি না।

বললাম, তবে কিসের জন্যে ভাবছো তুমি ?

ছেদি প্যাটেল বললে—আমি সরস্বতীয়ার জন্যে ভাবছি হুজুর—আমার পাঁচ কুড়ি টাকাই জলে গেল।

বললাম—টাকাটাই তোমার কাছে বড় হলো ছেদি—?

ছেদি প্যাটেল বললে—আমার রক্ত জল করা টাকা হুজুর, আমি রাত জেগে খেটে, রোদ্দুরে বিষ্টিতে ভিজে টাকা করেছি হুজুর, সব কি জেঠু রাউতকে দেবার জন্যে ? আমি কি আর টাকা দেবার লোক পেলাম না ? আমার কী লাভ হলো বলুন হুজুর ? আমার কি ছেলে হলো ? আমি তো ছেলের জন্যেই চুড়ি পরিয়েছিলাম সরস্বতীয়াকে ?

কী আমার বলবার ছিল। কিছুই উত্তর দিতে পারলাম না আমি।

ছেদি প্যাটেল বলতে লাগলো—সেই টাকা নিয়ে জেঠু রাউত তো চুড়ি পরিয়ে বউ আনলো ঘরে—তারও ছেলে হয়েছে এখন—এখন সে কত সুখে আছে সাহেব।

আমি নিজের ঘরে বসেছিলাম। ছেদি প্যাটেল খেয়ে-দেয়ে সকাল-সকাল চলে যাবে ডিউটিতে।

আমার রাত্রে ট্রেন। রামসহায় এসে মালপত্র বয়ে নিয়ে আমাকে ট্রেনে তুলে দেবে।

হঠাৎ বাইচে তুমুল গণ্ডগোল উঠলো।

ছেদি প্যাটেলের গলা! চীৎকার করছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখি ছেদি প্যাটেল বলছে—হারামজাদা, আর জায়গা পাওনি ফষ্টি-নষ্টি করতে।

দেখি দেওকীনন্দনের গলার জামাটা ধরেছে মুঠো করে। ধরা পড়ে গিয়ে দেওকীনন্দনের মুখে আর কথা নেই।

ছেদি প্যাটেল চীৎকার করে বলছে—ভেবেছ আমি বাড়ি নেই, আর অমনি এসেছ—বেরো হারামজাদা, বেরো, যদি আর কখনও আসবি তো মেরে তোর মাথা ভেঙে দেব না—আমাকে জানিস না তুই, আমি কদমকুঁয়ার প্যাটেল— আমার আওরাতের ওপর তোর নজর।

আমি গিয়ে ছাড়িয়ে দিলাম। নইলে সেদিন ছেদি প্যাটেল মেরে ফেলতো ওকে একেবারে।

বললাম—ছাড়ো ছেদিলাল, মরে যাবে যে।

ছেদি প্যাটেল বললে—মরাই ভালো সাহেব, ওর মরাই ভালো—আমি খুন করে ছাড়বো বেটাকে, আমার আওরাতের ওপর ও কিনা নজর দেয়।

শেষে জোর করে ছাড়িয়ে দিলাম দেওকীনন্দনকে। হয়ত বুঝতে পারে নি যে ছেদি প্যাটেল তখনও বাড়িতে আছে। একটু আগেই এসে পড়েছিল।

দেওকীনন্দনকে ছাড়িয়ে দিতেই সে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছেদি প্যাটেল তখনও গজরাচ্ছে।

—আমি কদমকুঁয়ার প্যাটেল, আমার বাড়িতে এসেছে চালাকি করতে। আমি ওকে খুন করে তালাও-এর মাটিতে পুঁতে ফেলবো।

এর পর আমি বিলাসপুরে চলে এসেছি। তখন আমার বিলাসপুর-জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে।

হঠাৎ আমার আর্দালী বললে—ছেদি প্যাটেলের খবর শুনছেন সাহেব ?

বললাম—না !

আর্দালী বললে—রামসহায় এসেছিল, সে-ই বলছিল ছেদি প্যাটেলের বউ সরস্বতীয়া নাকি পালিয়ে গেছে—ছেদি প্যাটেল চাকরি ছেড়ে দিয়েছে হুজুর।

অবাক হয়ে গেলাম। আর কতদিনই বা চাকরি ছিল ছেদি প্যাটেলের। এত দিনের চাকরি কিনা ছেড়ে দিল ছেদি প্যাটেল।

বললাম—কোথায় পালিয়েছে ? খবর পেয়েছে কিছু ?

আর্দালী তার বেশি কিছু বলতে পারলে না।

তারপর আমি জব্বলপুরে গিয়েছি অফিসের কাজে। ট্রেনে চেপে গণ্ডিয়ায় ন্যারো গেজ লাইনে ট্রেনে চড়বো। দেখি গলায় লাল রুমাল-জড়ানো হাওয়াই সার্ট পরা এক ছোকরা—ঘন ঘন সিগারেট টানছে প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে।

কাছে গিয়ে ভালো করে দেখলাম।

বললাম—তোমার নাম দেওকীনন্দন না ?

দেওকীনন্দন আমাকে দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

আবার বললান—তুমিই তো দেওকীনন্দন ?

দেওকীনন্দন বললে জী হাঁ !

বলে জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলে দিলে লাইনের ওপর।

বললাম—সরস্বতীয়া তোমার কাছে আছে ?

দেওকীনন্দন প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর যেন ভয় পেয়ে বললে—জী হাঁ !

বললাম—কেন তুমি ওকে নিয়ে ভাগলে ? জানো না ছেদি

প্যাটেল সরস্বতীয়াকে নগদ একশো টাকা খরচ করে চুড়ি পরিয়ে ঘরে এনেছিল!

দেওকীনন্দন চুপ করে রইল।

বললাম—জানো না, ছেদি প্যাটেল সমস্ত ছত্রিশগড় খুঁজে বেড়াচ্ছে তোমাকে পেলে সে ছিঁড়ে খাবে!

দেওকীনন্দন বললে—হুজুর আমার কি দোষ? সরস্বতীয়া তো আমার সঙ্গে ভেগে এল, আমায় বললে ফিলিম করতে, আমার সঙ্গে বোম্বাই যাবে বলে বেরিয়ে এল—বললে দুজনে মিলে বোম্বাই গিয়ে ফিলিম্ করবো—'নাগিন' ছবি দেখে ওর ভালো লেগেছিল যে।

বললাম—এখন কোথায় রেখেছ তাকে?

দেওকীনন্দন বললে—ছিন্দোয়াড়াতে।

বললাম—আর তুমি এখানে কী করছো একলা?

দেওকীনন্দন বললে—এই নোকরির চেষ্টায় ঘুরছি হুজুর।

আবার ভালো করে দেওকীনন্দনের চেহারাটা আপাদ-মস্তক দেখলাম। নোকরি খোঁজবার পোশাকই বটে। ছুঁড়ে-ফেলা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটায় তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মনে হল এখুনি পুলিশকে ডেকে ধরিয়ে দিই ছোকরাকে।

দেওকীনন্দন বললে—হুজুর, মালিক বে-ফিকির আমার ওপর গোসা করছেন—আমি কিছু কসুর করিনি—সরস্বতীয়ার বড় তকলিফ্ ছিল ছেদি প্যাটেলের বাড়িতে, মার ধোর করতো, ওর জন্যে আমারই এখন তকলিফ্।

—কেন? তোমার কিসের তকলিফ্?

দেওকীনন্দন বললে—রামলীলার দল ছাড়তে হয়েছে মালিক, এখন বোম্বাইতে যেতে টিকিট্ লাগবে দুজনের কত টাকা হিসেব করুন হুজুর। তারপর কে আমাকে ফিলিম্ করতে দেবে সেখানে—আমি ফিলিমের কী জানি।

দেওকীনন্দন আমার সঙ্গে কথা বলছিল আর ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল যেন।

মনে হলো দেওকীনন্দনের ওপর রাগ করাও আমার বৃথা!

ছত্রিশগড়ের সমাজে এটা এমন কিছু মহা অপরাধ করেনি। এমনি দিনরাত ঘটছে। তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

আমার ট্রেন এসে গিয়েছিল। তাকে ছেড়ে দিয়ে আমিও কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ট্রেনে উঠে বসেছিলাম।

তারপর কোথায় রইল ছেদি প্যাটেল তার কোথায় রইল মুরলীয়া আর কোথায়ই বা রইল সরস্বতীয়া! সেসব খবর রাখবার আর আমার অবসর হয়নি। ছত্রিশগড় ছেড়ে আবার আমায় কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। শিকারী জীবনের সঙ্গেও আমার সেই থেকে যবনিকাপাত হয়ে গিয়েছিল। বন্দুকটার একটা খদ্দের খুঁজছিলাম। ডি-কস্টা সাহেবই আমায় পছন্দ করে বন্দুক কিনিয়ে দিয়েছিল—শেষ পর্যন্ত আবার ডি-কস্টা সাহেবকেই ফিরিয়ে দিয়ে এলাম সেটা। তাঁকে বলে এসেছিলাম—শুধু বিক্রি হলে টাকাটা যেন আমাকে পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু ফিরে আসবার আগেই ঘটনাটা ঘটলো।

নইলে এ-গল্প লেখবার প্রয়োজনই হতো না আজ।

আমার জায়গায় গাঙ্গুলী এল আমাকে রিলিফ করতে। তারই হাতে ফাইলপত্র, কাগজ, স্ট্যাম্প, সমস্ত বুঝিয়ে দিলাম। ভাঁটাপাড়ায় সরষের তেলের ভেজালের যে কেসটা চলছিল তার কাগজপত্রও দিয়ে দিলাম। অনেক দিনের অনেক দিনরাত্রির সঙ্গী বিলাসপুর আর আশে-পাশের স্টেশনগুলো। বরদুয়ারে মালগুদামের কেস্, পেন্দ্রা রোডের পি-ডব্লিউ-আইএর কেস্, নইলাতে গ্রেনসপের কেস্। কেস্ কি একটা! নিজের এজেন্টদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলাম। সবজায়গাতেই গাঙ্গুলীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম। বুঝিয়ে বললাম সবাইকে যে গাঙ্গুলীই আমার রিলিভার।

রাজনন্দ-গাঁওতে গিয়ে মালবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম গাঙ্গুলীর।

গাঙ্গুলী কাগজপত্র বুঝে নিয়ে আপ ট্রেনে জব্বলপুর চলে গেল আফিস থেকে কাজকর্ম বুঝে নিতে। আমি প্লাটফর্মে বসেছিলাম ডাউন ট্রেনের জন্যে। কাঁকর বিছান প্লাটফরমের ওপর ওয়েটিংরুমের ইজি-চেয়ারটা টেনে এনেছি। দুদিকে আদিগন্ত একজোড়া রেললাইন চলে গেছে। তার ওপাশে চানা-ক্ষেত! ধু ধু করছে সবুজের ঢেউ।

হঠাৎ আমার কী মনে হলো যেন!

মনে হলো চিরদিনের জন্য তো সি-পি ছেড়ে চলে যাচ্ছি! আর কখনও এদিকে আসবো না। এলেওএমন করে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকা হবে না আর কখনও। মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। মনে হলো—এই তোপরের স্টেশনই টিল্‌ডাটি—ল্‌ডাতেই তো কত রাত কত দুপুর কাটিয়ে গেছি ছেদি প্যাটেলের বাড়িতে। আর সঙ্গে সঙ্গে ছেদি প্যাটেলের কথা মনে পড়লো! মুরলীয়ার কথাও মনে পড়লো। আর সরস্বতীয়ার কথাও মনে পড়লো।

স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করলাম—ডাউন মাল-গাড়ি কিছু আছে মাস্টার মশাই?

স্টেশন মাস্টার বললেন—থ্রি সেভেনটিন্‌ ডাউন আসছে—এখনি লাইন ক্লিয়ার দেব।

বললাম—একবার গাড়িটাকে থামাতে পারেন, আমি একবার টিল্‌ডায় যাবো—

স্টেশন মাস্টার রাজী হলেন।

বললাম—আর টিল্‌ডাকে একবার বলে দেবেন যেন আধ মিনিটের জন্যে টিল্‌ডায় থামায় ট্রেনটা, আমি নামব ওখানে! একবার ছেদি প্যাটেলকে কেন জানি না দেখে যাবার ইচ্ছে হলো। এমনি দরকার হলে একটা রাত থাকবো সেই ঘরটায়। বুড়োকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে আসবো, আর কিছু নয়। হয়ত মুরলীয়ার অসুখ আরো বেড়েছে।

তার সঙ্গেও একবার দেখা করে আসবো। অনেক আতিথ্য স্বীকার করেছি ওদের বাড়িতে, তার জন্যে শেষবারের মত একবার কৃতজ্ঞতা জানানো হবে।

মালগাড়িতে চড়ে টিল্‌ডায় নামলাম। সন্ধ্যা হয়-হয়।

সেই গেট। ছেদি প্যাটেলের গেট। এই লেভেল-ক্রসিং-এর কাছেই ছেদি প্যাটেল সবুজ ঝাণ্ডা নিয়ে রোজ দাঁড়িয়ে থাকতো। সেই গেটটা সেই রকমই আছে। পাশের গুমটি ঘরটার মধ্যে অন্য একজন ছোকরা গেট ম্যান বসে বসে তখন ডিউটি দিচ্ছে। অনেকগুলো দেহাতী লোকের সঙ্গে বসে চুল্লির সামনে আগুন পোয়াচ্ছে।

কাউকে আমার কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই। আমার চেনা পথ। আমি একলাই কদমকুঁয়ার ছেদিপ্যাটেলেয় বাড়ি চিনে নিতে পারবো।

ওদিকে বেল্লারির জঙ্গল আর ওপাশে শিউলীতালাও। মাঝখানে কদমকুঁয়া। ছেদি প্যাটেলের বাড়িটার কাছে শিশুগাছের ঝোপ্‌। সেই যে-ঝোপের মধ্যে ঢুকে সরস্বতীয়া একদিন তার বাসন্তী রঙের শাড়িটা আমার মাথার ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিল।

বাড়ির দরজাটা ভেজানো ছিল।

ভেতর থেকে ছু বউয়ের চীৎকার আর কানে আসবে না জানতাম। তবু কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো যেন ছেদি প্যাটেলের গলার আওয়াজ পাচ্ছি। একলা ছেদি যেন বকে চলেছে এক নাগাড়ে। কাকে বকে চলেছে, মুরলীয়াকে?

ডাকলাম—ছেদিলাল!

আমার গলা যেন কেউ শুনতে পেল না।

ছেদি প্যাটেল তখনও বকে চলেছে।

আবার ডাকলাম—ছেদি—

মুরলীয়া হয়তো নিজের অসুস্থ শরীর নিয়ে ঘরে শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে! আর ছেদি প্যাটেল হয়ত তাই আপন মনেই নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিচ্ছে।

এবার জোরে ডাকলাম—ছেদিলাল—দরজা খোলো—

ভেতরে যেন কার পায়ের শব্দ পেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজার হুড়কোটা খট করে খুলে গেল।

অল্প অন্ধকারে মুখখানা দেখেই চমকে উঠলাম।—সরস্বতীয়া!

সরস্বতীয়াও আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছে;

বললে—সাহেব, তুমি?

বললাম—তুমি যে এখানে আবার?

সরস্বতীয়া আমার সে কথার উত্তর না দিয়েই বললে—তোমার বিছানাপত্র কোথায় সাহেব?

বললাম স্টেশনে রেখে এসেছি, রাত্রের টেনেই যাবো—

—আর তোমার বন্দুক?

বললাম—শিকার তো আর করি না, তা ছাড়া আমি এবার কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি—কিন্তু তোমার কথা আগে বলো, তুমি ফিরে এলে যে? দেওকীনন্দন কোথায়? বোম্বাই যাওনি?

সে-কথার উত্তর না সরস্বতীয়া আলো দেখিয়ে বলল—ভেতরে এসো সাহেব—

আমি আমার চেনা ঘরের দিকেই যাচ্ছিলাম।

সরস্বতীয়া বললে—ওদিকে না সাহেব, এখানে বোসো—

বলে আমায় একটা খাটিয়া দেখিয়ে দিলে।

ছেদি প্যাটেল তখনও ঘরের ভেতর গজ্‌ গজ্‌ করছে। কোন্ ঘর থেকে শব্দ আসছে বুঝতে পারছি না।

বললাম - মুরলীয়া কোথায়? কেমন আছে সে?

সরস্বতীয়া রান্নার হাঁড়িটা উনুন থেকে নামালো।

বললে তুমি শোন নি? সে তো মরে গেছে সাহেব—রামসহায় বলেনি তোমায়?

বললাম—কবে মারা গেল? কী হয়েছিল তার?

সরস্বতীয়া বললে—ওই দেখ - ওই যে—

ঘরের চালের বাতার দিকে দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল সরস্বতীয়া। কিছু দেখতে পেলাম না।

সরস্বতীয়া বললে একটা রশি দেখছ না? ওই রশিতে ফাঁস দিয়েছে সে—

চমকে উঠে বললাম—কেন? গলায় দড়ি দিয়ে মরতে গেল কেন?

সরস্বতীয়া হাসলো। বললে—দরদ আর সহ্য করতে পারে নি। শেষকালে সাহেব, রশিতে ঝুলে মরেছে একদিন—

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

খানিক পরে বললাম—ছেদি প্যাটেল বুঝি বুঝিতে পারে নি আমি এসেছি? ডাকো না তাকে—

সরস্বতীয়া বললে—এখন ডাকবো না সাহেব, তখন থেকে খাবো খাবো করছে কেবল, এখনও রান্না হয় নি যে—

বললাম—খুব ক্ষিদে বেড়েছে বুঝি আজকাল?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সরস্বতীয়া—বললে—চলো, জানালার বাইরে থেকে দেখব চলো -

বলে আমাকে নিয়ে গেল ঘরটার সামনে। খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে চেয়ে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! দেখি আগাগোড়া উলঙ্গ হয়ে ছেদি প্যাটেল ঘরময় ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াচ্ছে আর আর আপন মনে কী সব বক্‌বক্‌ করে চলছে।

সরস্বতীয়ার মুখের দিকে তাকালাম।

সরস্বতীয়া বললে—মেম-ডাক্তার বলেছে ও আর সারবে না সাহেব -

চুপচাপ এসে খাটিয়ায় আবার বসে পড়লাম। কিছুই আমার বলবার ছিল না। আমাকে বসিয়ে রেখে সরস্বতীয়া আবার রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলো। আমি বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম। কাকে কী বলবো! আর কী-ই বলবো! বলবার কি মুখই আছে আমার!

সরস্বতীয়া হঠাৎ আমার সামনে একটা টুল রেখে গেল।

বললাম—কিন্তু ঠিক সময়েই তুমি এসে পড়েছিলে সরস্বতীয়া—তুমি না এলে ছেদি প্যাটেলকে কে দেখতো এই সময়ে—

সরস্বতীয়া রান্নাঘরে থেকে—বললে—আমারও তো না এসে আর উপায় ছিল না সাহেব—

বললাম কেন? তোমার তো দেওকীনন্দনের সঙ্গে বেশ কাটছিল—

সরস্বতীয়া কোনও উত্তর দিলে না আমার কথার।

আবার বললাম—একদিন গণ্ডিয়া ষ্টেশনে দেওকীনন্দনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, জানো, নোকরী খুঁজতে এসেছিল

এবারও সরস্বতীয়া কোন উত্তর দিলে না।

হঠাৎ আমার সামনে এসে টুলের ওপর একটা লম্ফ রেখে দিয়ে গেল। তারপর একটি চা নিয়ে আমার কাছে এল।

বললে—আমার হাতে চা খাবে সাহেব?

অবাক হলাম কথাটা শুনে।

বললাম কেন, তোমার হাতে কি চা খাইনি আগে? চায়ের আমার দরকার ছিল না, আমি ষ্টেশন থেকেই চা খেয়ে আসছি—

সরস্বতীয়া জিজ্ঞেস করলে—আর হরিণ মারবে না সাহেব!

বললাম, আমি এবার বিলাসপুর থেকে চলে যাচ্ছি বন্দুক বেচে দিয়েছি

লম্ফের আলোয় সরস্বতীয়ার মুখখানা অনেকদিন পরে ভালো করে দেখলাম। কী রোগা হয়ে গেছে। এতক্ষণ অন্ধকারে ভালো করে দেখতে পাইনি। সমস্ত মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। মুখখানা দেখতে দেখতে হঠাৎ চমকে উঠলাম। কপালে গালে ও-সব কী সব দাগ? আরো ভালো করে দেখতে লাগলাম! তবে কি সরস্বতীয়া শেষ পর্যন্ত মেম-ডাক্তারের কথা মানে নি। শেষ পর্যন্ত ছেদি প্যাটেলের সঙ্গে শুয়েছিল!

আমার চোখ দুটো ... প্রখর দৃষ্টি নিয়ে সরস্বতীয়ার আপাদমস্তক দেখতে লাগলো।

সরস্বতীয়া হাসলো এবার।

বললে—কী দেখছো সাহেব অমন

বললাম—মুখে-হাতে সব দাগ কি ... ? কাছে এসো তো দেখি ভালো করে।

সরস্বতীয়া অবলীলায় আরো কাছে সরে এ... মুখে আবার সেই পুরোন দিনের হাসি ফিরে এল।

বললাম—ছেদি প্যাটেল শেষকালে তোমারও ... রেছে ?

সরস্বতীয়া হাসতে লাগলো তেমনি করে।

বললাম মেম-ডাক্তার অত করে বলেছিল, শুনলে ... ? ছি ছি কী সর্বনাশ হলো বলো তো ?

সয়স্বতীয়া তবু হাসতে লাগলো।

হাসতে হাসতে বললে—ছেদি প্যাটেল নয় সাহেব—তা . ফিরে আ স—

বড় রহস্যজনক শোনালো সরস্বতীয়ার কথাগুলো।

বললাম—ছেদি প্যাটেল নয় তো কে ? কে সর্বনাশ করলে তে এমন করে ?

সরস্বতীয়া আবার হাসতে লাগলো।

বললাম—হাসি রাখো, বলো কে ?

এতক্ষণে সরস্বতীয়া হঠাৎ বড় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলো। দু'টোও যেন ভারি হয়ে এল লক্ষ্য করলাম।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—বলো কে ?

সরস্বতীয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না।

- যেন নিজের মনেই বলে যেতে লাগলো—আমরা কেউ থাকবো না, আমরা কেউ বাঁচবো না—

অবাক হয়ে বললাম—কেন ?

সরস্বতীয়া বললে—ও সাহেব, মিশনের মেম-ডাক্তার আমাকে বলেছে, আমরা ছত্রিশগড়ী, আমাদের জাতটা শেষ হয়ে যাবে সাহেব।

তারপর একটু দম নিয়ে বললে—আমার ছেলে না হয়েছে ভালই হয়েছে সাহেব, আমার ছেলে হলে সে-ও বাঁচতো না—তাই আমিও আর এখন ছেলে চাই না।

—তুমিও কি চাইতে তোমার ছেলে হোক ?

সরস্বতীয়া আঁচল দিয়ে নিজের চোখ দু'টো ঢেকে ফেললে হঠাৎ। কথার উত্তর দিলে না। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু কে তোমার এ সর্বনাশ করলে ? কে সে ?

সরস্বতীয়া উত্তর দিতে গিয়ে যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

বললে—ওই দেওকীনন্দন সাহেব—ওরও···

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সত্যিই তো, মেম-ডাক্তার তো দেওকীনন্দন সম্বন্ধে সাবধান করে দেয়নি তাকে !

সরস্বতীয়া তখনও কাঁদছিল ! আমি নিঃশব্দে কখন উঠে চলে এলাম, সরস্বতীয়া তা জানতেও পারলে না।

॥ সমাপ্ত ॥